মাস্টার অফ দ্য গেম

সিডনি সেলডন

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

কেটি ব্ল্যাকওয়েল 2
সমুদ্রের গর্জন 96
জেমি ম্যাকগ্রেগর 228
ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেড 315
বিয়ের পর ছমাস 425
ইভ নিউইয়র্কে ফিরে এসেছে 472
জর্জ মেলিস 545

কেটি ব্ল্যাকওয়েল

গল্প শুরুর আগে

কেটি ব্ল্যাকওয়েলকে আমরা বিশ্বের অন্যতম সেরা ধনবতী মহিলা বলতে পারি। তিনি হলেন অশেষ ঐশ্বর্যের অধিকারিণী, অনন্ত ক্ষমতার কেন্দ্র। তার পিতা ছিলেন এক বিশিষ্ট হিরক ব্যবসায়ী, জীবন কাটিয়েছেন উত্তেজনা আর অহঙ্কারের মধ্যে।

এই বিশিষ্ট ভদ্রমহিলার নব্বইতম জন্মদিন, সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতির কাছ থেকে এসেছে অভিনন্দন পত্র, হোয়াইট হাউস থেকে কাঙ্খিত টেলিগ্রাম।

কেটি ছাড়া সেই জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অনেকগুলি ভৌতিক অপচ্ছায়াকে দেখা গেছে। যে সমস্ত বন্ধুরা আসতে পারেননি, তাঁদের প্রেতাত্মা, অনুপস্থিত শত্রুরাও, এইসব ভৌতিক অপচ্ছায়ারা কেটিকে বারেবারে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করেছে। আর এভাবেই উদ্ভাসিত হয়েছে এক ঘটনা পরম্পরা। যার পরতে পরতে শঙ্কা শিহরণের হাতছানি। আছে দুরন্ত লোভ, দুর্দান্ত ভালোবাসা এবং নিঃসীম আত্মবলিদানের শ্বাসরোধকারী ঘটনাপ্রবাহ..

উপস্থাপনা
কেটি

১৮৮২ বিশাল বলরুমে পরিচিত ভূতেদের আনাগোনা। সকলে এসেছে, তার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। কেটি ব্ল্যাকওয়েল অবাক বিস্ময়ে তাদের দিকে তাকালেন। কী

অবাক, রক্তমাংসের অতিথিদের পাশাপাশি তাদের অবস্থান। মনের মধ্যে স্বপ্নিল ছায়া ছায়া কল্পনা। এইসব ভৌতিক অপচ্ছায়ারা বিরাট হলঘরে নৃত্যরত। তাদের ইভনিং গাউন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এই সিডারহিল হাউসে অন্তত একশোজন অতিথির সমাবেশ হয়েছে। এক সুন্দর সাজানো পরিবেশ। মাইনের ডাকহারবারে। কিন্তু কেটির মনে সুখ নেই।

রোগা চেহারার এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা, মুখের ওপর এমন কিছু নেই, যা তাকে স্মরণযোগ্য করে রাখবে। চেহারাটা সুগঠিত। চোখের তারায় উষাকালীন শুভ্রতা, চিবুকটা ধারালো। অবয়বের মধ্যে স্কটিশ এবং ওলন্দাজ সংমিশ্রণ আছে। হ্যাঁ, তার আর একটা আকর্ষণ হল, ঈষৎ কালো পোশাক। সেখানে হাতির দাঁতের দ্যুতি। হাতের চামড়ায় টান ধরেছে। বয়সের অভিশাপ আর কী!

মনে হয় না, আমি আজ নব্বইতে পদার্পণ করলাম, কেটি মনে মনে ভাবলেন। কীভাবে বছরগুলো হারিয়ে গেল? তিনি নৃত্যরত ভূতেদের দিকে তাকালেন। হ্যাঁ, একসময় তারা ছিল, আমার জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে। আজ আর তারা কেউ বেঁচে নেই। উনি বান্দাকে দেখতে পেলেন, হ্যাঁ, বান্দার উজ্জ্বল কালো মুখ খুশিতে আলোকিত। ডেভিডকেও দেখা গেল, প্রিয় ডেভিড, সেই সুন্দর সুবেশ সুস্নাত পুরুষ চরিত্রটি, মনে পড়ে গেল, প্রথম দেখার। মুহূর্ত। যখন তিনি ডেভিডকে উন্মাদনীর মতো ভালবেসেছিলেন। ডেভিড তার দিকে। তাকিয়ে হাসছে। কেটির মনে হল, এসো, এসো আমার ডার্লিং। ভাবলেন, আহা, ডেভিড যদি এখন বেঁচে থাকত? তাহলে নাতির ছেলের সঙ্গে দেখা হত হয়তো।

কেটির চোখ সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তাকে দেখতে পেলেন। আট বছরের এক সুন্দর বালক, ভারি সুন্দর পোশাক পরেছে। কালো ভেলভেটের জ্যাকেট, পছন্দসই ট্রাউজার। রবার্টকে দেখে মনে হয়, সে বুঝি ঠাকুরদার বাবার আদলটা পেয়েছে। জেমি ম্যাকগ্রেগর মার্বেল ফায়ার প্লেসের পাশে, পেইন্টিং-এ এখন যার উপস্থিতি।

রবার্ট ফিরে তাকাল। কেটি মাথা নীচু করে হাতের ইঙ্গিত করলেন। হ্যাঁ, কুড়ি ক্যারেটের হিরের আংটি ঝলসে উঠল। কত বছর হয়ে গেল। ভাবতে অবাক লাগে বৈকি।

মুহূর্তের জন্য কেটি ভাবলেন। আমি একটা মৃত অন্ধ অতীত হয়ে গেছি। ও হল ভবিষ্যৎ। আমার নাতির ছেলে। তার হাতেই একদিন এই বিরাট সাম্রাজ্যের দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। তিনি এগিয়ে গেলেন।

ছেলেটি বলল–দিদা, আজ তোমার জন্মদিন, তাই না?

–হ্যাঁ, ধন্যবাদ রবার্ট।

–ভারী সুন্দর অর্কেস্ট্রা।

কেটি তাকালেন, এক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর বললেন তোমার ভালো লেগেছে, দাদুভাই?

-দিদা, সত্যি কথা বলব? তোমাকে দেখে নব্বই বলে মনেই হয় না।

কেটি হাসলেন–হ্যাঁ, তোমাকে বলে বলছি, কথাটা পাঁচকান করো না যেন। আমিও নিজেকে নব্বই বলে ভাবতে পারছি না।

ছেলেটি হাসতে হাসতে পালিয়ে গেল। বিরাশি বছরের তফাৎ, তবুও কী কাছে আসার আকুতি। কেটি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, নাতির মেয়ে নাচছে। স্বামীর সাথে। হ্যাঁ, দুজনকেই দেখতে খুব সুন্দর।

রবার্টের মা দেখতে পেলেন, তাঁর পুত্র এবং ঠাকুরমা গল্প করছে। ওই, কী শয়তানি মহিলা, বয়সের গাছপাথর নেই। কতদিন বাঁচবে কে জানে!

বাজনা থেমে গেছে। এবার হৈ-হুঁল্লোড় শুরু হবে। আলাপ আলোচনা, কৌতুক আরও কত কী।

রবার্ট আবার তার ঠাকুরমার কাছে চলে এসেছে। পিয়ানোর দিকে তাকিয়ে আছে। বসে পড়েছে। এবার বোধহয় সে কী-বোর্ডে হাত রাখবে।

মা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। সব দিকে নজর রাখছেন। হ্যাঁ, এই ছেলেটা একদিন মস্ত বড়ো সঙ্গীতজ্ঞ হবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বাইরে ডিনার দেওয়া হয়ে গেছে। বাগানে চেয়ার পাতা হয়েছে। বিশিষ্ট জনেরা এসেছেন।

গভর্নরকে দেখা গেল। তিনি বললেন এই দেশের ইতিহাসে এক স্মরণীয়যোগ্য মহিলা, কেটি ব্ল্যাকওয়েল বিভিন্ন কাজে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। সামাজিক দায়বদ্ধতা দেখলে অবাক হতে হয়। স্যার উইনস্টন চার্চিলের কথা ধার করে বলতে হয় আমরা এনার কাছে এত ভাবে ঋণী যে, ভাষায় সেই ঋণ প্রকাশ করতে পারব না।

কেটি মনে মনে ভাবলেন, কেউ আমাকে চেনে না, ওই লোকটার কথা শুনে মনে হবে, আমি বুঝি এক মহতী সন্ন্যাসিনী। কিন্তু আসল কেটি ব্ল্যাকওয়েলের কথা লোকে যদি জানতে পারে তাহলে কী হবে? যখন আমার বয়স মাত্র একবছর, তখন আমাকে একটা চোর চুরি করেছিল। এখনও আমার মাথায় বুলেটের চিহ্ন আছে।

উনি মাথার দিকে তাকালেন।–হ্যাঁ, সেই মানুষটির দিকে, যে একদিন ওনাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কেটির চোখদুটো বড়ো বড়ো হয়ে উঠল। অনেক দূরে হাততালির ঝড়। কেটি শুনলেন, গভর্নর তার ভাষণ শেষ করেছেন।

কেটি উঠে দাঁড়ালেন, কথা বললেন, তার কণ্ঠস্বর সুদৃঢ় আরও বেশিদিন আপনাদের মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই, তাহলে আমার জীবনের সব পাওয়া ঠিক হবে। আমি যেন আরও কর্মক্ষম হয়ে উঠি।

কেটির সংক্ষিপ্ত ভাষণ, শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার হাততালির ঝড়।

-সকলকে ধন্যবাদ, আজকের সন্ধ্যাটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য। এই সন্ধ্যাটির কথা আমি কখনও ভুলব না, যারা এখনই বিশ্রাম নিতে চান, ব্যবস্থা আছে। যাঁরা বলরুমে নাচবেন, সে ব্যবস্থাও আছে।

***

খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেছে। নাচগানের অবসান। কেটি এখন একা, না, একা নয়, ভৌতিক অপচ্ছায়ারা এখনও রয়ে গেছে। কেটি লাইব্রেরিতে বসে আছেন। অতি দ্রুত মন চলে যাচ্ছে অতীতে। হঠাৎ কেমন যেন হতাশ হয়ে উঠলেন তিনি। হাসবাই চলে গেছে। আমি একা বসে আছি। লংফেলোর কবিতার কথা মনে পড়ল, স্মৃতির পাতাগুলো অন্ধকারে এক ব্যথার্ত শব্দতুলেছে।]

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি অন্ধকারে পৌঁছে যাব। কিন্তু অনেকের কথা ভাবতে হবে। ডেভিড, আমি খুব শিগগিরই তোমার কাছে যাব।

-দিদা?

কেটি চোখ খুললেন। পরিবারের সকলে ঘরে এসে গেছে। তিনি সকলের দিকে তাকালেন। হ্যাঁ, তার চোখ বুঝি এক ক্যামেরা। কোনো কিছুই আড়ালে যাচ্ছে না। কেটি ভাবলেন, আমার পরিবার, আমার অবিনশ্বরতা, একজন হত্যাকারী, একজন শয়তান, একজন উন্মাদ। হ্যাঁ, ব্ল্যাক ওয়েলের কঙ্কাল, এত বছরের আশা এবং যন্ত্রণা–শেষ অব্দি কী হল?

নাতনি জানতে চাইল –ঠাকুরমা, তুমি ভালো আছো?

-একটু ক্লান্ত লাগছে ভাই। বিছানাতে যাব।

কেটি সিঁড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলেন। তখনই হঠাৎ বাইরে ঝড়ের ইশারা, বিদ্যুৎ চমক। বৃষ্টি শুরু হল, মনে হচ্ছে, বুঝি মেশিন গান থেকে উৎক্ষিপ্ত বুলেট। পরিবারের সকলে দেখলেন, কেটি হেঁটে চলেছেন, মাথা উঁচু, অহংকারিক পদধ্বনি। আবার বিদ্যুৎশিখা। বাজের আর্তনাদ। কেটি নীচের দিকে তাকালেন। বললেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় একে আমরা ডন দ্য স্ট্রম বলতাম।

অতীত এবং বর্তমান হাতে হাত রেখেছে। এখন উনি বেডরুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। চারপাশে পরিচিত প্রিয় ভূতেরা ভিড় করেছে।

.

প্রথম খণ্ড

জেমি

১৮৮৩-১৯০৬

০১.

হ্যাঁ, সত্যি বৃষ্টিপাত দারুণ হয়ে উঠেছে। জেমি ম্যাকগ্রেগর বলল। স্কটিশ হাইল্যান্ডে গিয়েছিল, কিন্তু এমন ভয়ংকর ঝড় কখনও দেখেনি। বিকেল থেকেই আকাশে ঝড়ের ইশারা। সন্ধে হতে না হতেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। মনে হচ্ছে, পৃথিবী বোধ হয় আজ শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাবে।

জেমি একটা বাড়িতে ঢুকে পড়ল। কীভাবে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচা যায়, ভাবতে থাকল। এটা একটা ছোট্ট শহর। কিন্তু শহরটা বাঁচবে কি? মনে হচ্ছে ভাল নদীর জল দুকূল ছাপিয়ে বইতে শুরু করবে। তা হলে? হিরের খোঁজে পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষ দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছে, তাদের কী হবে?

জেমির দুচোখে স্বপ্ন ছিল। আঠারো বছর বয়সে সে ঘর ছেড়ে ছিল। ভেবেছিল, অনেক অনেক টাকা আয় করবে।

আট হাজার মাইল, হাইল্যান্ড স্কটল্যান্ড থেকে এডিনবরা, লন্ডন কেপটাউন এবং এখন ক্লিপড্রিফটে।

জেমির ব্যবসাটা বেশ ভালোই চলেছে। কিছুটা অংশ ভাইদের তুলে দিয়েছে। না, কারও সঙ্গেই সে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না।

অনেক কথাই মনে পড়ে যায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় কাটানো দিনগুলো, যখন এখানে প্রথম পা রেখেছিল, এক অনভিজ্ঞ কিশোর। আর আজ, তার খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীর সব থেকে বড়ড়া হিরে দক্ষিণ আফ্রিকাতেই পাওয়া যায়। বালির মধ্যে পড়ে থাকে। জায়গাটা এত ভয়ঙ্কর যে, সহসা মানুষ যেতে পারে না। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাদান এভাবেই সকলের চোখের সামনে পড়ে থাকে।

***

শনিবার সন্ধেবেলা, পরিবারের সকলের কাছে ডিনারের পরে খুশির খবরটা দিল। তারা অপরিচ্ছিন্ন টেবিলে পাশাপাশি বসেছিল।

জেমি বলল,–লাজুক কণ্ঠস্বরে –আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাচ্ছি, হিরের খনির সন্ধানে। আসছে সপ্তাহে বেরিয়ে যাব।

পাঁচজোড়া চোখ তার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে।

বাবা বলেছিলেন–সত্যি? তুই চলে যাচ্ছিস? রূপকথার গল্প মনে হচ্ছে।

–আগে কেন বলিসনি? ভাই আয়ান প্রশ্ন করল। এখন টাকা কোথায় পাব?

-আমার কাছে যদি টাকা থাকত, জেমি বলেছিল, আমি সোনার সন্ধানে যেতাম কি? সেখানে যারা যায়, তাদের হাতে টাকা নেই। আমি তাদের মতোই হব। আমার মাথায় বুদ্ধি আছে, আমার স্বাস্থ্যটাও ভালো। আশা করি আমাকে হারতে হবে না।

বোন ম্যারি বলেছিল অ্যানি এই খবরটা শুনলে কষ্ট পাবে। সে কিন্তু তোর বউ হতে চায়, জেমি।

জেমি বোনকে আদর করেছিল অল্প- হ্যাঁ, একটু বয়সে বড়। চব্বিশ, দেখলে মনে হয় চল্লিশ। জীবনে কোনো কিছু উপভোগ করতে পারে না। জেমি ভেবেছিল, এই ব্যাপারটা আমাকে পাল্টাতেই হবে।

মায়ের বুকে বাজ পড়ে ছিল বুঝি। তিনি সাবধানে প্লেটটা তুলে নিলেন। মুখে কোনো কথা বলতে পারলেন না।

মধ্যরাত, মা চুপি চুপি জেমির কাছে এসে দাঁড়ালেন। হ্যাঁ, হাত দিলেন জেমির মাথার ওপর। এবার বললেন তুই কি সত্যি চলে যাবি? আমি জানি না, সেখানে গিয়ে হিরে সত্যি পাবি কিনা। আমার হাতে কয়েক পাউন্ড আছে। তুই কি টাকা নিবি? ভগবান যেন তোর সহায় হন।

পঞ্চাশ পাউন্ড পাউচ নিয়ে সে এডিনবরা ত্যাগ করল।

***

দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছোনো খুব একটা সহজ নয়। এক বছর জেমি ম্যাকগ্রেগরকে পথে পথে ঘুরতে হয়েছিল। একবার এডিনবরার এক রেস্টুরেন্টে ওয়েটারের চাকরি নিল। আরও পঞ্চাশ শিলিং হাতে এল। তারপর চলে গেল লন্ডনে। ওই শহরটা দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। চারপাশে মানুষের ভিড়। শব্দ আর শব্দ। কী বড়ো বড়ো ঘোড়াগুলো বাস ঠেলছে। শামুকের মতো গতি ওই বাসগুলোর। ঘন্টায় পাঁচ মাইলের বেশি হবে না।

জেমি একটা জায়গায় মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছিল। সপ্তাহে দশ শিলিং করে লাগে। এত সস্তা সে ভাবতেই পারেনি। তারপর? তারপর জাহাজের সন্ধান করা, যে জাহাজটা দক্ষিণ আফ্রিকাতে যাবে। সমস্ত সন্ধে লন্ডন শহরের এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত। এক সন্ধ্যায় হঠাৎ ওয়েলসের যুবরাজ এডওয়ার্ডকে দূর থেকে দেখতে পেল। পাশে এক সুন্দরী

ভদ্রমহিলা। তিনি একটা সুন্দর হ্যাট পরেছেন মাথায়। জেমি ভাবল, আহা, আমার বোন যদি ওই রাজকুমারির মতো সুন্দরী হত?

জেমি ক্রিস্টাল প্যালেসের কনসার্টে গেল। ১৮৫১ সালে এখানে একটা গ্রেট এগজিবিশনের আসর বসেছিল। সে নানা সূত্র থেকে স্যাভয় থিয়েটার সম্পর্কে অনেক খোঁজ খবর নিল। এইভাবে লন্ডন শহরের খুঁটিনাটি অনেক কিছুই সে জেনে ফেলেছিল।

এই সব দুরন্ত অভিযান এবং উন্মাদনা সত্ত্বেও তখন ওর কাছে ইংল্যান্ডের আবহাওয়া বিষাক্ত বলে মনে হচ্ছে। সেই শীতে ইংল্যান্ডে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল। রাস্তায় কর্মহীন মানুষের ভিড়। ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার। মাঝে মধ্যেই জন প্রতিরোধ চোখে পড়ছে। জেমি শেষ পর্যন্ত ঠিক করল, আমি দরিদ্রতাকে জয় করার জন্য পথে বেরিয়েছি। তাই এখানে কিছুতেই থাকব না।

পরের দিন জেমি ওয়ালমার্ক ক্যাসেল নামে এক জাহাজে স্টুয়ার্টের চাকরি নিল। জাহাজটা চলেছে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনের উদ্দেশ্যে।

***

একুশ দিনের সমুদ্রযাত্রা পথে জাহাজ ম্যাডিরা এবং সেন্ট হেলেনাতে থেমেছিল। জ্বালানির জন্য আরও কয়লা নিতে হবে বলে। শীতকাল। জেমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। উথাল পাথাল ঢেউ। তবে মনের উৎফুল্ল অবস্থা তখনও হারায়নি। প্রত্যেকটা দিন নতুন সম্ভাবনা নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হত। জাহাজটা ক্রমশ নিরক্ষরেখার দিকে এগিয়ে গেল। আবহাওয়ার জগতে একটা পরিবর্তন ঘটে গেল। শীতের পরিবেশ কেটে গেছে,

বাতাসে উষ্ণতার পরশ। শেষ অব্দি জাহাজটা আফ্রিকার উপকূলে পৌঁছে গেল। দিন এবং রাতগুলো তখন আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

ওয়ালমার্ক ক্যাসেল কেপ টাউনে এসে থামল একদিন ভোরবেলা। ছোট্ট চ্যানেলের দিকে জেমি তাকিয়ে থাকল। এই চ্যানেলটা মূল ভূখণ্ড থেকে রবিন দ্বীপকে আলাদা করেছে। টেবিল বে নামে আর একটা উপসাগর আছে।

সূর্যোদয়ের আগে জেমি ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। সে চারদিকে তাকিয়ে সম্মোহিত হয়ে গেল। টেবিল মাউনটেনের ওপর সকালের সূর্যের আলো। জেমি ভূমিখণ্ডে পা রাখল।

***

কিছু অচেনা অজানা মানুষের ভিড়। এমন চেহারা সম্পন্ন মানুষের সাথে জেমির কখনও দেখা হয়নি। তারা হল বিভিন্ন হোটেলের দালাল। কালো কুচকুচে গায়ের রং। কেউ বা হলুদ, কেউ বাদামী, কেউ বা লাল রঙের চামড়ার। তারা নানা ধরনের কথা বলছে। কারোর কথা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কেউ কেউ খবরের কাগজ বিক্রি করছে। কেউ সন্দেশের ডালি সাজিয়ে বসে আছে, কেউ বা টাটকা তাজা ফল।

কত কী! মানুষের হৈ-হৈ, নাবিক এবং কুলিরা সেখান দিয়ে এগিয়ে চলেছে। জেমির সঙ্গে এক অদ্ভুত ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করা হচ্ছে। বেচারী জেমি, একটা শব্দের অর্থও সে বুঝতে পারল না।

***

কেপটাউন একটা অন্যরকম শহর। দুটো বাড়ির মধ্যে কোনো সদৃশতা নেই। পাশেই তিনতলার সমান মস্ত বড়ো ওয়্যারহাউস। ইট কিংবা পাথর দিয়ে তৈরি হয়েছে। গ্যালভানাইজড লোহা দিয়ে তৈরি ছোটো ক্যানটিন। তারপর একটা জুয়েলারির দোকান। তারপরেই খাবার দাবারের দোকান।

জেমি এখানকার মানুষদের দেখেও অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, এ বোধ হয় এক অন্য পৃথিবী, নানা দেশের মানুষ পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। চিনা ভদ্রলোকের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা। আপাতত দেখে মনে হচ্ছে কোথাও কোনো সংঘাত নেই। লালমুখো সুদেহ বোর কৃষকদের দেখা গেল। সূর্যদীপ্ত তাদের চুল। তারা ওয়াগনে আলু ভর্তি করছে। আছে নানা সবুজ শাক সবজি। অনেকে আবার কোট-প্যান্ট পরে এগিয়ে চলেছে মাথা উঁচু করে। কারও কারও মুখে জ্বলন্ত পাইপ। জেমি বুঝতে পারল, এ এক আজব পৃথিবী।

এবার একটা বোর্ডিং হাউসে যেতে হবে। শেষ পর্যন্ত এক মধ্যবয়সিনী বাড়িউলির কাছে আশ্রয় নিতে হল। ভদ্রমহিলা জেমির দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বলেছিলেন, না, জেমির দুর্ভাগ্য, তিনি বিন্দু-বিসর্গ কিছুই বুঝতে পারেননি।

মাথা নেড়ে জেমি বলল–আমি দুঃখিত, আমি বুঝতে পারছি না।

-ইংরাজি ভাষা? তুমি এখানে কেন এসেছ? সোনার সন্ধানে? হিরের খনি, তাই তো?

–হিরে, হ্যাঁ, ম্যাডাম।

ভদ্রমহিলা জেমিকে ভেতরে নিয়ে গেলেন- এই জায়গাটা তোমার ভালোই লাগবে। তোমার মতো যুবকদের জন্য আমি সবকিছু সাজিয়ে রেখেছি।

...আমার নাম মিসেস ভেনস্টার, আমার বন্ধুরা আমাকে দিদি বলে ডাকে।

উনি হেসে উঠলেন। সোনায় বাঁধানো দাঁত ঝিলিক দিল। আবার উনি বললেন –মনে হচ্ছে, আমরা একে অপরের বন্ধু হয়ে উঠব। কোনো কিছু দরকার হলে ইতস্তত করো না, কেমন?

জেমি বলল–আপনি বলতে পারেন, কোথায় গেলে এই শহরের একটা ম্যাপ পাব?

***

ম্যাপ হাতে নিয়ে জেমি অভিযানে বেরোবার চেষ্টা করল। শহরের চারপাশে আরও অনেকগুলো ছোটো ছোটো উপনগরী আছে। তারই কোনো একটা থেকে কাজ শুরু করতে হবে। অনেক মাইল জুড়ে ছড়ানো এই শহরতলী, অন্যদিকে সমুদ্রসৈকত, আছে গ্রিন পয়েন্ট। জেমি মাঝে মধ্যে সময় পেলে বসত অঞ্চলের দিকে চলে যেত। কখনও বা স্ট্যান্ড স্ট্রিট এবং ফ্রি স্ট্রিট দিয়ে হাঁটত। পাশাপাশি অনেকগুলি বাড়ি, তাকিয়ে থাকত আকাশের দিকে, মনে হচ্ছে, বাড়িগুলি বোধ হয় আকাশের সঙ্গে মিতালী করেছে। আবার কখনও একটু দূরে চলে যেত। হ্যাঁ, একদল বিষাক্ত মাছি এসে মাঝে মধ্যে উৎপাত

করত। শেষ অব্দি জেমি তার বোর্ডিং হাউসে ফিরে আসত। দেখত ঘরে ওই বিষাক্ত মাছির ভিড়। টেবিলে চেয়ারে থিকথিক করছে।

সে বাড়িউলির সাথে দেখা করে বলল–মিসেস ভেনস্টার, কীভাবে এই মাছিগুলোর আসা বন্ধ করা যায় বলুন তো।

উনি হেসে বলেছিলেন–না, দুঃখ করো না। একদিন তুমি এদের সাথেই মিতালী পাবে।

কেপটাউনের জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা আদিম এবং অপর্যাপ্ত। সূর্য অস্ত যাবার পর একটা বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোত। মনে হত, এ বুঝি নরকের অন্ধকার। গন্ধটা সহ্য করা যায় না। জেমির মাথা ঘুরত। কিন্তু এখান থেকে আমি বেরোব কী করে? জেমি ভাবত, টাকার থলেটা ভর্তি না হওয়া অব্দি আমার কিছু করার নেই।

কেপটাউনে দ্বিতীয় দিন জেমি একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিল। ঘোড়ায় চড়ে জিনিসপত্র চলেছে। তৃতীয় দিন সে একটা রেস্টুরেন্টে কাজ করার চেষ্টা করল। হ্যাঁ, এভাবেই তার ভাগ্যের সাথে লড়াই শুরু হল। সেখানে এঁটো কাপডিশ ধুতে হত। ফিরে আসত বোর্ডিং হাউসে। কত কথাই মনে পড়ে যেত। আহা, বাড়ির সেই দিনগুলো, এখন কী আর ফিরে আসবে? তবুও দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই শুরু হল।

শেষ পর্যন্ত ওই সোনায় মোড়া দিনটা এল। দুশো পাউন্ড এসে গেল জেমির পকেটে। এবার যেতে হবে, কেপটাউনকে গুডবাই জানিয়ে। কোথায়? কেন? ওই হিরের খনির সন্ধানে।

***

ক্লিপড্রিফট ইংল্যান্ড ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির গাড়ি এগিয়ে চলেছে। জেমি সকাল সাতটায় সেখানে নেমে পড়ল। জায়গাটাতে অসংখ্য মানুষের ভিড়। হাজার-হাজার ভাগ্যান্বেষী নানা দেশ থেকে এসে ভিড় জমিয়েছে। রাশিয়া এবং আমেরিকা ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি এবং ইংল্যান্ডের মানুষদের চোখে পড়ল। তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলছে। প্রত্যেকেই নিজের দাবি পেশ করার চেষ্টা করছে। জেমি একটু দূর থেকে সব দাঁড়িয়ে দেখছিল, এক আইরিশ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করল–এত হৈ-হট্টগোলের কারণ কী?

ভদ্রলোক কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিলেন-আগামী ছ সপ্তাহের জন্য জায়গা পাওয়া যাবে না। তাই এত হুড়োহুড়ি। ব্যাপারটা খুবই খারাপ। সারা পৃথিবীর খচ্চরের দল এখানে জমা হয়েছে।

-কিন্তু অন্য কোনো উপায় কি নেই?

–হ্যাঁ, উপায় আছে। ডাচ এক্সপ্রেস অথবা পায়ে হেঁটে।

–ডাচ এক্সপ্রেস মানে কী?

-গোরুর গাড়ি, ঘণ্টায় দু মাইল বেগে এগিয়ে যাবে। যখন তুমি ওখানে পৌঁছোবে, তখন সব হিরে হাপিস হয়ে গেছে।

জেমি ম্যাকগ্রেগরের দেরি করার ইচ্ছে ছিল না। সে অন্য কোনো পথের সন্ধানে মগ্ন থাকল। কিন্তু পথ কোথায়? দুপুরবেলা হঠাৎ একটা উপায় হাজির হল তার সামনে। সে একটা আস্তাবলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। দেখল, সেখানে লেখা আছে, মেল ডিপো। ভেতরে চলে গেল। হ্যাঁ, পৃথিবীর সব থেকে রোগা লোকটি একটা গাড়িতে চিঠিপত্র বোঝাই করছিল।

জেমি তার দিকে তাকিয়ে বলল–আপনি কি চিঠিপত্র নিয়ে ক্লিপড্রিফটে যাচ্ছেন?

–হ্যাঁ।

জেমির মনে আশার সঞ্চারণ–আপনি যাত্রী নেবেন না?

–কোনো কোনো সময়, ভদ্রলোক জেমির দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার বয়স কত?

–আঠারো। কেন কী হয়েছে?

–কুড়ি-একুশ বছরের পর হলে আমরা নিই না। তোমার স্বাস্থ্য ভালো তো?

আর একটা অদ্ভুত প্রশ্ন–হ্যাঁ, স্যার।

রোগা লোকটা হাত বাড়িয়ে বলল–ঠিক আছে, কুড়ি পাউন্ড ভাড়া লাগবে কিন্তু।

জেমি বিশ্বাস করতে পারছে না, ভাগ্য প্রসন্ন হবে।

–ঠিক আছে, আমি স্যুটকেস নিয়ে আসছি।

–না, স্যুটকেস নিতে পারবে না। এখানে তুমি একটা শার্ট আর টুথব্রাশ নিতে পারবে।

জেমি আবার ওই লড়ঝড়ে গাড়িটার দিকে তাকাল–হ্যাঁ, খুবই ছোটো এবং কোনোরকমে তৈরি করা হয়েছে। চারপাশে কাগজের স্তূপ। চিঠিপত্র, খাতা, আরও কত কী? গুটিসুটি মেরে একটা লোক হয়তো ড্রাইভারের পেছনে বসে থাকতে পারে। বোঝা গেল, যাত্রাটা খুবই খারাপ হবে।

জেমি বলল–ঠিক আছে, আমি শার্ট আর টুথব্রাশ নিয়ে আসছি।

জেমি ফিরে এল। একটা ঘোড়াকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুজন সুদেহ যুবক গাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একজন খর্বাকৃতি এবং কালো, অন্যজন লম্বা এবং ফরসা। ড্রাইভার তাদের হাতে কিছু টাকা দিল।

জেমি ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল–আমি যাব তো?

ড্রাইভার বলল–হা, এটাকে চাবুক মারো।

জেমি রোগা হাড় জিরজিরে ঘোড়ার ওপর চাবুক চালাতে শুরু করল। সে অবাক হয়ে দেখল তাকে ঠেলেঠুলে গাড়ির ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ওই দুজনের সঙ্গে ভাব জমাতে হল। বেঁটেখাটো নোকটার নাম ওয়ালচ আর লম্বা লোকটার নাম পিডারসন।

শেষ পর্যন্ত জেমি বলল –এই গাড়িটা পেলাম বলেই তাড়াতাড়ি পৌঁছোতে পারছি, তাই না?

পিডারসন বলল–এই গাড়িগুলো সম্পর্কে তোমার কী ধারণা ম্যাকগ্রেগর? দেখো, রাস্তায় কত ঝামেলা হবে।

জেমি গাড়ির মধ্যে কোনোরকমে বসে আছে। দুপাশে দুই সহযাত্রী। একে অন্যের সঙ্গে চেপটে গেছে। হাঁটু মোড়া যাচ্ছে না। পেছনে ড্রাইভারের সিট, না, নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গা নেই।

ড্রাইভার গান গাইতে থাকল। একটু বাদে তারা কেপটাউনের বড়ো রাস্তায় এসে পড়েছে। পথ চলে গেছে ক্লিপড্রিফটের হিরের খনির দিকে।

গোরুর গাড়ির পথ চলাটা খুব একটা খারাপ নয়। তবে বেশি সময় লাগে, এই আর কী। যে গাড়িগুলো এই ডাক বহন করে, সেটা কোথাও থামে না। মাঝে মধ্যে ঘোড়া পালটাতে হয়। ড্রাইভারও পালটে যায়। অত্যন্ত দ্রুত চলতে থাকে। উঁচু-নীচু এবড়ো-থেবড়ো পথ। মাঝে মধ্যে মনে হয়, গাড়িটা বুঝি একদিকে হেলে পড়ছে। সে এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। জেমি দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকল। সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল- হায়, আমি যেন ঠিকমতো পৌঁছোতে পারি। রাতের অন্ধকার নেমে আসার আগে দশ মিনিটের বিরতি দেওয়া হল। নতুন ঘোড়া নিয়ে আসতে হবে। আবার গাড়িটা জোরে ছুটতে শুরু করবে।

জেমি প্রশ্ন করেছিল-আমরা কিছু খাব না?

নতুন ড্রাইভার দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে জবাব দিল–না, আমরা সোজা ওখানে চলে যাব। মনে রেখো, আমরা ডাক বহন করছি, মানুষ নয়।

আবার দীর্ঘ রাতের বুক চিরে যাত্রা। নোংরা রাস্তা, চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত। মনে হচ্ছে, আর বোধহয় থাকা সম্ভব নয়। জেমির শরীরের প্রতি ইঞ্চিতে ব্যথা জেগেছে। সে একেবারে ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত। মাঝে মধ্যে চোখ বন্ধ করার চেষ্টা করছে। সম্ভব না, প্রচণ্ড আঁকুনি। চোখ খুলে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় দিন এবং রাত কেটে গেল। যন্ত্রণা আকাশ ছুঁয়েছে। জেমির সহযাত্রীরা কোনোরকমে টিকে আছে। কারও কাছে অভিযোগ জানাচ্ছে না। জেমি বুঝতে পারছে, কেন ড্রাইভার বারবার অল্প বয়সি ছেলের সন্ধান করছিল, কেন বলেছিল, স্বাস্থ্যটা ভালো থাকা দরকার।

পরের দিন ভোরবেলা। গাড়িটা গ্রেট প্যারোতে ঢুকে পড়ল। ওখান থেকেই বন্য ধূসরতা শুরু হয়েছে। তা চলে গেছে অসীম অনন্তের দিকে। মনে হচ্ছে, এখানে বোধহয়, মানুষের প্রবেশ নিষেধ।

হাওয়া দিচ্ছে, তারই পাশাপাশি সূর্যের আলো। জেমি দেখতে পেল, একদল লোক পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলেছে। কেউ কেউ আবার ঘোড়ার পিঠের যাত্রী, অনেকে গোরুর গাড়িতে চলেছে ভাগ্য অন্বেষণে। অদ্ভুত এই অভিযান।

বড়ো বড়ো বাড়িগুলো বেরিয়ে গেল। অনেক দূরে দেখা গেল ক্লিপড্রিফটের আকাশরেখা।

অরেঞ্জ নদী পার হতে হল। এখানে একটুখানি অন্যরকম পরিবেশ। দুপাশে সবুজ ভূমি। তৃণখণ্ড, সুন্দর বাতাস।

জেমি মনে মনে ভাবল, শেষ পর্যন্ত আমি আমার ভাগ্য পালটাতে পেরেছি। হ্যাঁ, আমি পালটাবই। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

হামাগুড়ি দেবার চেষ্টা করল। সম্ভব হল না। কী ঘটবে। কেউ জানে না। ওই তো, ক্লিপড্রিফট শহরের উপকণ্ঠ। ভাল নদী দেখা যাচ্ছে। রাস্তা চলে গেছে শহরের ভেতর দিকে। দোকানের সারি চোখ পড়ল। আরও কত কী। ক্যান্টিন, বিলিয়ার্ড রুম, খাবারের হোটেল, আইন বিশারদদের অফিস। এক কোণে রয়াল আর্চ হোটেল। এমন কতগুলো ঘরের সমাহার, সেখানে কোনো জানালা নেই।

জেমি গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। মাটিতে পা দিল। পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে, দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। মাথা বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে।

খানিক পরে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। এবার কোনোরকমে হোটেলের দিকে যেতে হবে। মানুষের ভিড় ঠেলে ঠেলে। যে ঘরটা তাকে দেওয়া হয়েছিল, সেটা গনগনে আগুনে তপ্ত। চারদিকে কালো কালো মাছির সমাহার। ভাগ্য ভালো, সেখানে একটা খাট আছে। জেমি খাটে শুয়ে পড়ল। পোশাক পরা অবস্থায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। আঠারো ঘণ্টা পর তার ঘুম ভেঙে ছিল।

***

জেমির ঘুম ভেঙে গেল। দেহের সর্বাঙ্গে ব্যথা। মনে হচ্ছে, আত্মাও বুঝি কাঁদছে। আমি এখানে এসেছি, জেমি ভাবল। ভীষণ খিদে পেয়েছে। কোথায় খাবার পাওয়া যাবে। এই হোটেলে কিছুই দেওয়া হয় না। পাশে একটা জনাকীর্ণ রেস্টুরেন্ট চোখে পড়ল। সেখানে কিছু খাবার পাওয়া যেতে পারে হয়তো। অদ্ভুত দেখতে একটা মাছ খেল। ভাজা মাছ। তারপর? শরীরটা একটু তাজা হল। কিন্তু কেমন যেন লাগছে। ভালো লাগছে না কোনো কিছুই। জেমি চারদিকে তাকাবার চেষ্টা করল।

অনেকে চিৎকার করে কথা বলছে। সকলেই কথা বলছে হিরে সম্পর্কে।

কেউ কেউ বলছে কেপটাউনের আশেপাশে কিছু হিরে এখনও আছে। কিন্তু নিউরাসই হল হিরের আসল খনি।

কেউ আবার জবাব দিল–জোহানসবার্গ থেকে কিম্বলিংর জনসংখ্যা বেড়ে গেছে।

এই কথাগুলো মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করল জেমি, সে জানে, এই কথার মধ্যে লুকিয়ে আছে আসল সূত্র। হ্যাঁ, চারদিকে শুধু হিরে, আর হিরে। তরুণ জেমি এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, সে কফি খাওয়া শেষ করতে পারল না। সে টাকাটা দিয়ে দিল। দু পাউন্ড তিন শিলিং। জেমি ভাবল, আমাকে খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে।

একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল–ম্যাকগ্রেগর, এখনও কি বড়ো হওয়ার কথা চিন্তা করছ?

জেমি তাকাল–পিডারসন, সেই সুইডিস যুবক, যে গাড়িতে সহযাত্রী ছিল।

–হ্যাঁ, জেমি জবাব দিল।

–তাহলে চলো, সোনার খনিতে ফিরে যাই। ভাল নদীর ধারে।

এবার পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু করল।

ক্লিপড্রিফটের চারদিকে উঁচু উঁচু পাহাড় আছে, এত উঁচু যে, ঘাড় উঁচু করেও দেখা যায় না। বাতাসে গুঁড়ো গুড়ো ধুলো। নদীটা এখনও কিছুটা দূরে। নদীর দুপাশে হাজার হাজার উৎসাহী মানুষের মিছিল এগিয়ে চলেছে। কেউ হয়তো এই মাত্র হিরের খনি থেকে ফিরে এসেছে। কেউ আবার হিরের খনির সন্ধানে চলেছে। নানাধরনের কথাবার্তা বলছে তারা।

জেমি এবং পিডারসন নদীর ধার ধরে হাঁটছে। অনেক দৃশ্য চোখে পড়ছে। কারও কারও শার্ট ঘামে ভিজে গেছে, কারও মুখে ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্ট।

যেতে যেতে পিডারসন বলল তুমি কি জানো, কত ভাগ্যান্বেষী মানুষ এখানে এসেছে? তারা সবাই হিরের খনির মালিক হতে চাইছে। শেষ পর্যন্ত কে যে জিতবে, বুঝতে পারা যাচ্ছে না। মাঝে মধ্যে অ্যাকসিডেন্ট ঘটে যায়। তবুও আশার শেষ নেই।

জেমি বলল–তুমি ঠিক বলেছ, আমরা পরিশ্রমের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাব। কিছু ছাড়ব না।

পথটা আরও খারাপ হয়েছে। চারপাশে মৃত জীবজন্তুর শরীরের অংশ ছড়ানো আছে। আকাশে শকুন উড়ছে। এখানেই বোধহয় প্রাতঃকৃত্য সারতে হবে। তারপর?

পিডারসন জানতে চাইল–এবার আমরা কোনদিকে যাব?

জেমি বলল –চলো, আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই।

***

শহরের মধ্যিখানে একটা পাহাড়ের ফলক রয়েছে। সেটা পথনির্দেশিকা। জেমির বয়সী একটা লম্বা লোক মাথা থেকে ওয়াগন নামিয়ে রাখল। তার শরীরটা খুবই ভালো। পাকানো গোঁফ আছে। জেমি এই ধরনের সুন্দর মানুষ খুব একটা বেশি দেখেনি। চোখের তারা কী। যেন বলতে চাইছে। গর্বিত ভঙ্গিমা। লোকটা জেমিকে দেখতেই পেল না। সে আবার সামনের দিকে এগিয়ে চলল। একটা বোর কৃষক দেখা গেল। খচ্চরের পিঠে বসে সামনে এগিয়ে আসছে।

সে বলল–বান্দা, মিস্টার ভ্যানডারের হয়ে কাজ করবে তো? কোথায় এগুলো রাখব, আমি কিছুই জানি না।

এই জায়গাটা অন্ধকার। ঠাণ্ডা। বাইরের গরমের থেকে মুক্তি পাওয়া গেল। জেমি সামনের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল। একটু বাদে একটা সুরেলা সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। জেমি তাকিয়ে দেখল, অল্প বয়সী এক কিশোরী কন্যা। কতই বা বয়স হবে? পনেরো হবে হয়তো। ভারী সুন্দর আকর্ষণীয় মুখচ্ছবি। দুটি সবুজ চোখের তারায়

উত্তেজনার ঝিলিক। চুলের রঙ কালো এবং কোঁচকানো। জেমি তার অসাধারণ অবয়বের দিকে তাকিয়ে থাকল। ভাবল, হা, মনে হচ্ছে, নারীত্বের প্রথম উদ্ভাস, মেয়েটি বোধহয় ষোড়শী।

জেমি নিজের কথা জাহির করল–আমি কিছু জিনিস কিনতে এসেছি।

–কী চাইছ?

— জেমির মনে হল, এই মেয়েটির মধ্যে একটা আলাদা আকর্ষণী ক্ষমতা আছে।

–যা যা লাগে, এই আর কী!

মেয়েটি হাসল, চোখের তারায় দুষ্টুমির আভাস।–কী লাগে, তুমি না বললে কী করে বুঝব?

-হাতা খুন্তি আছে?

–তুমি সব পাবে।

বোঝা গেল মেয়েটি জেমির পেছনে লেগেছে। জেমি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল–আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?

মেয়েটি জেমির দিকে তাকিয়ে হাসল। এই হাসির মধ্যে নারীত্বের আভাস আছে। সে বলল–তুমি কীভাবে জীবনটা শুরু করতে চাইছ, সেটা আমাকে বলো। তোমার নাম কী?

-ম্যাকগ্রেগর, জেমি ম্যাকগ্রেগর।

–আমার নাম মার্গারেট। মেয়েটি এবার এক কোণায় চলে গেল।

–মার্গারেট, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমি খুশি হয়েছি।

–তুমি কি এখুনি এসেছ?

–হ্যাঁ, গতকাল। যে গাড়িতে ডাক আসে, সেই গাড়িতে চড়ে।

মেয়েটি চিৎকার করে উঠল সর্বনাশ, এ ব্যাপারে এখনই আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কত লোক ওখান থেকে পড়ে মারা গেছে, তুমি কি জানো?

-এই তো আমি দিব্যি বেঁচে আছি।

–তুমি কেন এসেছ? হিরে খুঁজবে তো?

–হ্যাঁ।

আবার মেয়েটি হেসে উঠল–তুমি কি জানো আমরা ডাচভাষায় হিরেকে কী বলি? দামী পাথরের নুড়ি।

-তোমরা কি ওলন্দাজ?

–হ্যাঁ, আমার পরিবার হল্যান্ড থেকে এসেছে।

–আমি স্কটল্যান্ড থেকে এসেছি।

–আমি তা বুঝতে পারছি।

মেয়েটির চোখে আবার অন্তরঙ্গতার চাউনি এখানে অনেক হিরে আছে ম্যাকগ্রেগর, কিন্তু তোমাকে দেখতে হবে, সঠিক খনির কাছে যেন পৌঁছাতে পারো। বেশির ভাগ লোকরাই ভুলভাল জায়গায় ছুটোছুটি করে। ঘাম ঝরায়, ক্লান্তি আসে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না।

-আমি কী করে বুঝব সব কিছু?

-আমার বাবা এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে। সে খুবই ওস্তাদ। এক ঘণ্টা পর কাজ থেকে ছুটি পাবে।

–আমি একঘণ্টা পরে আসছি। ধন্যবাদ, মিস।

জেমি বাইরে বেরিয়ে এল। মনে নতুন আশার সঞ্চারণ। শরীরের সব ক্লান্তি কোথায় চলে গেছে। সলোমন যদি এই কাজটা করতে পেরে থাকে, তাহলে আমি কেন পারব না? না, আবার ওই মেয়েটির কাছে আসতেই হবে। মনে মনে জেমি হেসে উঠল। এই তো, এখন আমাকে আরও অনেক বছর পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকতে হবে।

***

জেমি প্রধান রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। একটা কামারশালা চোখে পড়ল। বিলিয়ার্ড হল। অনেকগুলো সেলুন। সে একটা হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল। সাইনবোর্ডে লেখা আছে-সকাল ছটা থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত ভোলা থাকে। এখানে ড্রেসিংরুমের ব্যবস্থা আছে। আর ইচ্ছে করলে আপনি গরম এবং ঠাণ্ডা জলে চান করতে পারবেন।

জেমি ভাবল, শেষবারের মতো কবে চান করেছিলাম? হ্যাঁ, সেই নৌকোতে এক বাকেট জল পেয়েছিলাম। তারপর? মনে হল, আমার গা দিয়ে নিশ্চয়ই দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। বাড়িতে কী সুন্দর চান করার সুযোগ ছিল। মার গলা বোধহয় শুনতে পেল।–জেমি, চান না করে খেতে আসবি না!

জেমি সেলুনের ভেতর ঢুকে পড়ল। দুটো দরজা আছে। একটা মেয়েদের জন্য, একটা ছেলেদের জন্য। জেমি ছেলেদের বাথরুমে ঢুকে পড়ে জানতে চাইল–কত খরচা লাগবে?

-ঠাণ্ডা জলে স্নানের জন্য দশ শিলিং আর গরম জলে পনেরো।

জেমি ভাবল, এই দীর্ঘ অভিযাত্রার পর গরম জলে চান করলেই ভালো হত।

শেষ পর্যন্ত সে বলল–ঠাণ্ডা জল। না, এইভাবে পয়সা নষ্ট করা উচিত হবে না। এখন কিছু জিনিস কিনতে হবে, যা দিয়ে খনিতে দাগ কাটা যেতে পারে। অর্থাৎ কোদাল, গাঁইতি, বেলচা ইত্যাদি।

একটা ছোটো সাবান জেমির হাতে তুলে দেওয়া হল। দেওয়া হল একটা ছোট্ট তোয়ালে। বলা হল, ওই দিকে চলে যান।

জেমি একটা ছোটো ঘরে ঢুকে পড়ল। সেখানে মস্ত বড়ো একটা বাথটব আছে। কতগুলো মগ ছড়ানো রয়েছে।

-মিস্টার, সব কিছু তৈরি। এবার কাজটা শুরু হোক।

লোকটা চলে গেল। জেমি জামাকাপড় খুলল। এবার জলের টাবে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল। হ্যাঁ, বিজ্ঞাপনের মতোই জলটা ঠাণ্ডা। ভীষণ ঠাণ্ডা। জেমি বেশ কিছুক্ষণ সেখানে চুপ করে বসে রইল। সাবান মাখল, পা থেকে মাথা অব্দি। তারপর টাব থেকে বেরিয়ে এল। জলটা কালো হয়ে গেছে। যতটা সম্ভব, তোয়ালে দিয়ে নিজেকে শুকনো করল। ভোয়ালেটা একেবারে ছেঁড়া, কম্বল দিয়ে তৈরি, গা কুটকুট করছে। জামাকাপড় পরে নিল। শার্টে-প্যান্টে কাদা লেগেছে। ঘামের গন্ধ। কিন্তু কী আর করা যাবে? অন্য সময় হলে হয়তো এগুলো পরত না। এখন আর একটা জামাকাপড় কিনতে হবে। হ্যাঁ, যেটুকু টাকা আছে সাবধানে খরচ করতে হবে। আবার খিদে পেয়েছে।

জেমি বাথরুম থেকে বাইরে এল। রাস্তায় অসংখ্য মানুষের ভিড়। সে একটা দোকানে বসে বিয়ারের জন্য বলল। লাঞ্চের অর্ডার দিল। যা পাওয়া যায়, তাই ভালো।

এখানেও হিরের গল্প হচ্ছে।

বোঝা গেল, এখানকার সব লোকই হিরের সন্ধানে মগ্ন।

আবার মার্গারেটের দোকান। মার্গারেট তখনও কাজে ব্যস্ত ছিল। এবার বাবার সঙ্গে দেখা হল। রোগা চেহারার একজন মানুষ। মুখটাও খুবই রোগা। তার মাথায় চুলের সংখ্যা কমে এসেছে। চোখের তারা কালো এবং চোখটা ছোটো। নাকটা চ্যাপটা।

জেমি নিজের পরিচয় দিল। বলল–আমি জেমি, স্কটল্যান্ড থেকে এসেছি হিরের সন্ধানে।

–তাতে কী হয়েছে? লোকটার কণ্ঠস্বর কর্কশ।

–আমি শুনেছি, আপনি নাকি এইরকম লোকদের সাহায্য করেন।

লোকটা এবার চিৎকার করতে শুরু করেছেন–কে এসব গুজব ছড়াচ্ছে বলুন তো? হ্যাঁ, আমি মালপত্র বিক্রি করি, সকলে ভাবে আমি যেন সান্তাক্লজ।

-আমার কাছে ১২০ পাউন্ড আছে, জেমি চিৎকার করে বলতে চাইল। আমাকে কিছু জিনিসপত্র দেবেন? অন্তত কোদাল, বেলচা এসব। আমি দেখব, হিরের খনির সন্ধান পাই কিনা।

ভদ্রলোক চোখের দৃষ্টিতে জেমির পা থেকে মাথা অব্দি চাটতে থাকলেন। তারপর বললেন আপনি কী করে ভাবলেন যে, রাতারাতি রাজা হয়ে উঠবেন?

আমি পৃথিবীর ওই প্রান্ত থেকে এসেছি, আমি ফিরে যাব না। বড়ো লোক না হওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। আমি জানি ওখানে হিরে আছে, সেগুলো বার করতেই হবে। যদি আপনি আমাকে সাহায্য করেন, তাহলে আমরা দুজনেই ধনী হয়ে উঠব।

ভদ্রলোক কী একটা শব্দ করলেন। জেমির দিকে পেছন ফিরে তাকালেন। তখন তিনি কাজ করে চলেছেন। জেমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল। কী হবে বুঝতে পারছে না। কাজ শেষ হয়ে যাবার পর ভদ্রলোক আবার বললেন–এখানে কী করে এসেছেন? গোরর গাড়িতে?

না, আমি ডাকবাক্সের গাড়িতে এসেছি।

ভদ্রলোকের মুখে একটা অদ্ভুত হাসি। উনি বললেন–ঠিক আছে, আমরা কথা বলতে পারি।

***

সেই সন্ধেবেলা ডিনারের আসর, এই দোকানটার পেছন দিকে। এটাই হল ওই ভদ্রলোকের থাকার জায়গা। ছোট্ট ঘর, এটাকেই কিচেন, ডাইনিং রুম এবং ঘুমোবার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দুটো খাট পাশাপাশি আছে। কাদা এবং পাথর দিয়ে বাড়িটা তৈরি হয়েছে। ওপর দিকে কাঠবোর্ডের বাক্স আছে। মাঝে মধ্যে গর্ত চোখে পড়ছে, সেগুলি বোধহয় জানালা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। বৃষ্টির সময় কী হয়? জেমি বুঝতে পারল, ওখানে কাঠবোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়।

ভদ্রলোকের নাম ভ্যানডার, একটু বাদে তার মেয়েকে দেখা গেল। সে সযত্নে রাতের খাবার তৈরি করছে। মাঝে মধ্যে বাবার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাচ্ছে। কিন্তু সে কখনও জেমির দিকে তাকায়নি। সে কেন এত চিন্তিত এবং ভয়ার্ত? জেমি ভাবল।

ওঁরা দুজনে টেবিলের মুখোমুখি বসলেন। ভ্যানডার শুরু করলেন–যদি ঈশ্বরের আশীর্বাদ থাকে, তাহলে তো আমরা জিততে পারব। হে ঈশ্বর, এত ঐশ্বর্য ছড়ানো চারদিকে, কিন্তু আমরা তার সন্ধান পাচ্ছি না। শেষ অব্দি তুমি পাবে কিনা বলতে পারি না।

ডিনারটা খুব একটা খারাপ নয়। মোটামুটি উতরে গেছে।

খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। ভ্যানডার আবার বলতে শুরু করলেন মাত্র কয়েক টুকরো হিরে, আর হাজার হাজার লোক। ব্যাপারটা ভাবতেই আমার গা ঘিনঘিন করে। ওদের মাথায় কিছু নেই।

–তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ?

-হ্যাঁ, স্যার। কিন্তু কীভাবে শুরু করতে হবে?

–ব্রিপোয়া।

জেমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

–এরা হল আফ্রিকার এক উপজাতি। উত্তরাংশে বসবাস করে। ওরা অসাধারণ ক্ষমতায় হিরের খনির সন্ধান করে। কোনো কোনো সময় সেই হিরে ওরা আমার কাছে নিয়ে আসে। আমরা ব্যবসা করি, হিরের বদলে জিনিসপত্র তাদের হাতে তুলে দিই।

ওলন্দাজ ভদ্রলোক মাথাটা নীচু করলেন। গোপন কোনো খবর শোনাচ্ছেন, এমনভাবে বললেন- আমি জানি, ওরা কোথায় এই হিরেগুলো পায়।

-কিন্তু আপনি কেন যান না?

ভ্যানডার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন–না ভাই, সে উপায় নেই। দোকান ছেড়ে যাব কী করে? লোকে চুরি করতে শুরু করবে। কাউকে এমন চাই, যাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি। যে ওই হিরেগুলো নিয়ে এসে আমার কাছে ফিরে আসবে। যখন আমি সঠিক লোকের সন্ধান। পাব, তখন তার হাতে সমস্ত জিনিসপত্র তুলে দেব।

অনেকক্ষণ ধরে পাইপে ধূম উদগীরণ করলেন তিনি। তারপর বললেন, সেই লোককে আমি বলব, সত্যি সত্যি কোথায় গেলে হিরে পাওয়া যেতে পারে।

জেমি উঠে দাঁড়াল। তার হৃৎপিণ্ড শব্দ করতে শুরু করেছে। মি. ভ্যানডার, আমি হলাম সেই মানুষ যাকে আপনি এতদিন খুঁজছিলেন। আমাকে আপনি একশো ভাগ বিশ্বাস করতে পারেন। আমি সারাদিন কাজ করতে পারি।

কণ্ঠস্বর পালটে গেছে, সেখানে এখন উত্তেজনার আভাস।

জেমি আবার বলল–আমি সব হিরে আপনার কাছে এনে জমা দেব। আপনি গুনে নেবেন।

ভ্যানডার সাবধানে তাকিয়ে থাকলেন–হ্যাঁ, জেমির কথা শুনে মনে হচ্ছে তাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে হয়তো। শেষ অব্দি ভ্যানডার বললেন–হ্যাঁ, ঠিক আছে, কাজটা শুরু হবে।

***

পরের দিন সকালে জেমি একটা শর্ত লেখা কাগজে সই করল। আফ্রিকান ভাষাতে লেখা হয়েছে।

ভ্যানডার বললেন আমি তোমাকে সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমরা এখন থেকে পুরো অংশীদার হলাম। আমি অর্থ দেব, যাকে মূলধন বলা যায়। তুমি পরিশ্রম দেবে। কিন্তু সব কিছু আধাআধি বখরা হবে।

জেমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ওই চুক্তিপত্রটার দিকে। এখানে কী সব লেখা হয়েছে, যা জেমির মাথায় ঢুকছে না। সে শুধু মাত্র একটা সংখ্যা বুঝতে পারল, দু পাউন্ড।

জেমি জানতে চাইল –এটার অর্থ কী মি. ভ্যানডার?

-এটার অর্থ হচ্ছে, তুমি অর্ধেক হিরে পাবে। এছাড়া প্রত্যেক সপ্তাহে কাজের জন্য। তোমাকে দু পাউন্ড করে দেওয়া হবে। আমি জানি, ওখানে হিরে আছে। তুমি হয়তো কিছুই পেলে না। তাহলেও যাতে তোমার বেগার খাটানি না হয়, তাই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভদ্রলোককে আরও সৎ বলে মনে হল–অনেক-অনেক ধন্যবাদ স্যার। জেমি এগিয়ে এসে হাতে হাত দিল।

ভ্যানডার বললেন–এবার তোমার যাত্রা শুরু হবে।

***

দুঘণ্টা সময় লাগল, সব জিনিসপত্র ঠিক করতে। ছোটো একটা তাবু সঙ্গে নিতে হবে। বেডিং, রান্নার জিনিসপত্র, কোদাল, বেলচা, বাঁকের ঝুড়ি ইত্যাদি। পোশাকও কিনতে তারপর? লণ্ঠন এবং মোমবাতি। দেশলাই আর আরসেনিক সাবান। টিন ভরতি খাবার ফল, চিনি, কফি এবং নুন। শেষ অব্দি সব তৈরি হল। এক কালো কুচকুচে চাকরকে সঙ্গে দেওয়া হল। তার নাম বান্দা। সে কাজ করার জন্য উদগ্রীব।

লোকটা বোধহয় ইংরাজি জানে না, জেমি ভাবল। এবার মার্গারেটের সঙ্গে দেখা করতে হবে। মার্গারেট তখনও খদ্দের সামলাতে ব্যস্ত। জেমির উপস্থিতি সে গ্রাহ্যই করল না।

ভ্যানডার জেমির কাছে এসে বললেন–তোমার খচ্চরটা তৈরি আছে। বান্দা তোমাকে সাহায্য করবে।

-ধন্যবাদ, মি. ভ্যানডার। জেমি বলল।

ভ্যানডার কী একটা লিখলেন–তারপর বললেন, ১২০ পাউন্ড।

জেমি শূন্য চোখে তাকিয়ে আছে–এটা কী?

ভ্যানডার বললেন তুমি আমাকে এইসব দেবে, তোমাকে আমি একটা সুন্দর খচ্চর দিলাম। তোমাকে আমি ব্যবসার অংশীদার করেছি।

...তোমাকে প্রতি সপ্তাহে দু-পাউন্ড করে দেওয়া হবে। আর, যদি তুমি কিছু করতে না পারো, তাহলে আর কোথাও তোমার ভাগ্যের চাকাটা ঘুরবে না।

জেমি বলল না স্যার, আমি চেষ্টা করব। মনে হচ্ছে, আমি বোধহয় সব দিতে পারব।

জেমি তার টাকার থলেটা খুলে ১২০ পাউন্ড বের করল। এটাই হল তার জমানো টাকার শেষ।

ভ্যানডার একটু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন –ঠিক আছে, আমাদের মধ্যে যেন কোনো ভুল বোঝাবুঝি না হয়। এই শহরটাতে প্রবঞ্চকদের ছড়াছড়ি। তুমি এ ব্যাপারে কিন্তু খুব সাবধান থাকবে। আমি এ ব্যাপারটা সবসময় মাথায় রাখি।

-হ্যাঁ, স্যার। আমি আপনার কথা মনে রাখব। জেমি তখন খুব উত্তেজিত। সে সব কথা ভুলে গেছে। জেমি ভাবল, উনি আমাকে সুযোগ দিয়েছেন, এতেই আমি কৃতার্থ।

ভ্যানডার পকেটে হাত দিলেন, একটা ছোটো ম্যাপ বের করলেন।–এটাই হল সেই জায়গা, এখান থেকেই তোমার যাত্রা শুরু হবে। এইখান থেকে উত্তর দিকে চলে যাবে। ভাল নদীর উত্তর প্রান্তে।

জেমি ওই মানচিত্রটা দেখছিল। তার মনে অবর্ণনীয় উত্তেজনা।

–কত মাইল দূর হবে?

-এখানে আমরা সময় ধরে দূরত্ব নিরূপণ করি। এই খচ্চরের পিঠে চড়লে তুমি চার পাঁচদিনে সেখানে পৌঁছে যাবে। আসার সময় তোমাকে কিন্তু আরও বেশি দিন সময় লাগাতে হবে। কারণ, তোমার পিঠে তখন হিরের বস্তা থাকবে। খচ্চরটা অত তাড়াতাড়ি আসতে পারবে না।

জেমি ম্যাকগ্রেগর দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। না, আমি এখন আর ট্যুরিস্ট নই। আমি এখন এক ভাগ্যান্বেষী, একজন এমন মানুষ, যার চোখের সামনে বিশ্বদিগন্তের দুয়ার উন্মুক্ত হতে পারে। আমি সৌভাগ্যের সন্ধানী। বান্দা, তার কাজ শেষ করেছে। সে এবার প্রভুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

বান্দা জেমির কোনো কথাই বুঝতে পারছে না।

–এবার যাত্রা শুরু হল।

তারা উত্তর দিকে এগিয়ে চলল।

***

জেমি রাতে একটা ঝরনার ধারে তাঁবু খাটাল। সবকিছু বের করল। খচ্চরটাকে খাওয়াল। কিছু খাবার নিজে খেল। শুকনো ফল এবং কফি। রাতে অদ্ভুত শব্দ শোনা গেল। বন্য জন্তুর মুখ থেকে ভেসে আসা বিচিত্র চিৎকার। হ্যাঁ, আমার চারপাশে নিরাপত্তা

নেই। যে কোনো সময়ে ওই বুনো জন্তুরা আমাকে আক্রমণ করতে পারে। আমি একটা আদিম অন্ধকার জগতে পড়ে আছি। প্রত্যেকটা শব্দের সঙ্গে জেমির ঘুম ভেঙে যেত। মনে হত, এই বুঝি আমাকে কেউ আক্রমণ করল। মন নানা চিন্তায় অধীর। সে ভাবল, বাড়িতে কত সুন্দর না-ছিলাম? আহা, নিরাপত্তা এবং নিশ্চিন্ত আরাম। শেষ অব্দি জেমি ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্নের মধ্যে তখন শুধুই বাঘ-সিংহের আনাগোনা। দাড়িওয়ালা মস্ত বড়ো মানুষ। তার কাছ থেকে জোর করে হিরের থলিটা ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সকাল হল, জেমি চোখ খুলল। হায়, খচ্চরটা মরে পড়ে আছে!

.

০২.

জেমি বিশ্বাস করতে পারছে না, মনে হল হয়তো কোথাও ক্ষতের চিহ্ন থাকবে। বুনো জন্তুর আক্রমণ। মধ্যরাতের অন্ধকারে। কিন্তু কিছুই নেই। জন্তুটা ঘুমের মধ্যে মরে পড়ে আছে। তার মানে? ভ্যানডার এই কাজটা কী করে করলেন? জেমি ভাবল, কিন্তু আমি যখন বেরিয়ে পড়েছি, তখন ফেরার কোনো প্রশ্ন নেই।

খচ্চর ছাড়াই যেতে হবে। বাতাসের ভেতরে কীসের শব্দ? জেমি মাথা তুলে তাকাল। মস্ত বড়ো কালো শকুনের দল ধীরে ধীরে নীচে নামতে শুরু করেছে। জেমির সমস্ত শরীরে ভয়ের শিহরণ, অত্যন্ত দ্রুত সে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণ করল। এখান থেকে এখনই পালাতে হবে। নইলে সমূহ বিপদ।

শিহরিত চোখে সে দেখল কয়েকটা শকুন এসে ওই মৃতদেহটাকে ঢেকে ফেলেছে। হ্যাঁ, এবার না পালালে উপায় নেই।

ডিসেম্বর, দক্ষিণ আফ্রিকাতে গরমকাল। মাথার ওপর গনগনে সূর্যের আগুন। মনটা এখন অনেক ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। হৃদয় আরও ভারী হচ্ছে। যত দূর দেখা যাচ্ছে অনুচ্চ অনুর্বর টিলাভূমি। মাঝে মধ্যে এখানে সেখানে খাড়াই পাহাড়। একটুকরো গাছের আচ্ছাদন কোথাও নেই।

জেমি এবার কোন দিকে যাবে? না, কিছু শব্দ তখনও তাকে উত্যক্ত করছে। জন্তুর আওয়াজ। ধীরে ধীরে একটার পর একটা অঞ্চল পার হল সে। একদিন ভোরবেলা একদল সিংহের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সিংহী তার সন্তানদের দিকে তাকিয়ে আছে, মাঝে মধ্যে তাকাচ্ছে তার প্রেমিক সিংহ পুরুষের দিকে।

জেমির হৃদয় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। হ্যাঁ, ওরা শিকারে সন্ধানে বেরিয়েছে। জেমি ওখান থেকে নড়ল না।

দু সপ্তাহ পরে সে কারুর কাছে এসে পৌঁছোল। এবার বোধহয় আর সম্ভব নয়। আমি আমার যাত্রাপথের শেষে ফিরে এসেছি। কী আশ্চর্য, আমার উচিত ছিল, শহরে ফিরে গিয়ে ভ্যানডার মারওয়ার কাছ থেকে আর একটা খচ্চর চেয়ে নেওয়া। কিন্তু কেন? তাহলে কি উনি এই শর্তটা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করবেন?

জেমি আরও সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। একদিন দূরে চারটে মূর্তি দেখা গেল। তার দিকে এগিয়ে আসছে। জেমি ভাবল, না, এটা কি মরীচিকা? ওই তো মুর্তিগুলো আরও কাছে এসেছে।

না, আর বোধহয় সম্ভব হচ্ছে না। নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে ম্যাকগ্রেগর। একবার ভাবল, না, এভাবে অচেনার সন্ধানে ঘুরে কী লাভ? আবার আমি নিশ্চিত নিরাপত্তার জীবনে ফিরে যাব। পরমুহূর্তেই তার মনে অন্য চিন্তার উদ্রেক।

দুদিন কেটে গেছে। ম্যাকগ্রেগর একটা ছোট্ট গ্রামে এসে পা রাখল। গ্রামটির নাম ম্যাগের গ্রাম। শরীর বোধ হয় আর ধকল সহ্য করতে পারবে না। এখান সেখান থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। চোখ দুটো ফুলে উঠেছে। প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। সে রাস্তার মধ্যে পড়ে গেল। প্রচণ্ড জ্বর এসেছে। জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে।–হিরের খনি? আমার হিরের খনি? না, আমি প্রাণ থাকতে এই হিরে তোমাদের হাতে তুলে দেব না।

তিনদিন কেটে গেছে। চোখ মেলে তাকাল। ছোট্ট ঘর। অন্ধকারে পরিপূর্ণ। শরীরের সর্বত্র ব্যান্ডেজ। সে দেখল, এক মধ্যবয়সিনী ভদ্রমহিলাকে। হ্যাঁ, বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন।

-কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত আবেগ আপনি কে? আর কোনো শব্দ বেরোচ্ছে না।

–সোনা, তুমি এখন শুয়ে থাকো।

ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে টিনের কাপ থেকে জল দিলেন।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

জেমি কোনোরকমে তাকাবার চেষ্টা করল–আমি কোথায় আছি?

-তুমি ম্যাগেরগ্রামে এসেছ। আমি অ্যালিস জার্ডাইন। এটা আমার বোর্ডিং হাউস। এখানে তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে। এখন পিঠ ফিরে শোও।

জেমির মনে পড়ে গেল। সেইসব অজ্ঞাত আততায়ীদের কথা, তারা সব কিছু চুরি করার চেষ্টা করছিল। জেমি চিৎকার করে বলল–আমার জিনিস কোথায়?

ওঠার চেষ্টা করল। কিন্তু ভদ্রমহিলার শান্ত কণ্ঠস্বর তাকে স্তব্ধ করে দিল।

সবকিছু নিরাপদে আছে, চিন্তা করো না।

দেখা গেল, ঘরের এককোণে সব জড়ো করা আছে।

জেমি আবার শুয়ে পড়ার চেষ্টা করল, এখন থেকে সব বোধহয় ভালোই চলবে।

***

অ্যালিস জার্ডাইনকে আমরা আশীর্বাদ বলতে পারি। শুধু জেমি ম্যাকগ্রেগরের কাছেই নয়, ম্যাগেরগ্রামের সকলের কাছে। এটা হল এক খনি শহর। এখানে অভিযাত্রীদের ভিড় লেগেই থাকে। সকলের চোখে একই স্বপ্ন, তিনি যত্ন করে সকলের মুখে অন্ন তুলে দেন। আহত হলে সেবা শুশ্রূষা করেন। উৎসাহের সঞ্চারণ করেন। এসেছেন ইংল্যান্ড থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকাতে স্বামীর সঙ্গে এসেছিলেন। ভদ্রলোক লিডসে পড়ানোর চাকরি

ছেড়ে দিলেন। হিরের অন্বেষক হয়ে উঠলেন। এখানে আসার তিন সপ্তাহ বাদে এক অজানা জ্বরে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। উনি এখানে থেকে যাওয়া মনস্থ করেন। দুজন ছেলেকে দত্তক নিয়েছিলেন। আসলে উনি ছিলেন অপুত্রক।

বিছানাতে আরও চারদিন জেমিকে থাকতে হল। তিনি নিজের হাতে জেমিকে খাওয়াতেন। ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতেন। জেমি যাতে শক্তি পুনরুদ্ধার করতে পারে তার ব্যবস্থা করলেন। পঞ্চম দিন, জেমি এবার উঠে দাঁড়াতে পারল।

-মিসেস জার্ভাইন, আপনার কাছে আমি আমার কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আপনি না থাকলে যে কী হত আমার। কিন্তু আমি একদিন এখানে হিরে নিয়ে আসব, সেদিন সব দাম মিটিয়ে দেব কেমন?

ভদ্রমহিলা হাসলেন, আহা, ছোট্ট ছেলে, কতই বা বয়স। ভীষণ রোগা, এই ছেলেটির ধূসর চোখের তারায় আতঙ্কঘন চিহ্ন। কিন্তু শরীরের মধ্যে একটা আশ্চর্য তেজ আছে, আছে কর্মোদ্দীপনা। অন্যদের থেকে একেবারে আলাদা।

***

জেমি নতুন পোশাক পরে নিয়েছে। এবার এই শহরের অভিযানে বেরিয়ে পড়ল। এটা একটা ছোটো শহর, ক্লিপড্রিফট, তবে খুবই ছোটো। একই ধরনের তাবু, ওয়াগন এবং নোংরা রাস্তাঘাট। দুপাশে এলোমেলো এবড়ো-খেবড়ো উঁচু-নীচু পথঘাট। একই রকম মানুষের ভিড়। জেমি একটা সেলুনের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভেতরের কথাবার্তা শুনতে পেল। একটা লাল শার্ট পরা আইরিশ ভদ্রলোকের পাশে জনতা ভিড় করেছে।

জেমি জানতে চাইল–কী হয়েছে?

-উনি বোধহয় সেটা পেয়েছেন।

–কী জিনিস?

-আজ থেকে উনি আরও বড়োলোক হয়ে উঠবেন। উনি সকলকে খাওয়াবেন। যত খুশি পেট ভরে খেতে পারব। আকণ্ঠ মদ গিলতে পারব।

জেমি এই আলোচনায় যোগ দেবার চেষ্টা করল। হ্যাঁ, গোল টেবিলের চারদিকে মানুষের ভিড়।

-ম্যাকগ্রেগর, তুমি কোথা থেকে আসছ?

–স্কটল্যান্ড।

–হ্যাঁ, এই লোকটা অনেক টাকা আয় করেছে।

তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে শুরু করল। হ্যাঁ, সকলেরই এক গল্প। এত দিন ধরে তারা কাজ করেছে, মাটির বুকে হাতুড়ি চালিয়ে দিয়েছে। কোদাল দিয়ে গর্ত খোঁড়ার চেষ্টা করেছে নদীর দুপাশে। কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি। প্রত্যেক দিন অবশ্য অল্প অল্প পরিমাণ পাওয়া গেছে, কিন্তু এ দিয়ে মানুষ বড়োলোক হতে পারে না। এর সাহায্যে স্বপ্নটাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। এই শহরের মানুষের মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত আশা এবং

নিরাশার সংমিশ্রণ। আশাবাদী মানুষেরা বেঁচে থাকতে চাইছে। নিরাশবাদীরা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

জেমি জানে না, কোন দিকে যোগ দেবে।

সে লাল শার্ট পরা আইরিশ ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। ওই ভদ্রলোক একমনে মদ খাচ্ছে। তাকে ভ্যানডারের ম্যাপটা দেখাল।

ভদ্রলোক ম্যাপটার দিকে তাকালেন। সেটাকে জেমির হাতে তুলে দিলেন, আজগুবি, সব জায়গা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে। আমি এই আশার পেছনে আর ছুটব না।

সে কী? জেমি বিশ্বাস করতে পারছে না। এই ম্যাপটাই তার কাছে একমাত্র চাবি কাঠি।

কিন্তু এই সংকেত ধরে সে কতদূর যেতে পারবে?

একজন বলে উঠল –কোলেসবার্গের দিকে এগিয়ে যাও। সেখানে গেলে হয়তো তুমি কিছু পাবে।

আর একজন বলল–গ্রিলভিন।

কেউ বলল–মুনলাইটরাস। সেখানেই বোধ হয় আসল হিরের খনিটা আছে।

***

রাতের খাবার শেষ হয়েছে। অ্যালিস জার্ডাইন বললেন জেমি, এখানে আমরা সবাই জুয়া খেলতে এসেছি। তুমি তোমার নিজের মত ধরে এগিয়ে যাও। অন্যের কথায় কান দিও না কেমন?

সমস্ত রাত কেটে গেল ঘুমহীন তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে। জেমি ভাবল, সে ভ্যানডারের মানচিত্রের কথা ভুলে যাবে, নাকি সকলের কথামতো সামনের দিকে এগিয়ে যাবে কিছুই বুঝতে পারছে না। কিন্তু, না, সে ভাবল, এবার পূর্বদিকে এগোব। মড়া নদীর পার দিয়ে।

পরের দিন সকালে জেমি মিসেস জার্ডাইনকে গুডবাই জানিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

তিনদিন তাকে হাঁটতে হয়েছিল। শেষ অব্দি একটা জায়গাতে এসে পৌঁছোল। সেখানে ছোটো তাবু খাটাল। এটা নদীর ধারে অবস্থিত। জেমি ভাবল, এখানেই বোধহয় কাজ শুরু করা যেতে পারে।

শুরু হল মাটি খোঁড়ার কাজ। সূর্য ওঠার আগে থেকে জেমি কাজে লেগে পড়ত। সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে না-আসা পর্যন্ত একমনে মাটি খুঁড়ত। প্রথমে হলুদ কাদা বেরিয়ে এল। তারপর নীল কিছু ভূমিখণ্ড। এর ভেতর হয়তোবা হিরে থাকতে পারে। কিন্তু মাটি একেবারে নীরস এবং বন্ধ্য। এক সপ্তাহ ধরে কাজ হল। কিছুই পাওয়া গেল না। এক সপ্তাহ কেটে যাবার পর জেমি ঠিক করল, না, এখানে থাকা আর উচিত নয়, আমাকে অন্য কোনো জায়গায় যেতে হবে।

একদিন সে কাজ করতে করতে দূরে তাকিয়ে ছিল। মনে হল, দূরে একটা রূপোর বাড়ি আছে। সূর্যের আলোয় ঝিলিক দিচ্ছে। আমি কী অন্ধ হয়ে গেলাম। জেমি ভাবল, না, আরও আগে এগিয়ে গিয়ে সে দেখল একটা গ্রামের কাছে এসে পৌঁছেছে। হ্যাঁ, এই বাড়িগুলো বোধহয় রূপো দিয়ে তৈরি। অনেক স্থানীয় লোককে দেখা গেল। অদ্ভুত পোশাক পরা, রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। জেমি অবাক হয়ে গেছে। এই বাড়িগুলো সূর্যের আলোতে ঝলসে যাচ্ছে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে। জেমি হেঁটে চলল, একঘণ্টা বাদে সে পেছন ফিরে তাকাল। তখনও ওই গ্রামটাকে দেখা যাচ্ছে। এই দৃশ্যটা সে কোনোদিন ভুলতে পারবে না।

***

জেমি এবার উত্তরদিকে এগোবে। সে নদীর পার ধরে হেঁটে চলল। এখানেও মাঝে মধ্যে কাজ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু কোদাল চালাতে পারছে না। ভীষণ ভারী হয়ে গেছে সব কিছু। ঘন অন্ধকার, সেখানেই শুয়ে পড়ল।

দুটি সপ্তাহ কেটে গেল। সে আবার উত্তরে এগিয়ে চলেছে। পাপাস্প্যান নামে একটি জায়গাতে এসে পৌঁছোল। এখানে নদীটা বাঁক খেয়ে ঘুরে গেছে। এখানেও একটু চেষ্টা করা হল। কাজের কাজ কিছুই হল না। গত দুসপ্তাহে কোনো মানুষের মুখ দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি। এক অসম্ভব নীরবতার মধ্যে দিয়ে দিন কেটে চলেছে। আমি এখানে কী করছি? জেমি মাঝে মধ্যে নিজেকে প্রশ্ন করল। আমি কি একটা উল্লুক হয়ে গেলাম? না, আমি আর পারব না। একটার পর একটা দিন কেটে যাচ্ছে। আগামী শনিবারের মধ্যে যদি একটুকরো হিরের সন্ধান করতে না পারি, তাহলে এ অভিযানে

আর অংশ নেব না। সে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে বলল–তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? হায় যিশু তুমি কোথায়? আমার মাথা কাজ করছে না।

জেমি সেখানে স্থির হয়ে বসে ছিল। বালির ওপর হাত দিয়ে আঁকিবুকি কাটছিল। তারপর? হঠাৎ একটা মস্ত বড় পাথরের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর সেটাকে ফেলে দিল। এ ধরনের কত পাথর চারদিকে ছড়ানো আছে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সে তা দেখে আসছে। ভ্যানডার কেন একথা বললেন? ভ্যানডার আমার সঙ্গে কেন বিশ্বাসঘাতকতা করলেন? জেমি উঠে দাঁড়াল। কী একটা যেন তার চোখ আকর্ষণ করেছে। একটা মস্ত বড়ো পাথর। দেখতে অদ্ভুত। সে ধুলো সরিয়ে দিল। আরও ভালোভাবে পরীক্ষা করল। মনে হচ্ছে, হ্যাঁ, এটা এক টুকরো হিরে হতে পারে। কিন্তু, একটুখানি সন্দেহ থেকে গেছে। এটার আকার এত বড় কেন? মুরগির ডিমের মতো! হা ঈশ্বর। এটা কী সত্যি সত্যি হিরে!

সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইল। এবার রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। লণ্ঠন হাতে করে চারপাশে খোঁজাখুঁজি করতে শুরু করল।

পনেরো মিনিট কেটে গেছে, একই আকারের আরও চারটে পাথরখণ্ড পাওয়া গেল। তবে অন্যগুলো বোধহয় একটু ছোটো। হ্যাঁ, আনন্দ এখন আকাশ ছুঁয়েছে।

সকাল হবার আগেই ঘুম ভেঙে গেল, পাগলের মতো খোঁড়া শুরু হল। দুপুরের মধ্যে আরও গোটা ছয়েক হিরকখণ্ড পাওয়া গেল। পরবর্তী সপ্তাহ সে ওখানেই কাটিয়ে ছিল।

রাতে এই হিরকখণ্ডগুলিকে একটা জায়গাতে রেখে আসত। যাতে কোনো পথিকের চোখে

পড়ে। প্রত্যেক দিন নতুন নতুন হিরের সন্ধান পাওয়া গেল। জেমি বুঝতে পারল, এবার ভাগ্যের চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। এমন আনন্দ, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই সম্পদের অর্ধেকটা আমার। এর সাহায্যে আমি হয়তো মস্ত বড়োলোক হতে পারব, যেটা আমার স্বপ্নের বাইরে ছিল।

একসপ্তাহ কেটে গেল। জেমি তার ম্যাপের ওপর এক জায়গায় দাগ দিল। এবার তাকে বেরোতে হবে। কিন্তু এই সম্পদ নিয়ে যাবে কী করে? কোথায় রাখা যায়? পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে হবে। ম্যাগেরগ্রামের দিকে যাত্রা শুরু হল।

একটা ছোট্ট বাড়ির সামনে লেখা ছিল ডায়মণ্ড কুপার।

জেমি ওই অফিসে ঢুকে পড়ল। বাতাস ঢুকতে পারে না, এমন একটা ছোট্ট ঘর। মনের ভেতর অজানা আতঙ্ক। হ্যাঁ, সে শুনেছে, অনেক গল্প, শেষ পর্যন্ত এগুলো সামান্য পাথরে পরিণত হয়েছে। আমার অনুমান কী সঠিক?

একজন অফিসে বসেছিল, সে বলল–কী করব?

–এই জিনিসগুলোর কত দাম বলবেন কি?

লোকটার চোখের তারায় কেমন একটা আতঙ্ক এবং আগ্রহ। জেমি তাকিয়ে থাকল। হ্যাঁ, দুটো পাথর ডেস্কের ওপর রেখেছে। সাতাশটা পাথর মোট হল। লোকটার চোখে বিস্ময়।–

-কোথায় পাওয়া গেল?

–বলুন তো, এগুলো হিরে কিনা?

লোকটা সব থেকে বড়ো পাথরটা পরীক্ষা করল। তারপর বলল–হায় ঈশ্বর, এটা হল সব থেকে বড়ো হিরো। এত বড়ো হিরে আমি কখনও দেখিনি।

জেমির নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। আনন্দের শিহরণ।

লোকটা আবার জানতে চাইল–কোথায়? কোথায় পাওয়া গেল?

–পনেরো মিনিট বাদে ক্যানটিনে আসুন, জেমি বলল, আমি সব বলব।

সে হিরেগুলো তুলে নিল, পকেটে ভরল। তারপর এক পাশে চলে গেল।

-আমি একটা বিষয় নথিবদ্ধ করতে চাইছি। সলোমনের নামে এবং জেমি ম্যাকগ্রেগরের নামে নথিভূক্ত করতে হবে।

আজ আমি বিশ্বের সম্রাট হয়ে গেলাম। পকেটে কিছু ছিল না। আজ কোটি টাকার মালিক।

ক্যানটিনে বসে থাকল জেমি ম্যাকগ্রেগর। একটুবাদে ওই ভদ্রলোক এসে ঢুকল। সর্বত্র সংবাদটা ছড়িয়ে পড়েছে। জেমির দিকে সবাই শ্রদ্ধার চোখে তাকাচ্ছে। হ্যাঁ, সকলের মনে একটাই প্রশ্ন–কীভাবে হল এটা?

শেষ পর্যন্ত জেমি জবাব দিল আপনারা পাপাম্প্যানে চলে যান। সেখানে পাওয়া যাবে।

***

অ্যালিস জার্ডাইন এক কাপ চা খাচ্ছিলেন। জেমি ঢুকে পড়ল, কিচেনে এসে গেল। ভদ্রমহিলার মুখ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে- জেমি? হায়, তুমি ফিরে এসেছ?

মুখে আলো, বোঝা গেল, আমার শরীরটা ভালো নেই। এসো, চা খাবে আমার সঙ্গে?

কোনো কথা না বলে জেমি পকেট থেকে একটা মস্ত বড়ো হিরে বের করল। সেটা জার্ডাইনের হাতে দিল।

-আমি আমার কথা রেখেছি।

ভদ্রমহিলা ওই হিরকখণ্ডের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। দুটি চোখ আনন্দে অশ্রুসজল হয়ে উঠল–না জেমি, আমি তোমার কাছ থেকে কিছু নেব না। এই টাকা আমার জীবনকে নষ্ট করে দেবে।

***

জেমি ম্যাকগ্রেগর ক্লিপড্রিফটে ফিরে এসেছে। সে একটা ঘোড়া কিনেছে। তারপর একটা গাড়িও কিনে নিয়েছে। সাবধানে টাকা খরচ করতে হয়েছে। সে জানে তার অংশীদারকে কোনো মতেই প্রবঞ্চিত করা সম্ভব হবে না। আহা, আরামপ্রদ এই অভিযান। এটাই হল ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে তফাত। সে চিন্তা করল, দরিদ্ররা পায়ে হেঁটে যাতায়াত করে, ধনীরা ঘোড়ার গাড়ির সওয়ার হয়।

তারপর? নতুন দিগন্তের সন্ধান।

.

০৩.

ক্লিপড্রিফট শহরটার কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু জেমি ম্যাকগ্রেগরের চরিত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। সে ঘোড়ার পিঠে চড়ে শহরে প্রবেশ করল। ভ্যানডারের ওই দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। আহা, দারুণ দামী ঘোড়া এবং গাড়িটা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। এই যুবা পুরুষের চোখে মুখে এমন একটা আশার বিচ্ছুরণ। তাও লোকের নজর এড়ায়নি। বোঝা গেল, তিনি অনেক অর্থ নিয়ে ফিরেছেন। অন্য লোকগুলো যেমনভাবে ফিরে আসে, হতাশার অন্ধকারে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। একে দেখে মনে হচ্ছে, ইনি বোধহয় সেই দলভূক্ত নয়।

সেই কালো লোকটা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। জেমি তার দিকে তাকিয়ে বলল-আমি ফিরে এসেছি।

বান্দা কোনো কথা বলল না, ভেতরে চলে গেল। জেমি তাকে অনুসরণ করল।

সলোমন একজন খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলছিলেন। খর্বাকৃতি ওই ওলন্দাজের মুখে হাসি। জেমি জানে, হয়তো তার কানে খবরটা পৌঁছে গেছে। এই খবর বাতাসের বুকে ভর দিয়ে দ্রুত ছুটে যায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়, আলোর মতো গতি সঞ্চার করে।

খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলা শেষ হল। ভদ্রলোক জেমির দিকে তাকিয়ে বললেন-এসো মি, ম্যাকগ্রেগর।

জেমি তাকে অনুসরণ করল। ভ্যানডারের মেয়ে স্টোভের সামনে বসেছিল। সে লাঞ্চ তৈরি করছে।

-হ্যালো মার্গারেট!

মেয়েটা তাকাল।

ভালো খবর আছে। ভ্যানডারের চোখে আলো, তিনি পাশে বসলেন।

-ঠিক কথা। জেমি তার চামড়ার বাক্সটা বের করল। জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করে কিচেন টেবিলের ওপর হিরের খণ্ডগুলো ছড়িয়ে দিল।

ভ্যানডার সেদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেছেন। একে একে হিরেগুলো দেখলেন। সবগুলো দেখলেন আলাদা আলাদা ভাবে। সব শেষে সব থেকে বড়োটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। হ্যাঁ, আশ্চর্য আবিষ্কার।

কথা বলা শুরু করলেন। কণ্ঠস্বরে দারুণ আনন্দ।

-তুমি করতে পেরেছ ম্যাকগ্রেগর! ভীষণ ভালো কাজ।

-থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। এটাই হল শুরু। ওখানে আরও অনেক পড়ে আছে। কত, তা আপনি ভাবতেই পারবেন না।

-তুমি তোমার দাবি ঠিক মতো পেশ করেছ?

-হা স্যার। জেমি পকেট থেকে সেই নথিভূক্ত কাগজ দেখাল। আমাদের দুজনের নামে নথিভূক্ত করা হয়েছে।

ভ্যানডার সেটা দেখলেন। পকেটে রাখলেন। না, তোমাকে বোনাস দিতে হবে। তুমি এখানে বসো।

উনি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। দোকানের দিকে চলে গেলেন। বললেন মার্গারেটের সঙ্গে এসো।

মার্গারেট জেমিকে অনুসরণ করছে। মার্গারেটের আচরণের মধ্যে ভয় জেগেছে। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেছে। ভ্যানডার ফিরে এলেন। একা, একটা পার্স বের করে বললেন- এর মধ্যে পঞ্চাশ পাউন্ড আছে।

জেমি জানতে চাইল–কী হবে?

-এটা তোমার জন্য।

–আমি বুঝতে পারছি না।

-তুমি চব্বিশ সপ্তাহ আগে কাজ শুরু করেছিলে। দু পাউন্ড করে প্রত্যেক সপ্তাহে। আটচল্লিশ পাউন্ড, আর তোমাকে আমি দু-পাউন্ড বোনাস দিচ্ছি।

জেমি হাসল–আমি বোনাস চাইছি না। আমাকে ওই হিরের অংশ দিন।

–তোমার অংশ?

–কেন? আমার অর্ধেক? আমরা তো অংশীদার।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকালেন–অংশীদার? তুমি একথা কেন বলছ?

জেমি অবাক হয়ে ওই ওলন্দাজ ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। আমরা একটা চুক্তি করেছিলাম।

-হ্যাঁ, তুমি কি সেটা পড়োনি?

-পড়ব কী করে? ওটা তো আফ্রিকান ভাষায় লেখা ছিল। আপনি বলেছিলেন, আমি অর্ধেক পাব।

ওই বয়স্ক লোক মাথা নাড়লেন তুমি হয়তো আমাকে বুঝতে পারোনি মি. ম্যাকগ্রেগর। আমার কোনো পার্টনারের দরকার নেই। তুমি আমার হয়ে কাজ করেছ। আমি তোমাকে। পাঠিয়ে ছিলাম। যন্ত্রপাতি কিনে দিয়েছি। তুমি যা হিরে পাবে, সব কিছু আমার।

জেমির মনে হল তার মধ্যে একটা শীতল শিহরণ।

সে বলল –আপনি আমাকে কোনো কথাই বলেননি। কোনো টাকা দেননি। আমি আপনাকে ১২০ পাউন্ড দিয়েছি জিনিসপত্রের জন্য।

ভদ্রলোক কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন –আমি বাজে বকবক করে সময় নষ্ট করব না। তোমায় যা বলার বলে দিয়েছি। আমি তোমাকে আরও পাঁচ পাউন্ড দিতে পারি। না হলে সব ব্যাপারটাই আমি শেষ করে দেব। আমি এখনও পর্যন্ত ভালো ব্যবহার করে যাচ্ছি।

জেমি রেগে গেছে। সে বলল–ঠিক আছে, সবকিছু ছেড়ে দিন।

তার মধ্যে জেগেছে স্কটিশ জাতির উন্মাদনা। সে বলল- আমি আদ্ধেক নেবই। এটা নথিভূক্ত করেছি। দেখুন, দুজনের নামে।

ভ্যানডার হাসছেন–তুমি আমাকে প্রতারণা করার চেষ্টা করো না। আমি তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেব। তিনি ওই টাকাটা জেমির হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এখনই এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

-আমি লড়াই করব।

–যেখানে খুশি যেতে পারো। আইনজ্ঞের কাছে যে যাবে, সেই টাকা তোমার পকেটে কী আছে? দেখো, আমি সবকিছু কিনে রেখেছি।

জেমি ভাবল, এটা একটা দুঃস্বপ্ন। হ্যাঁ, প্রচণ্ড রেগে গেছে সে। এতদিন ধরে তাকে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। সূর্যের তাপে সে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শীতল নিঃসঙ্গ একক রাত।

সে আবার ভ্যানডারের দিকে তাকাল। বলল- এত সহজে আমি আপনাকে ছাড়ব না। আমি এই শহর ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না। আমি সকলের কাছে গিয়ে আপনার কুকীর্তির কথা বলব। আমি আমার অর্ধেক অংশ না পাওয়া পর্যন্ত আপনাকে ছাড়ব না।

ভ্যানডার রাগের চোখে তাকালেন।

-তুমি একজন ডাক্তারের কাছে যাও। আমার মনে হচ্ছে, সূর্যের তাপ তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে দিয়েছে।

এক সেকেন্ডের মধ্যে জেমি ভ্যানডারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই ছোট্ট শরীরটাকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর বলল–আমার সঙ্গে চালাকি, ভবিষ্যতে এর জন্য আপনাকে পস্তাতে হবে।

সে ভ্যানডারকে দূরে ছুঁড়ে দিল। টাকাগুলো চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকল।

সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

***

জেমি ডাউনার সেলুনে পৌঁছোল। জায়গাটা ফাঁকা। যারা হিরের সন্ধানে গিয়েছিল, তারা এখন অন্য কোথায় চলে গেছে। জেমির সমস্ত শরীরে রাগ এবং হতাশা। অবিশ্বাস! সে ভাবল। এক মিনিট আগে আমি পৃথিবীর সব থেকে ধনী মানুষ ছিলাম, আর এই মুহূর্তে আমি হয়ে গেলাম এক ভাঙাচোরা মানুষ। ভ্যানডার একজন চোর, আমি তাকে যে করেই হোক শাস্তি দেব। কিন্তু কীভাবে? ভ্যানডার ঠিক কথাই বলেছেন, আমি একজন আইনজীবীকে ভাড়া করতে পারব না। আমি এখানে এক অজানা আগন্তুক। আর ওই ভদ্রলোক? এই শহরের এক গণ্যমান্য ব্যক্তি। আমার কাছে একটাই শক্তি আছে। তা হল আমার সততা। আমি দক্ষিণ আফ্রিকার সকলের কাছে আসল কথাটা খুলে বলব।

বারটেন্ডার স্মিথ এসে প্রবেশ করল। বলল–কেমন আছেন? মি. ম্যাকগ্রেগর? কী চাই?

– হুইস্কি। স্মিথ ডাবল হুইস্কি নিয়ে এল। জেমির সামনে এনে দিল। জেমি এক ঢোঁকে সবটা খেয়ে ফেলল। সে বেশি মদ খেতে ভালোবাসে না। মদ তার শরীর জ্বালিয়ে দেয়।

-আর একটু দেব?

নিয়ে এসো, আরও নিয়ে এসো। দ্বিতীয়টাও চট করে শেষ হয়ে গেল। জেমির মনে পড়ল, এই বারটেন্ডার তাকে বলেছিল, ভ্যানডারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

জেমি বলল–তুমি কি জানো, ওই বুড়োটা খচ্চর প্রতারক? আমাকে ঠকিয়ে আমার সব হিরে নিয়ে নিয়েছে।

স্মিথের মুখে সহানুভূতি –সেকী? ব্যাপারটা খুবই খারাপ। এ খবরটা শুনে আমার খুবই খারাপ লাগছে।

-কিন্তু ওই লোকটা একাজ করতে পারবে না। জেমির কণ্ঠস্বর কঠিন। ওই হিরের আর্ধেকটা আমার। ও একটা চোর। দেখব, কী করে ওকে শায়েস্তা করা যায়।

-খুব সাবধানে। ভ্যানডার কিন্তু এই শহরের এক নামকরা বাসিন্দা।

বারটেন্ডার বলতে থাকল। ওর বিরুদ্ধে গেলে তোমাকে ও আর আস্ত রাখবে না। তবু আমি একজনের কথা বলতে পারি, তিনি ভ্যানডারকে খুবই ঘৃণা করেন।

চারদিকে তাকাল ওই বারটেন্ডার–না, কেউ শুনছে না। সে বলল –এই রাস্তার শেষের দিকে একটা পুরোনো বাড়ি আছে। তুমি কি রাত্রি দশটায় আসতে পারবে?

-হ্যাঁ, আমি আসব। আমি তোমায় ভুলব না।

–ঠিক দশটার সময় এসো কিন্তু?

***

করগেটের টিন দিয়ে তৈরি একটা ছোটো জায়গা। শহরের একপ্রান্তে। জেমি পৌঁছে গেছে। অন্ধকার ঘনীভূত হয়েছে। হঠাৎ তার শব্দ শোনা গেল। না, কোনো উত্তর নেই। জেমি সামনের দিকে এগিয়ে গেল। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে, অন্ধকারের ভেতর কতগুলো ঘোড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার একটা শব্দ।

কিন্তু কোথাও কেউ নেই। কে যেন মাটিতে ফেলে দিয়েছে। মাথায় আঘাত করেছে। একটা দৈত্যাকৃতির লোক তাকে চেপে ধরেছে। তার ওপর বুটের আঘাত। না, মনে হল, সে বুঝি আর বেঁচে থাকবে না। শেষ পর্যন্ত চেতনা হারিয়ে গেল। ঠাণ্ডা জল তার মুখে দেওয়া হল। চোখ দুটো খুলে গেল। হ্যাঁ, ভ্যানডারের চাকর বান্দা। আবার মারতে উদ্যত। জেমি বুঝতে পারছে না, এখন কী করবে। কিছু বোধহয় তার পায়ে আঘাত করেছে।

না, আবার চেতনা হারিয়ে গেল।

***

আগুনের ধারে শরীরটা শোয়ানো আছে। জীবন আবার ফিরে এসেছে কি? জেমি শুয়ে আছে। হ্যাঁ, শরীরের প্রত্যেকটি কোষে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। গরম বালির ভেতর মুখটা গুঁজে

দেওয়া হয়েছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আধবোজা চোখে সে সবকিছু দেখার চেষ্টা করল। হালকা অনুভূতি। আমি এখন কোথায়? প্যারোতে? সম্পূর্ণ নগ্ন। ভোর হয়েছে। কিন্তু বোঝা গেল সূর্যের তাপ সমস্ত শরীর পুড়িয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, এবার আমাকে কিছু একটা করতেই হবে। ওরা বোধহয় মরা ভেবে আমাকে এখানে ফেলে দিয়েছে। ভ্যানডার, নিশ্চয়ই, স্মিথ, বারটেন্ডার, সকলে মিলে চক্রান্ত করেছে। আমি ভ্যানডারকে ভয় দেখিয়ে ছিলাম। ভ্যানডার আমাকে শাস্তি দিয়েছে। এমন একটা শাস্তি, যা ছোটো ছেলেকে দেওয়া হয়। কিন্তু আমি তো ছোটো ছেলে নই, আমি প্রতিশোধ নেবই।

কীভাবে? উপায়টা বের করতে হবে।

জেমি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, সম্ভব নয়। সে হামাগুড়ি দিল।

***

জেমি ম্যাকগ্রেগরের মনে আর কোনো ধারণা নেই। এখন সে কোথায় যাবে? কোথায় গেলে একটুখানি শান্তি পাওয়া যাবে? ধু-ধু প্রান্তর চারপাশে, মানুষের হাড় ছড়ানো আছে। যেগুলো জন্তুর পেটে গেছে। না, জীবনের কোনো উন্মাদনা নেই। জেমির হঠাৎ মনে হল, আকাশের বুক থেকে একদল শকুনি নেমে এসেছে। সে তাকাল, ভয়ে চোখ বন্ধ করল। হ্যাঁ, গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এখনই এখান থেকে হামা দিয়ে পালাতে হবে।

***

যন্ত্রণাকে সহ্য করার চেষ্টা করল। সমস্ত শরীরে জ্বরের আগুন। এক-একটি ইঞ্চি পেরোতে হচ্ছে সাবধানে।

তারপর? ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে এল। এখন তাকে ধৈর্য ধরতে হবে। মনটা কোথায় ভেসে গেছে। কোথায় যাওয়া যাবে। মনে পড়ে গেল অ্যাবারডিনের দিনগুলোর কথা। রবিবারের সকাল। সুন্দর পোশাক পরে দু-ভাইয়ের সঙ্গে চার্চে যাওয়া। বোন ম্যারি এবং অ্যানি ভালোভাবে সেজে উঠত। গরমকাল সান্ধ্যভ্রমণ–আরও কত কী। দিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেল। শকুনরা আর্তনাদ করছে। আমাকে কি মরা ভেবেছে?

জেমি চোখ খোলার চেষ্টা করল। হ্যাঁ, ওরা এসে পড়েছে। কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কতগুলো ছায়া ছায়া ছবি। কতগুলো ধূসর মূর্তি।

হামাগুড়ি দিয়ে সে আর একটু এগিয়ে গেল। কীভাবে এই শকুনদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাব? জ্বরে সমস্ত শরীর পুড়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত সে আশা ছেড়ে দেয়নি। ভ্যানডারকে শাস্তি দিতেই হবে। ভ্যানডার জীবিত থাকা পর্যন্ত তার এই অভিযান শেষ হবে না।

সে সময়ের সীমানা হারিয়ে ফেলেছে। মনে হল, সে বোধ হয় এক মাইল পথ পার হয়েছে। আসল কথা বলতে কী, সে মাত্র তিরিশ গজ দূরে যেতে পেরেছে। একই বৃত্তের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। কোথায় যাবে বুঝতে পারছে না।

তাকে যে করেই হোক ভ্যানডারের কাছে পৌঁছোতেই হবে।

আবার অচেতন হয়ে গেল। আবার যন্ত্রণা। মনে হচ্ছে, পায়ে বোধহয় প্রচণ্ড আঘাত। এক সেকেন্ড চিন্তা করল, কী ঘটতে পারে। কোনরকমে একটা চোখ খুলল। একটা কালো শকুন আঘাত করেছে। পায়ের ওপর বসে পড়েছে। মাংস টেনে খাওয়ার চেষ্টা করছে। হ্যাঁ, জীবন্ত অবস্থাতেই আমাকে মরতে হবে। তীক্ষ্ণ নখের আঘাত। জেমি দেখতে পেল, শকুনগুলোর চোখে জান্তব জিঘাংসা। একটা দুটো আরও অনেক। জেমি নড়তে পারছে না। মৃত্যুর হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে হবে। আর কিছু করার নেই। আবার ওই মাংসাশী প্রাণীরা এসে শরীরের নানাস্থানে ঠোকরাতে শুরু করেছে। হ্যাঁ, এখন কিছু করার নেই। ভুল বকতে শুরু করল। পাখিদের পাখার ঝটপাটানি শোনা গেল। ওরা বৃত্তাকারে চারপাশে ঘুরছে। এবার বোধহয় ওদের মহানন্দের ফিস্ট শুরু হবে।

.

০৪.

কেপটাউন, শনিবার সকলে বাজারে আসে। রাস্তাঘাটে অনেক মানুষের ভিড়। একের সাথে অন্যের দেখা হয়। প্রেমিক প্রেমিকার নিভৃত প্রেমলাপ। বোর এবং ফরাসি সৈন্যরা সুন্দর পোশাক পরে এগিয়ে চলেছে। ইংল্যান্ডের মহিলাদের দেখার মতো হাঁটা। তাদের শরীরে বাতাসের স্পন্দন।

নানা জায়গাতে এই ধরনের বাজার বসে। সব কিছু পাওয়া যায়। ফার্নিচার থেকে ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ি, পরিষ্কার তাজা শাক সবজি। ইচ্ছে করলে কেউ যত খুশি পোশাক কিনতে

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

পারে। অথবা দাবার ঘুটি। মাংস কিংবা বই। বারোটা বিভিন্ন ভাষায়। শনিবার, কেউটাউন এক আনন্দঘন শব্দপূর্ণ শহর।

বান্দা ওই জনতার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সে আকাশের চোখের দিকে চোখ তুলে তাকায় না। ব্যাপারটা সাংঘাতিক। এখানে ব্ল্যাকরা আছে, ইন্ডিয়ান এবং লাল চামড়ার মানুষরা। কিন্তু সামান্য কিছু সাদারা এই দেশটাকে শাসন করে। বান্দা তাদের ঘেন্না করে। এটা আমাদের জায়গা, ওই সাদারা কবে এখান থেকে চলে যাবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাদের অনেক জাতি ভাই আছে, কেউবা জুলু, কেউ বেচুয়ানা, কেউ বাসুতো। ওরা সবাই বান্টু জাতের। বান্টুরা অনেক দিনের পুরোনো মানুষ।

বান্দা তার ঠাকুমার কাছে গল্প শুনেছিল। একসময় তারা সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকাতে তাদের রাজ্য স্থাপন করেছিল। তাদের নিজস্ব রাজ্য। এখন তারা ক্রীতদাসের জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। মুষ্টিমেয় কজন সাদা শিয়াল এসে সব কিছু ভোগ করছে। ব্যাপারটা সহ্য করা যাচ্ছে না। আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, আমাদের মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

বান্দা জানে না, তার বয়স কত, তাদের বয়সের কোনো পরিচিতি পত্র নেই। এখানে। বয়স মাপা হয় নিজস্ব নিয়মনীতিতে। যুদ্ধ এবং সংঘর্ষ, বিপর্যয় অথবা তাড়না, তার সাহায্যেই বয়স মাপা হয়। বান্দা শুধু জানে, সে এক গাঁও মোড়লের ছেলে। কিন্তু তাকে আজ ভাগ্য বিপর্যয়ে ক্রীতদাস হতে হয়েছে।

বান্দা অত্যন্ত দ্রুত শহরের পূর্ব প্রান্তে পৌঁছে গেল। এই অঞ্চলটায় শুধু কালো মানুষরা থাকতে পারে। অপরিচ্ছন্ন পথঘাট, দূরে টিনের চাল দেওয়া বাড়ি। সে একটা ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। দরজায় দুবার শব্দ করল। এক রোগা চেহারার কালো ভদ্রমহিলাকে দেখা গেল। উনি চেয়ারে বসে আছেন। কী যেন সেলাই করছেন। বান্দা তার দিকে তাকাল। তারপর বেডরুমে ঢুকে পড়ল। সে বিছানাতে শুয়ে থাকা চেহারাটার দিকে তাকাল।

***

ছ সপ্তাহ আগে জেমি ম্যাকগ্রেগর তার চেতনা ফিরে পেয়েছিল। সে একটা অদ্ভুত বাড়িতে খাটের ওপর নিজেকে শুয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেল। অতি দ্রুত তার স্মৃতিরা ফিরে এল। হ্যাঁ, আমাকে আবার বোধ হয় প্যারোতে নিয়ে আসা হয়েছে। আমার সমস্ত শরীর ভেঙে গেছে। আমি অসহায়। শকুনরা আমাকে আক্রমণ করেছে।

বান্দা সেই মুহূর্তেই ছোট্ট শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল। জেমির মনে হল, বান্দা আমাকে মারতে এসেছে। ভ্যানডার হয়তো জানতে পেরেছেন, আমি এখনও জীবিত আছি।

এক মুখ বিতৃষ্ণা নিয়ে সে বলল–বান্দা, তুমি কেন এসেছ? তোমার প্রভুকে পাঠাতে পারতে।

-আমার কোনো প্রভু নেই।

–ভ্যানডার? উনি তোমাকে পাঠাননি?

-না, উনি যদি জানতে পারেন, তাহলে আমাদের দুজনকেই মেরে ফেলবেন।

–আমি কোথায়? আমি কেন এখানে এসেছি?

–কেপটাউন।

–অসম্ভব। আমি কী করে এখানে এলাম?

–আমি তোমাকে নিয়ে এসেছি।

জেমি এক মুহূর্তের জন্য ওই কালো মুখটার দিকে তাকিয়ে বলল–কেন?

–তোমাকে আমার দরকার। আমি প্রতিশোধ নেব।

–কীসের?

বান্দা, আরও কাছে এগিয়ে এল আমার নিজের জন্য নয়। আমি নিজের জন্য মোটেই চিন্তা করি না। ভ্যানডার আমার বোনকে ধর্ষণ করেছেন। বোন তার অবৈধ সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেছে। তখন তার বয়স মাত্র এগারো বছর।

মর্মান্তিক এই ঘটনাটা শুনে জেমি চোখ বন্ধ করল।

-ওই দিন থেকে আমি এমন একটা সাদা মানুষের সন্ধানে আছি, যে আমাকে সাহায্য করতে পারবে। তোমাকে আমি মেরেছি, ম্যাকগ্রেগর, এজন্য দুঃখিত। তোমাকে আমি প্যারোতে ফেলে এসেছি। আমাকে বলা হয়েছে, তোমাকে হত্যা করতে। আমি ওদের বলেছিলাম, তুমি মরে গেছে। আমি খুব তাড়াতাড়ি তোমার কাছে ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু অনেকটা সময় কেটে গিয়েছিল।

জেমির আবার সব কথা মন পড়ে গেল। হ্যাঁ, ওই মাংসাশী নারকীয় শকুনীর দল, ঠুকরে ঠুকরে আমার মাংস খাচ্ছিল।

-হ্যাঁ, ওই জঘন্য হিংস্র পাখিগুলো তাদের ভোজন শুরু করে দিয়েছিল। আমি তোমাকে ওয়াগনে তুলে নিয়ে আসি। তোমাকে আমার কালো মানুষের একটা বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলাম। একজন ডাক্তার তোমার শুশ্রূষা করেছিলেন। তিনি তোমার ক্ষতের উপশম করেন।

-তারপর কী?

-একটা ওয়াগনে আমার আত্মীয়রা কেপটাউনে যাচ্ছিল। আমরা তোমাকে সেখানে নিয়ে যাই। তুমি এখন অনেক দূরে চলে এসেছ। এই কদিন ঘুমের মধ্যে কাটিয়েছ। আমার মনে হচ্ছিল, তুমি বোধহয় কখনও চোখ মেলে তাকাবে না।

জেমি আবার চোখ বড়ো বড়ো করে তাকাল। হ্যাঁ, এই লোকটা আমাকে খুন করতে এসেছিল। আমাকে এখন চিন্তা করতে হবে। আবার এ না থাকলে আমি কখন শকুনির

শিকার হয়ে যেতাম। তার মানে? এই লোকটা আমাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। জেমি চিন্তা করল –দেখাই যাক একে সাহায্য করলে কী হয়?

জেমি বান্দাকে বলল–ঠিক আছে, আমি প্রতিশোধের ব্যাপারে চেষ্টা করব।

এই প্রথম বান্দার শুকনো ঠোঁটে হাসির টুকরো দেখা গেল। তার মানে? ওকে কি আমরা মেরে ফেলব? জেমি বলল–না, ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

***

সেদিন বিকেলবেলা জেমি বিছানা থেকে উঠল। অনেক দিনের মধ্যে এই প্রথমবার। চোখে ঝাপসা দেখছে, শরীর দুর্বল। পা দুটো থর থর করে কাঁপছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। বান্দা তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে।

-না, বান্দা, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি দেখি একা হাঁটতে পারি কিনা।

বান্দা তাকিয়ে আছে, জেমি ধীরে ধীরে ঘরের ওই প্রান্তে চলে গেল।

জেমি বলল–আমাকে একটা আয়না দিতে পারো?

মনে মনে ভাবল, আমাকে দেখতে নিশ্চয়ই রাক্ষসের মতো লাগছে। কতদিন দাড়ি কামানো হয়নি।

বান্দা একটা ছোটো আয়না নিয়ে ফিরে এল। জেমি নিজের মুখ নিজেই চিনত পারল না। মাথার চুল তুষার ধূসর হয়ে গেছে। একটা অদ্ভুত সাদা দাড়ির জন্ম হয়েছে। নাকটা এখনও ভাঙা। বয়স আরও কুড়ি বছর বেড়ে গেছে। হ্যাঁ, গালে দাগ পড়েছে। চিবুকে কাটা চিহ্ন, সব থেকে বড়ো পরিবর্তন চোখের তারায়। চোখের তারা এখন বিষণ্ণকাতর। সে আয়নাটা সরিয়ে দিল।

সে বলল–আমি একটু বাইরে যেতে পারি কি?

–না, দুঃখিত, ম্যাকগ্রেগর, সেটা সম্ভব নয়।–

-কেন?

-সাদা মানুষেরা এখানে থাকার অনুমতি পায় না। যেমন আমাদের সাদাদের শহরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। আমার প্রতিবেশীরা জানে না যে, তুমি এখানে আছে। আমরা তোমাকে রাতের অন্ধকারে নিয়ে এসেছি।

-কী করে যাব?

–আজ মাঝরাতে তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে যাব।

এই প্রথম জেমি বুঝতে পারল যে বান্দা কতখানি বিপদের কাজ করেছে। একটু বিরক্ত হয়ে জেমি বলল–আমার কাছে কোনো টাকাপয়সা নেই। একটা চাকরি পাওয়া যাবে কি?

-আমি একসময় জাহাজে চাকরি করতাম। তারা সব সময় তোক খুঁজছে। সে পকেট থেকে কিছু পয়সা বের কর জেমির হাতে দিয়ে বলল –এতে হবে তো?

জেমি টাকাটা নিয়ে বলল–হ্যাঁ, আমি কিন্তু ফেরত দিয়ে দেব।

-তুমি আমার বোনকে ফেরত দিও, তাহলেই হবে। বান্দা কঠিন কঠোর কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল।

***

মধ্যরাতে, বান্দা জেমিকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। জেমি চারপাশে তাকাল। হ্যাঁ, একটা শান্ত শহরের মধ্যে তারা দাঁড়িয়ে আছে।

জেমি কিছু বলার চেষ্টা করছিল।

বান্দা বলল-এখুন কিছু কথা বলো না। আমার প্রতিবেশীরা খুবই কৌতূহলী। সে ধীরে ধীরে জেমিকে নিয়ে মাঠের মধ্যিখানে চলে গেল। তারপর হাতের আঙুল দেখিয়ে বলল–তুমি ওই দিকে চলে যাও। তোমার সঙ্গে জাহাজ ঘাটায় দেখা হবে।

***

জেমি কতগুলো বোর্ডিং হাউসের সামনে দাঁড়াল। ইংল্যান্ড থেকে আসার পর কোনটাতে সে ছিল, মিসেস ভেনস্টারকে দেখা গেল।

জেমি বলল –একটা ঘর কি পাওয়া যাবে?

আবার সেই সোনা বাঁধানো দাঁতের ঝিলিক –আমি মিসেস ভেনস্টার।

–আমি আপনাকে চিনি।

–তাই কি?

–আপনি কি আমাকে মনে করতে পারছেন না? গত বছর আমি এখানে ছিলাম। ভালোভাবে ভদ্রমহিলা তাকালেন না, এই ভাঙা নাক, বিষণ্ণ কাতর চোখ, সাদা দাড়ি, কোনো চিহ্নই তো চোখে পড়ছে না।

-আমি কিন্তু পরিচিত মুখ, ভুলি না। না, তোমাকে আমি আগে দেখিনি। তার মানে ভেবো না যে, তোমাকে থাকতে দেব না। আমার বন্ধুরা আমাকে দিদি বলে ডেকে থাকে। তোমার নাম কী?

জেমি অদ্ভুতভাবে বলল–আমার নাম ট্রাভিস। ইয়ান ট্রাভিস।

***

পরের দিন সকালবেলা জেমি পৌঁছে গেল জাহাজ ঘাটায়।

ফোরম্যান বললেন–হা, শক্ত সমর্থ লোক দরকার। তোমার বয়সটা ভাই একটু বেশি।

–আমার বয়স উনিশ জেমি বলল, কিন্তু মুখখানা দেখে বছর চল্লিশ মনে হচ্ছে হয়তো।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, তাকে মাল তোলা আর নামানোর কাজ করতে হবে। যাকে ঠিকেদারের চাকরি বলে। প্রত্যেক দিন নয় শিলিং করে পাবে।

জেমির সাথে বান্দার দেখা হল। জেমি বান্দাকে প্রশ্ন করল কিছু কথা বলা যাবে কি?

-এখানে নয় ম্যাকগ্রেগর। আমরা একটা পরিত্যক্ত ওয়্যার হাউসে চলে যাব। ডকের একেবারে শেষ প্রান্তে। এই শিফট শেষ হলে দেখা হবে কেমন?

জেমি ওই ফাঁকা ওয়্যার হাউসে হাজির হয়েছে। বান্দা ঠিক সময়ে এসে গেল।

জেমি বলল–ভ্যানডার সম্পর্কে আর কিছু জানা আছে কী?

–তুমি কী জানতে চাইছ?

–সব কিছু।

বান্দা বলতে থাকে–লোকটা হল্যান্ড থেকে এখানে এসেছে। ওর জীবনের অনেক কথাই আমি শুনেছি। ওর বউটা দেখতে কুৎসিত, কিন্তু অনেক টাকার মালিক। কী এক অজানা অসুখে সে মরে গেছে। ভ্যানডার তার সমস্ত টাকা নিয়ে ক্লিপড্রিফটে চলে যায়। সেখানে একটা মুদিখানা খুলে বসে। যারা হিরের সন্ধানে যায় তাদের প্রতারণা করে প্রচুর টাকা কামিয়েছে।

–যেভাবে ও আমাকে ঠকিয়েছে তাই তো?

-না, এটা একটা পদ্ধতি। লোকটা ওইসব হিরে সংগ্রহকারীদের হাতে অনেক টাকা তুলে দেয়। তারপর ওরা ফিরে আসে। হিরে যেটা নিয়ে আসে, সেটা ভ্যানডারের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়।

-কেউ প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেনি?

-কী করে করবে? ওই শহরের সবাইকে লোকটা নিয়মিত অর্থ সাহায্য করে। তাই কেউ ওর কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

-বুঝতে পারছি।

-ওর সাথে সকলের যোগাযোগ আছে। বারটেন্ডার স্মিথ হল ওর দালাল। স্মিথ ঠিক মতো লোককে ধরে ওর কাছে পাঠিয়ে দেয়। এরকমভাবে একটা অংশীদারীর শর্তে সই হয়। বলা হয় যদি হিরে পাওয়া যায়, তাহলে ভ্যানডার সবকিছু নিজে রেখে দেবে। আফ্রিকান ভাষা হওয়াতে কেউ বুঝতে পারে না।

-হ্যাঁ, যেভাবে আমাকে ঠকানো হয়েছে। আর কিছু?

–লোকটা ধর্মোম্মাদ। সে পাপীদের জন্য প্রার্থনা করে।

–তার মেয়ে? সে কি এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত?

-মিস মার্গারেট, না, সে বাবাকে খুব ভয় পায়। সে যদি কোনো পুরুষের চোখের দিকে তাকায়, ভ্যানডার তাহলে দুজনকেই মেরে ফেলবে।

জেমি কাজে ফিরে গেল। হ্যাঁ, দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির দিকে তাকিয়ে সে বলল আমরা আবার কথা বলব, কেমন?

***

কেপটাউনে জেমি অনেক কিছু জানতে পেরেছে। বুঝতে পেরেছে কালো এবং সাদার মধ্যে কী দারুণ বিভাজন রেখা। কালোদের সব অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাদের সাথে কুকুর বেড়ালের মতো ব্যবহার করা হয়।

জেমি একদিন বান্দাকে প্রশ্ন করেছিল তোমরা কী করে এই অবিচার সহ্য করছ?

-ক্ষুধার্ত সিংহ তার নখটাকে লুকিয়ে রাখে। একদিন এসব পরিবর্তন হবেই। কিন্তু এখন আমরা অতটা শক্তিশালী হতে পারিনি।

তাই কি? জেমি ভাবল, একদিন হয়তো সত্যি তফাতটা থাকবে না।

***

বান্দার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি ভালোবাসা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। প্রথমদিকে দুই মানুষের মধ্যে বৈরীতা ছিল। জেমি বান্দাকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। তার কেবলই মনে হত, এ লোকটা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

একদিন জেমি জিজ্ঞাসা করল–তোমরা স্কুলে যাও না?

-না, ছোটো থেকেই আমাকে কাজ করতে হয়েছে। আমার ঠাকুরমা আমাকে শিক্ষা দিয়েছে। সে বোর্ড স্কুলটিচার হিসেবে কাজ করত। সে লিখতে জানত, পড়তে জানত, তার কাছ থেকেই আমি সবকিছু শিখেছি। তার প্রতি আমার ঋণের সীমা নেই।

***

শনিবারের সন্ধেবেলা। জেমির কাজ হয়ে গেছে। সে একটা মরুভূমির কথা জানতে পারল। নামাকোয়াল্যান্ডে অবস্থিত নামিব মরুভূমি। বান্দা এবং সে তখন ওই ফাঁকা ওয়্যারহাউসে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। কথা বলতে বলতে অনেক কিছু জানা গেল।

জেমি জানতে চাইল তোমার সাথে ভ্যানডারের প্রথম দেখা কীভাবে হয়েছে?

-আমি তখন নামিব মরুভূমিতে কাজ করছি। এই মরুভূমির ধারে হিরের লুকোনো খনি। তার মালিক ছিল ওই লোকটা। মাঝে মধ্যেই সে ওখানে আসত।

-ভ্যানডার যদি এত বড়ো লোক তাহলে কেন মুদিখানার ব্যবসা করে?

–এটা হল একটা ফাঁদ। এভাবেই সে নতুন লোকেদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করে।

জেমি ভাবল, আমি কীভাবে প্রতারিত হলাম। হ্যাঁ, এই ছেলেটার ওপর কতখানি বিশ্বাস করা যায়। মার্গারেটের ডিম্বাকৃতি মুখটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ, মার্গারেট বলেছিল, আমার বাবা বোধহয় তোমাকে সাহায্য করতে পারে।

-আবার বলো কীভাবে দেখা হল?

-একদিন সে তার এগারো বছরের মেয়েকে নিয়ে ওখানে এসেছিল। আমি তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ভ্যানডার খুবই রেগে গিয়েছিল। আমাকে মারতে গিয়েছিল।

জেমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করল–কেন?

-আমি মেয়েটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করি। আমার গায়ের চামড়া কালো বলে এই উন্মাদনা নয়, আমি পুরুষ তাতেই ভ্যানডার চটে যায়। সে ভাবতেই পারে না, কোনো পুরুষ তার মেয়ের গায়ে হাত দেবে। আমি কিন্তু বাধ্য হয়েই তাকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম। তা না হলে সে রাস্তার ধারে পড়ে যেত। শেষ পর্যন্ত কয়েক জন এগিয়ে এসে তার রাগের উপশম ঘটায়। আর বলে, আমি না থাকলে মেয়েটি হয়তো মারাই যেত। সে আমাকে ক্লিপড্রিফটে নিয়ে আসে, তার ক্রীতদাস করে রেখে দেয়।

তারপর বান্দা বলতে থাকে, একটু ইতস্তত করে, দুমাস বাদে আমার বোন্ সেখানে এসেছিল।

বান্দার কণ্ঠস্বর শান্ত হয়ে গেছে সে ভ্যানডারের মেয়ের বয়সী।

এবারের গল্পটা জেমি আর শুনতে চাইল না। শেষ পর্যন্ত বান্দা নীরবতা ভঙ্গ করে বলতে শুরু করল, আমাকে নামিব মরুভূমিতে থাকতে হত। এই কাজটা সহজ। হামাগুড়ি দিয়ে হিরের টুকরোগুলো সংগ্রহ করা আর ছোটো ছোটো টিনের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা।

-হ্যাঁ, ওখানে কি এখনও হিরে আছে? বালির ওপর?

-সেকথাই তো আমি বলছি, ম্যাকগ্রেগর। কিন্তু এসব কথা এখন ভুলে যাও। ওখানে কেউ যেতে পারে না। ওটা সমুদ্রের একদম ধারে অবস্থিত। তিরিশ ফুট উঁচু ঢেউ যখন তখন লাফিয়ে পড়ে। অনেকে জলের তোড়ে ভেসে গেছে।

-অন্য কোনো পথ নেই।

–না, নামিব মরুভূমিটা সমুদ্র তীরে অবস্থিত।

–কীভাবে ওই হিরের খনিতে ঢোকা যায়।

–ওখানে একটা গার্ড টাওয়ার আছে। আর আছে কাঁটাতারের বেড়া। ভেতরে সব সময় রক্ষীরা থাকে। তাদের হাতে বন্দুক। ভয়ঙ্কর কুকুররা পাহারা দেয়। কেউ ঢুকতে গেলেই তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হবে। ওখানে ল্যান্ডমাইন থাকে, পা দিলেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। এইভাবে ওখানকার সবকিছুর ওপর নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদি ল্যান্ডমাইন কোথায় আছে, তুমি জানতে না পারে, তা হলেই সর্বনাশ।

-ওটা কত বড়ো?

–প্রায় ৩৫ মাইল।

ম্যাকগ্রেগর অবাক হয়ে ভাবল-৩৫ মাইল? বালির ওপর পড়ে আছে এক বিরাট হিরের খনি।

তার উত্তেজনা দেখে বান্দা বলল–তুমি কেবল উত্তেজিত হচ্ছো, তা নয়, অনেকেই তোমার মতো অবাক হয়ে যায়। কিন্তু কেউই শেষ পর্যন্ত সফল হয় না। এ ব্যাপারটা ম্যাকগ্রেগর ভুলে যাও, আমি সেখানে গেছি। ওখানে কেউ জীবন্ত ঢুকতে পারে না। দু-একজন হয়তো ঢুকে পড়ে। কিন্তু জীবন্ত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে পারে না।

জেমি সারারাত ঘুমোতে পারেনি। ৩৫ মাইল লম্বা একটা বিরাট হিরের খনি। আহা, এই সব কিছু ভ্যানডারের নিজস্ব সম্পত্তি? সমুদ্রের কথা চিন্তা করল। ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো কুকুরদের দল, সশস্ত্র প্রহরা, ল্যান্ডমাইন–ন, বিপদকে সে ভয় পায় না। মরতে তার ভয় নেই। কিন্তু ওই লোকটাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার আগে সে মরতে চাইছে না!

***

পরের সোমবার জেমি একটা দোকানে গেল। ওই অঞ্চলের একটা মানচিত্র কিনে আনল। হ্যাঁ, এই তো দেখা যাচ্ছে, পরিষ্কার সব কিছু বুঝতে পারা যাচ্ছে। দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে অরেঞ্জ নদী। এইখানে লেখা আছে নিষিদ্ধ অঞ্চল।

জেমি ওই অঞ্চলটার সব কিছুর ওপর নিরীক্ষণ করল। একবার নয়, দুবার নয়, অনেকবার। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত তিন হাজার মাইল ব্যাপি

সমুদ্রের সমাহার। কোনো কিছুই তরঙ্গরাশিকে কমাতে পারে না। হ্যাঁ, তারা আছড়ে পড়ছে সৈকতের ওপর। ৪৫ মাইল দক্ষিণে তটরেখা ধরে আছে একটা ভোলা সৈকত। হ্যাঁ, এই খানেই বোধহয় ওই হতভাগ্য লোকগুলো তাদের জাহাজ কিংবা নৌকো থামায়। তারপর নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করে। জেমি স্থির করল, ম্যাপের দিকে তাকিয়ে, এই সমুদ্র সৈকতটাকে পাহারা দেওয়া হয় না। পাহাড়ের খাড়াই হয়তো প্রাচীরের কাজ করে।

জেমি মন দিল ম্যাপের ওপর। বান্দার কথা অনুসারে এখানে তারের বেড়া আছে। চব্বিশ ঘণ্টা সশস্ত্র প্রহরীর দল থাকে। আর আছে একটা নজর মিনার। কিন্তু? কোন ভাবে যদি নজর মিনারের নজর এড়িয়ে এখানে ঢুকে পড়া যায়। তাহলে? তাহলে আছে ল্যান্ডমাইন এবং ভয়ঙ্কর কুকুরের দল।

পরের দিন জেমির সাথে বান্দার দেখা হল।

জেমি প্রশ্ন করল, –তুমি বলেছিলে, কোথায় কোথায় ল্যান্ডমাইন আছে, তার একটা ম্যাপ পাওয়া যায়। পাব কী করে?

-নামিব মরুভূমিতে। সুপার ভাইজারদের কাছে ওই ম্যাপ থাকে। তারা এইভাবেই শ্রমিকদের কাজ করায়। প্রত্যেকের কাছে একটা করে ফাইল থাকে।

কিছু মনে করার চেষ্টা করে সে আবার বলল- একদিন আমার কাকা আমার সঙ্গে কাজ করছিল। সে একটা পাহাড়ের ওপর উঠেছিল। তারপর ল্যান্ডমাইনের ওপর পড়ে যায়। তার শরীরের কোনো কিছুই পাওয়া যায়নি।

সারা শরীরে শিহরণ–মি. ম্যাকগ্রেগর, তুমি ব্যাপারটা ভুলে গেলেই ভালো হয়। ভয়ঙ্কর এক প্রকৃতি। ওখানে গিয়ে বেঁচে ফিরে আসতে পারবে না। মাঝে মধ্যে সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে, বালির ঝড় শুরু হয়।

-কতক্ষণ সেই ঝড় থাকে?

–কোনো সময় কয়েক ঘণ্টা, কখনও আবার কয়েক দিন।

–বান্দা, তুমি কি ওই ল্যান্ডমাইনের কোনো ম্যাপ দেখেছ?

-না, দেখা সম্ভব নয়। আমি তোমাকে আবার বলছি, এসব বাজে চিন্তা ছেড়ে দাও। একবার একদল সাদা শ্রমিক হিরে আনার চেষ্টা করেছিল। তাদেরকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সবার চোখের সামনে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ আর এ দুঃসাহস না করে।

না, ব্যাপারটা অসম্ভব। যদি কোনোভাবে সে ওই হিরক খনিতে ঢুকেও পড়ে, বেরিয়ে আসার উপায় নেই। বান্দা বোধহয় ঠিকই বলেছে। ব্যাপারটা ভুলতে হবে।

***

পরের দিন সে আবার বান্দাকে জিজ্ঞাসা করল–কীভাবে ভ্যানডার নজর রাখে? ওখানে যেসব শ্রমিকরা কাজ করে, তারা কি হিরে চুরি করতে পারে না?

–ওদের তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা হয়। উলঙ্গ করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। আমি দেখেছি, কীভাবে এই পরীক্ষা হয়ে থাকে। কেউ কেউ দাঁতের ফাঁকে হিরের কুচি ভরে রাখার চেষ্টা করে। এই ব্যাপারটাও সকলে জানে।

জেমির দিকে তাকিয়ে বান্দা বলল–যদি বেঁচে থাকতে চাও, তাহলে ব্যাপারটা ভুলে যেও।

***

সেই রাতে একটা অদ্ভুত সমাধান সূত্র হাতে এল। বান্দার সঙ্গে দেখা না করা অব্দি জেমি অধৈর্য হয়ে থাকল।

জেমি বান্দাকে বলল–যেসব নৌকোগুলো ওখানে যায় তার কথা বলল।

–নৌকো সম্বন্ধে কী জানতে চাইছ?

–নৌকোগুলো কেমন?

–কোনোটা ট্রাকবোট, কোনোটা মোটরবোট, কোনোটা সাধারণ ফেরি নৌকো। আমি যখন কাজ করেছি তখন দেখেছি। অনেকে নৌকো করে আসার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সম্ভব হয়নি। খাড়াই পাহাড়ে ধাক্কা লেগে নৌকোগুলো টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সবাই জলে ডুবে মরেছে।

জেমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল–কেউ কি ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেছে?

–হ্যাঁ।

–কীভাবে?

–র‍্যাফট নামে এক ধরনের নৌকো আছে। সেই নৌকোটা অতি দ্রুত যেতে পারে। বান্দা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, না, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এখন তার কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন। সে বলল, মি. ম্যাকগ্রেগর, মনে হচ্ছে, এবার বোধ হয় তোমার স্বপ্ন সফল হলেও হতে পারে।

***

এইভাবে খেলাটা শুরু হল। এমন একটা ধাঁধা, যা সহজে সমাধান করা যায় না। কিন্তু সমাধান তো করতেই হবে। জেমি এবং বান্দা এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে থাকে। দুজনে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

তারা জানে ওখানে বালির মধ্যে অসংখ্য হিরের টুকরো পড়ে আছে। কোনো যন্ত্রপাতির দরকার নেই। তারা একটা নৌকো তৈরি করবে। তারপর এগিয়ে যাবে। মাঝরাতে এই নৌকোটাকে বাইতে হবে। হ্যাঁ, সেখানে কোনো ল্যান্ডমাইন নেই, সেখানে কোনো প্রহরা নেই, শেষ অব্দি-তারা পৌঁছোতে পারবে কী?

জেমি বলল–আমরা আমাদের মতো কাজ করব। ভোররাতের আগেই আবার অন্ধকার জায়গায় ফিরে আসতে হবে। শেষ অব্দি আমাদের পকেটে ভ্যানডারের হিরের খণ্ডগুলো থাকবে।

-আমরা কীভাবে ফিরে আসব?

-কেন? যেভাবে আমরা ঢুকেছিলাম। আমরা সেভাবেই পাহাড়ের এলাকা এড়িয়ে সমুদ্রে পড়ব। তারপর ফিরে আসব।

শেষ পর্যন্ত বান্দার সব সংশয়ের অবসান হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল, প্রকল্পটা সফল হলেও হতে পারে। একটার পর একটা প্রশ্ন সে তুলেছে, জেমি শান্তভাবে শুনে উত্তর দেবার চেষ্টা করেছে।

জেমি শেষ পর্যন্ত বলল –একটা মস্ত বড়ো ব্যাগের সন্ধান করতে হবে, যার মধ্যে হিরের টুকরোগুলো ভরে রাখব।

বোঝা গেল, তার উৎসাহ এখন আকাশ ছুঁয়েছে।

বান্দা বলল–না, দুটো বড়ো ব্যাগ নিতে হবে।

***

পরের সপ্তাহে তাদের কাজ শুরু হয়ে গেল। তারা একটা গোরুর গাড়িতে চড়ে নোলোথ বন্দরের দিকে এগিয়ে গেল। এটা হল ওই নিষিদ্ধ এলাকার চল্লিশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটা সমুদ্র তীরবর্তী গ্রাম।

পোর্ট নোলোথ। তারা চারপাশে তাকিয়ে দেখল। গ্রামটা ছোটো এবং আদিমতার ছাপ আছে। ছোটো ছোটো টিনের ঘর, কয়েকটা দোকান, সমুদ্রের ধারে একটা ফাঁকা পরিত্যক্ত বাড়ি। অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে কোনো লুকোনো পাহাড় নেই, আহা, সমুদ্রের জল শান্তভাবে সৈকতকে চুম্বন করছে।

এখানে বসে কাজ হতে পারে। এখানে কোনো হোটেল নেই। কিন্তু ছোটো বাজার আছে।

বান্দা বলল–না, এটাকে তো ওই ধরনের নৌকোর মতো দেখাচ্ছে না।

-এটাকে ভাসিয়ে দিলেই আমরা বুঝতে পারব।

এবার কী হবে? কাজটা তাড়াতাড়ি করতে হবে। আজ রাতেই এখান থেকে পালাতে হবে। কনস্টেবল মান্ডি কালকে আসবেন।

বান্দা নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল।

তারপর ঠিক হল, সমস্ত গ্রামবাসী যখন ঘুমের মধ্যে অচেতন থাকবে, তখনই তারা এই দুঃসাহসিক অভিযানে বের হবে।

সারারাত কারও চোখের তারায় ঘুম ছিল না। প্রত্যেকের মনের মধ্যে অদম্য উত্তেজনা। আহা, একটা ভয়ঙ্কর অভিযান সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

***

রাত্রি দুটো। তারা ওয়্যার হাউসে দেখা করেছে। এখনই বোধহয় কাজ শুরু হবে। একটা অদ্ভুত ভয় তাদের গ্রাস করেছে। হ্যাঁ, এমন একটা অভিযান যেখানে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর হাতছানি। এখন আর ফিরে আসার জায়গা নেই।

তারা বাইরে বেরিয়ে এল। কোথাও কোনো শব্দ নেই। রাত্রি নীরবতার মুখোশ বন্দী। বিশাল সমুদ্রের জল সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশে চাঁদের রূপোলি আলো। হায় ঈশ্বর, জেমি ভাবল, আমরা কী এই আলো আর দেখতে পাব? হ্যাঁ, সময় এগিয়ে যাচ্ছে, এবার যেতে হবে।

ধীরে ধীরে কাজ শুরু করতে হবে।

বান্দা মাথা নাড়ল–আমরা কোথায় থাকব?

-কেন, ওই দ্বীপগুলোর ওপর?

–হ্যাঁ, অনেকগুলো দ্বীপ এখানে আছে।

জেমি অবাক হয়ে বলল–তুমি তার নাম জানো? কোথায় সেগুলো আছে জানো কি?

–হ্যাঁ, আমি তার নাম জানি। হয়তো সেখানে পৌঁছোতে পারব।

জেমি তার ম্যাপের দিকে তাকাল। বলল –হ্যাঁ, কিন্তু এই ম্যাপে তো ওই দ্বীপগুলোর কোনো চিহ্ন নেই।

-এগুলো ছোটো ছোটো দ্বীপ। ব্রিটিশরা এখানে জমি চাষের কাজ করে।

–ওখানে কেউ থাকে?

-না, এত ছোটো যে থাকা সম্ভব নয়। থকথকে কাদা আছে। অবশ্য সরকার মাঝে মধ্যে সেখানে বন্দীদের ছেড়ে দেয়। তারা ওই দ্বীপেই মরে যায়। আবার কেউ কেউ সেখানে থেকে যায়।

-আমরা কোথায় লুকিয়ে থাকব? ওখানেই থাকতে হবে হয় তো। জেমি শেষ পর্যন্ত ঠিক করল।

ওয়্যার হাউস থেকে তারা বাইরে বেরিয়ে এল। সেই নৌকোটাকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে চলে গেল। এত ভারী সহজে টানা যাচ্ছে না। ঘাম ছুটে গেছে, সবই বৃথা।

-এখানে দাঁড়াও। বান্দা বলল।

সে তাকাল। এক ঘণ্টা বাদে ফিরে এল। মস্ত বড়ো একটা দড়ি এনেছে। সে বলল–দাড় দিয়ে নৌকোটাকে বাঁধতে হবে। আমি টানব, আর তুমি ধাক্কা দেবে, কেমন?

জেমি বান্দার শক্তি দেখে অবাক হয়ে গেছে। সে দড়ি ধরে টানছে। জেমি ধাক্কা দেবার চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত নৌকোটা তরতর করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

এখন কোনো যন্ত্র নিতে হচ্ছে না। শুধু একটা কম্পাস। তাতেই যথেষ্ট।

বান্দা শান্তভাবে বলেছিল–হা, হয়তো আমাদের সমস্যার সমাধান হল।

-মি. ম্যাকগ্রেগর—

তুমি আমাকে জেমি বলে ডাকবে।

বান্দা মাথা নাড়ল–না, তুমি অনেক দূরের দেশ থেকে এসেছ। তোমার গায়ের রং সাদা। তোমাকে আমি নাম ধরে ডাকল কী? তারপর সে চিৎকার করে বলল, জেমি?

-চলো, আমরা হিরের অভিযানে বের হই।

***

নৌকোটাকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। দুজন তার দিকে তাকিয়ে আছে। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেছে। এবার যাত্রা শুরু হবে। হা, জিনিসটা দারুণ তৈরি হয়েছে।

নৌকোটা ভাসিয়ে দেওয়া হল। জেমি হাল ধরে বসে থাকল। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। যখন গ্রামবাসীদের ঘুম ভাঙবে, তখন এই নৌকোটা অনেক দূরে চলে যাবে। হয়তো বা দিগন্ত রেখার ওধারে।

জেমি চিৎকার করে বলল–আমরা করতে পেরেছি।

বান্দা বলল–না, কাজটা এখনও শেষ হয়নি। শুরু হয়েছে।

নৌকো যাত্রা শুরু করল। আলেকজান্ডার উপসাগরের পথে নৌকোটা এগিয়ে চলেছে। তারপর অরেঞ্জ নদীর কাছে। না, কোথাও জীবনের কোনো চিহ্ন নেই। যদিও যথেষ্ট খাবার দাবার আছে। টিন ভর্তি গোরুর মাংস, ঠাণ্ডা ভাত, ফল, দুটো ক্যানটিন ভরা জল। কিন্তু তারা কিছু খেতে চাইছে না। খেলে যদি কম পড়ে যায়।

চোখ বন্ধ করলেই মনে হচ্ছে সশস্ত্র প্রহরার কথা। চিৎকার করা বীভৎস চেহারার কুকুর। আর ল্যান্ডমাইন। কীভাবে এই কাজটা শেষ হবে। এটা কী পাগলের উন্মাদনা!

দুপুরবেলা হাঙরের দল এল, গোটা ছয়েক হবে।

বান্দা চিৎকার করে বলল –ওই দেখো, কালো পাখনাওয়ালা হাঙর। ওরা কিন্তু মানুষ খায়।

জেমি সভয়ে দেখল, ওরা অত্যন্ত দ্রুত নৌকোর দিকে এগিয়ে আসছে। জেমি অসহায়ের মতো জানতে চাইল–এখন আমরা কী করব?

বান্দা ঢোক গিলে জবাব দিল–সত্যি কথা বলতে কী, জেমি, এটা আমার প্রথম অভিজ্ঞতা।

একটা হাঙর নৌকোটাকে ধরে ফেলেছে। দুজন আপ্রাণ চেষ্টা করছে তাকে সরিয়ে দেবার। জেমির হাতে একটা কাঠের ডাণ্ডা ছিল। সেটা দিয়ে হাঙরটাকে আঘাত করার চেষ্টা করল। মুহূর্তের মধ্যে সেটা ভেঙে দুটুকরো হয়ে গেল। হাঙরের দল এবার

নৌকোর চারপাশে এসে গেছে। ধীরে ধীরে তারা সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। যে কোনো মুহূর্তে নৌকোটা উল্টে যেতে পারে।

-ওরা তো আমাদের ডুবিয়ে ছাড়বে।

-কী করে ওদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে? বান্দার জিজ্ঞাসা। তুমি আমাকে টিন ভর্তি গোরুর মাংস দেবে কি?

-তুমি মজা করছ? ওইটুকু মাংস খেয়ে ওরা খুশি হবে? ওরা আমাদের চাইছে।

আবার নৌকোটা দুলে উঠল।

জেমি চিৎকার করে বলল–তাড়াতাড়ি করো। সময় খুবই কম।

এক মুহূর্তের মধ্যে বান্দা টিনটা জেমির হাতে তুলে দিল। এবার নৌকোটা ডুবতে বসেছে।

–আদ্ধেকটা খোলো, তাড়াতাড়ি।

বান্দা তার পকেট থেকে একটা ছোট্ট ছুরি বের করল। আদ্ধেকটা খুলল। জেমি সেটা হাতে নিল। এবার ভাঙা ধাতুর অংশটা হাতের মধ্যে রাখল।

জেমি চিৎকার করে বলল –যে করেই হোক ওদের সরাতে হবে তারপর হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। অপেক্ষা করতে থাকল। সঙ্গে সঙ্গে হাঙর ছুটে এসেছে। বিরাট মুখটা দেখা

যাচ্ছে। দেখা গেল ঝকঝকে তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি। জেমি সর্বশক্তি দিয়ে দুহাত চেপে ধরল, তারপর ওই ভাঙা টুকরোটা হাঙরের চোখের ভেতর গেঁথে দিল।

হাঙরটা তার বিরাট শরীর তুলল, একটু বাদে দূরে চলে গেল। জলের রং লাল হয়েছে। হ্যাঁ, ঢেউয়ের আর্তনাদ। অন্য হাঙরগুলো তখন ওই আহতের পরিচর্যা করার কাজে ব্যস্ত। তারা নৌকোটার কথা ভুলেই গেছে। জেমি এবং বান্দা দেখল, তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছে ওই আহত হাঙরটাকে বাঁচাতে।

বান্দা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শান্তভাবে বলল–একদিন আমি আমার নাতিদের কাছে এই গল্পটা বলব। তারা কি বিশ্বাস করবে?

হ্যাঁ, তারা হেসে ফেলেছিল। হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল।

***

সন্ধের অন্ধকার, জেমি তার পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখল, আমরা মাঝরাতের কাছাকাছি ওইখানে পৌঁছে যাব। ছটা বেজে পনেরো মিনিটে সূর্য উঠবে। তার মানে ঘন্টা চারেক সময় পাওয়া যাবে। দু ঘন্টার ভেতর সমুদ্রে ফিরে আসতে হবে। বৃষ্টির সময় বাইরে যেতে হবে। বান্দা, তোমার কী মনে হয়? চারঘণ্টায় কাজ হবে না?

-একশো মানুষ সারাজীবন ধরে কাজ করে চলেছে, তুমি চার ঘণ্টায় কী করতে পারবে?

উত্তরদিকে তারা এগিয়ে চলেছে। সারাদিন ধরে নৌকো বেয়েছে। হ্যাঁ, বাতাস সাহায্য করেছে। জোয়ারের জলও সাহায্য করেছে। বিকেলের দিকে তারা একটা ছোট্ট দ্বীপের কাছে এসে দাঁড়াল। মনে হল, এখানে বোধ হয় আর কেউ নেই। দ্বীপটা খুব একটা বড়ো নয়। দুশো গজের বেশি তার পরিসীমা হবে না। দ্বীপের কাছাকাছি আসার সময় তারা অ্যামোনিয়া গ্যাসের গন্ধ পেল। চোখে জল এসে গেছে। জেমি বুঝতে পারল, কেন এখানে কেউ থাকতে পারে না। কিন্তু লুকিয়ে থাকার পক্ষে জায়গাটা আদর্শ। অনন্ত রাত্রি আসা পর্যন্ত। জেমি নৌকোটাকে বাঁধল। একটা পাথরের সঙ্গে। বান্দা ভালো করে বেঁধে দিল। তারা দ্বীপে এসে নামল। গোটা দ্বীপের ওপর অসংখ্য পাখির বসবাস। কতরকম পাখি, ফ্লেমিংগোর পাশাপাশি পেঙ্গুইন, গ্যানেট এবং পেলিক্যান-সব কিছু দেখা গেল। বাতাসের বুকে পাখির বিষ্ঠার গন্ধ। নিঃশ্বাস নেওয়া যাচ্ছে না। কয়েক পা ফেলে তারা আরও ভেতরে চলে গেল।

জেমি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল চলো, আমরা ওই নৌকোর কাছে চলে যাই।

কোনো কথা না বলে বান্দা তাকে অনুসরণ করল।

তারা ফিরে আসার জন্য পা বাড়াল। একদল পেলিক্যান পাখি আকাশে উড়তে শুরু করেছে। তিনজন মানুষকে দেখা গেল, মনে হচ্ছে, অনেক দিন ধরে তারা মরে পড়ে আছে। হ্যাঁ, অ্যামোনিয়া গ্যাস তাদের মৃতদেহকে অবিকৃত অবস্থায় রেখেছে। তাদের চুলের রং হয়ে গেছে উজ্জ্বল লাল।

এক মুহূর্ত বাদে জেমি এবং বান্দা ওই ছোট্ট নৌকোতে ফিরে এসেছে। এবার তারা সমুদ্রে আবার অভিযান শুরু করবে।

***

তারা অপেক্ষা করছে।

রাত্রি পর্যন্ত থাকতে হবে। তারপর আমরা আবার যাত্রা শুরু করব।

তারা নৈঃশব্দ্যের মধ্যে বয়ে আছে। সামনের মুহূর্তের কথা চিন্তা করছে। পশ্চিম দিগন্ত রেখায় সূর্য অস্ত গেল। আহা, মৃতার্ত আকাশের বুকে রঙের বর্ণোন্মাদনা। মনে হয়, কোনো উন্মাদ শিল্পীর কাজ বুঝি। তারপর অন্ধকারের ঘনঘটা।

ওরা আরও দুঘণ্টা অপেক্ষা করেছিল। জেমি এবার পাল খুলে দিল। নৌকোটা ধীরে ধীরে পূর্ব অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছে। অচেনা অজানা সৈকতের দিকে। মাথার ওপর চাঁদের আলো, বিবর্ণ এবং বিশীর্ণ।

নৌকোটার গতিবেগ বেড়েছে। দেখা যাচ্ছে ওই দূরে উপকূল রেখা। বাতাস আরও জোরে বইতে শুরু করেছে। হ্যাঁ, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ওই উপকূল ভূমি, একটু বাদে তারা সৈকতের কাছে এসে পড়ল। পাহাড়ের একটা প্রান্ত সেখানে পৌঁছে গেছে। দূর থেকে তারা কী যেন শুনতে পেল। হ্যাঁ, সমুদ্রের গর্জন। প্রচণ্ড আক্রোশে অনন্ত জলরাশি পাহাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। দূর থেকে দেখলেই মনের ভেতর ভয়ের কাপন জেগে যায়।

জেমি কোনরকমে বলল–আমরা কি এসে গেছি? এখানে কি রক্ষী আছে?

বান্দা কোনো জবাব দিল না- সে হাত তুলে পাহাড়ের দিকে তাকাল। জেমি বুঝতে পারল, বান্দা কী বলতে চাইছে। সত্যি, খাড়াই পাহাড় চূড়ো পার হয়ে ওখানে ঢোকা সম্ভব কী করে? ওরাই হল এই সমুদ্রের রক্ষাকর্তা। ওরা কখনও ঘুমোয় না। কখনও এক মুহূর্তের জন্য কাজে ফাঁকি দেয় না। দুজন ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে থাকল। জেমি ভাবল, শেষ পর্যন্ত আমরা বুদ্ধি দিয়ে পাহাড়কে হারিয়ে দেব। আমরা তোমার ওপর দিয়ে নৌকো চালিয়ে দেব।

নৌকোটা এখনও পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। জেমি সুনিশ্চিত, বাকি সময় সে সাহাযের হাত বাড়িয়ে দেবে।

–আমাদের আরও দ্রুত যেতে হবে। বান্দা বলল।

-চিন্তা করো না, জেমি বলল, যখন আমরা কাছে যাব, তখন আরও গতি বেড়ে যাবে। অতি সহজেই আমরা ওখানে পৌঁছে যাব।

বাতাস হঠাৎ আরও দুরন্ত হয়ে উঠেছে। নৌকোটা ধীরে ধীরে পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে গেল। জেমি বুঝতে পারল, কতটা দূরত্ব বাকি আছে। হ্যাঁ, এবার একটু বুদ্ধি করে এগোতে হবে। হঠাৎ সে মাথা নীচু করল, দেখা যাচ্ছে, এবার বড়ো বড়ো ঢেউ আসতে শুরু করেছে। নৌকোটা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। একটির পর একটি ঢেউ। নৌকোটা দেশলাই বাক্সের মতো একবার ওপরে উঠছে, পরক্ষণে নীচে নেমে আসছে। জেমি

ভেতরে ঢোকার পথের সন্ধান করতে থাকল। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। প্রচণ্ড জোরে শব্দ হচ্ছে। ঢেউ ভাঙছে, হ্যাঁ, আমাদের এই প্রকল্পের সফলতা নির্ভর করছে, কীভাবে এই অঞ্চলটা পার হওয়া যায় তার ওপর জেমি মনে মনে ভাবল। একটু ভুল হলেই আমরা মৃত মানুষে পরিণত হব।

তারা উঁচু পাহাড় চূড়ার তলায় চলে আসতে পেরেছে। এবার সমুদ্র আরও উত্তাল হয়ে উঠেছে।

-বান্দা, আমরা ঢুকে পড়েছি, জেমি চিৎকার করল।

হ্যাঁ, সত্যি এই নৌকোটা দেশলাই বাক্স, ধীরে ধীরে সৈকতের দিকে এগিয়ে চলেছে।

জেমি দূর থেকে সৈকত রেখা দেখতে পেল। একটু বাদে নৌকোটা শান্তভাবে উপকূলে এসে থামল।

আহা, আরও একটা ঢেউয়ের আক্রমণ, মনে হচ্ছে, নৌকোটা অনেক দূরে এগিয়ে যাবে। হ্যাঁ, সেটা অসহায়ের মতো দুলছে। জেমি এবং বান্দা কোনোরকমে নৌকোটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে।

জেমি বলল–লাফিয়ে পড়ো।

সে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই সফল হল না। বারবার চেষ্টা করার পর সে কোনোরকমে কাদা আর বালির বুকে এসে দাঁড়াল। হ্যাঁ, জেমি ভাবল, আমি বোধহয়

ডুবে যাচ্ছি। সত্যি, তার শরীরটা বালুকাবেলায় আছড়ে পড়েছে। জেমি নিঃশ্বাস নেবার জন্য চেষ্টা করছে। পারছে না। বাতাস এলোমেলো ঢুকে পড়েছে। জল ঢুকে গেছে। মনে হচ্ছে, সব কিছু বোধহয় এখানে শেষ হয়ে যাবে।

-তুমি ঠিক আছো? বান্দা জানতে চাইল।

একটু বাদে সে বলল–আমি কিন্তু সাঁতার কাটতে পারি না।

জেমি কোনোরকমে বান্দাকে নিয়ে ভেতরে যাবার চেষ্টা করল। হ্যাঁ, তারা শেষ পর্যন্ত হিরকখনিতে এসে পৌঁছে গেছে।

এ এমন একটা খনি, যেখান থেকে বাইরে যাবার কোনো উপায় নেই।

সমুদ্রের গর্জন

০৫.

সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে। সামনে মাইলের পর মাইল শুধু বিস্তৃত বালুকাভূমি। অনেক দূরে একটা পাহাড়ের শিখরচূড়া দেখা যাচ্ছে। এখানে কারা থাকে? এখানে থাকে, হিংস্র নরখাদকের দল। সমুদ্রের ওপর চাঁদের বিবর্ণ আলো। হ্যাঁ, এই হল সেই নিষিদ্ধ অঞ্চল।

চাঁদের আলোয় তারা স্পষ্ট দেখতে পেল, সেখানে লেখা আছে এখানে পা দিলেই সর্বনাশ।

হ্যাঁ, সমুদ্র এখানে ভয়ঙ্কর। কোথায় যাওয়া যায়? এখন বাঁ দিকে যেতে হবে, যে পথ চলে গেছে নামিব মরুভূমিতে।

-এবার এসো আমরা শেষ চেষ্টা করে দেখি। জেমি বলল।

বান্দা মাথা নাড়ল–না, প্রহরীরা দেখতে পেলেই আমাদের গুলি করবে। যদি আমরা কোনোরকমে প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে ঢুকে পড়তে পারি, তাহলে কুকুররা আছে। তারপর আছে ল্যান্ডমাইন। না, আমি যাব না।

জেমি বান্দার দিকে তাকাল। মনের ভেতর অনুশোচনা। আহা, এই লোকটাকে না আনলেই ভালো হত বোধহয়। এখন মনে হচ্ছে, মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে থাকার কোন উপায় নেই।

জেমি আবার সমুদ্রের দিকে তাকাল। উন্মত্ত জলরাশি ক্রমশই আঘাত করছে। রাত্রি দুটো বেজে গেছে। চার ঘন্টা বাদে সূর্য উঠবে। তখন আমরা ধরা পড়ে যাব। মাত্র চার ঘন্টা সময় আছে।

-বান্দা, কাজ শুরু করতে হবে।

বান্দা অবাক হয়ে জানতে চাইল–কী কাজ?

-আমরা এখানে কেন এসেছি? হিরে নেব বলে তো? কাজটা শুরু করা যাক।

বান্দা ওই পাগল লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল–না, লোকটাকে ভূতের মতো দেখাচ্ছে।

বান্দা বলল–তুমি কী বলছ?

-তুমি বলেছ, ওরা আমাদের দেখতে পেলে হত্যা করবে। তাই তো? কিন্তু আমরা তো এমনিতেই মারা যাব। এখানে অলৌকিক কিছু ঘটনা ঘটবে। এসো আমরা সেই ঘটনাটা ঘটাবার চেষ্টা করি। আমরা এখান থেকে কিছুতেই খালি হাতে ফিরব না।

-তুমি কী পাগল হয়ে গেছে! বান্দার বিস্ময়।

–না, আমি পাগল হইনি। সত্যি কথাই বলছি।

বান্দা ঘাড় নেড়ে বলল–এখন বলল কী করতে হবে?

জেমি তার ছেঁড়া শার্টটার দিকে তাকাল। বান্দা বুঝতে পারল, কী কথা বলা হবে এখন।

–আমরা হিরেগুলো পাব কী করে?

-সেগুলো সব জায়গায় ছড়ানো আছে। বান্দা বলল। যেমন আছে ওই রক্ষীরা আর কুকুরদের দল।

–ওদের জন্য পরে চিন্তা করলে চলবে। ওরা কখন এখানে আসবে?

–সূর্যের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে।

-তার মানে? কোনো একটা অঞ্চল আছে যেখানে প্রহরী কিংবা কুকুর নেই? যেখানে আমরা লুকিয়ে থাকতে পারব?

-না, এই দীর্ঘ সমুদ্র সৈকতের সর্বত্র তাদের উপস্থিতি। লুকোবার কোনো জায়গা নেই। এমন কী একটা মাছি পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে পারে না।

-তাহলে চলো, আমরা যাই।

— জেমি দেখল, বান্দা হাতে হাত রেখে যাবার চেষ্টা করছে। হাঁটতে পারছে না। ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

শেষ অব্দি সে একটা পেয়ে বলল–আমি একটা পেয়েছি।

জেমি মাথা নীচু করে দেখল–হ্যাঁ, এই তো এখানে সেখানে বালির মধ্যে হিরে ছড়ানো আছে। হ্যাঁ, এই হিরেটার ওজন অবশ্যই পনেরো ক্যারেট। সে বসে পড়ল। বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। এত সহজে অনেক অর্থ হাতে আসতে পারে। এ সবই ভ্যানডারের, জেমি অত্যন্ত দ্রুত হিরে সংগ্রহ করতে থাকল।

পরবর্তী তিন ঘন্টায় তারা প্রায় চল্লিশটার মতো হিরে সংগ্রহ করল। দুশো তিরিশ ক্যারেট ওজনের। পুবের আকাশ ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠছে। এবার জেমিকে এই জায়গা থেকে চলে যেতে হবে। তাকে র‍্যাফটে পৌঁছোতে হবে। আবার সেই পার্বত্য অঞ্চল পেরিয়ে পালাতে হবে। না, একথা এখন চিন্তা করে লাভ নেই।

জেমি বলল–সকাল হয়ে এল, কটা হিরে জোগাড় হল বলো তো।

–এখানে যথেষ্ট হয়েছে। আর দরকার নেই।

তারপর? একটির পর একটি হিরককণা, গুনতে গুনতে মানুষ হয়তো পাগল হয়ে যাবে। ক্রমশ আরও হিরের সংখ্যা বাড়ছে। ষাটটার মতো হিরে পাওয়া গেল।

-এগুলো আমি নেব?

–না, আমরা ভাগাভাগি করে নেব।

জেমি বুঝতে পারল, বান্দা কী ভাবছে? হ্যাঁ, কেউই হিরের কর্তৃত্ব ছাড়তে চায় না।

-আমি এগুলো নিচ্ছি। জেমি বলল। সে হিরেগুলোকে নিয়ে একটা পুটলির মতো করল। তারপর শার্টের সঙ্গে বেঁধে নিল।

আকাশ ক্রমশ লাল হয়ে উঠছে। পুব আকাশে আলোর ইশারা।

এবার কী? এটাই হল প্রশ্ন। উত্তর কোথায়? এখানে থাকলে মৃত্যু অনিবার্য।

–আমরা কি ভেতর দিকে চলে যাব?

-চলো, যাই।

জেমি এবং বান্দা ধীরে ধীরে সমুদ্র থেকে দূরে চলে গেল।

–আমরা কি জানি কোথায় ল্যান্ডমাইন আছে?

-একশো গজ আগে। ওইখানে ওখানে পৌঁছোনোর আগেই বান্দার কথা শেষ হল না। কুকুরের হিংস্র গর্জন শোনা গেল।

ল্যান্ডমাইনের চিন্তা পরে করলেও চলবে। কুকুরগুলো কিন্তু এখুনি এখানে এসে যাবে। তার মানে সকালের কাজ শুরু হল।

-কতক্ষণ সময় হাতে পাওয়া যাবে?

–পনেরো মিনিট, অথবা দশ মিনিট।

হ্যাঁ, সকাল হয়েছে। এবার কী হবে? লুকোবার কোনো জায়গা নেই।

–এক এক শিফটে কত জন গার্ড থাকে?

–অন্তত দশজন।

–দশজন গার্ড কি এত বড়ো সমুদ্রসৈকত পাহারা দিতে পারে?

-একজন গার্ড যথেষ্ট। তাদের হাতে বন্দুক আছে। আর আছে ওই পাগলা কুকুরের দল। গার্ডগুলোর চোখ অন্ধ নয়। আর আমাদের তো সহজেই দেখা যাবে।

শব্দটা আরও কাছে এগিয়ে আসছে।

জেমি বলল –বান্দা, আমি দুঃখিত। আমি কখনও এই ব্যাপারে জড়াতাম না।

-সত্যি বলছ?

তারা শব্দটা শুনতে পেল।

জেমি এবং বান্দা একটা ছোটো গুহার কাছে এসে পৌঁছেছে।

হ্যাঁ, আমরা যদি বালির তলায় লুকিয়ে পড়ি, তাহলে কী হয়? জেমি জানতে চাইল।

বান্দা বলল–এটাও চেষ্টা করা হয়েছে। কুকুররা গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিক হাজির হবে। আমি এভাবে মরতে চাইছি না। ওরা আমাকে দেখুক, তারপর ছুটে আসুক। অথবা ওরা আমাকে গুলি করুক। না, কুকুরে আমাকে খাবে, ভাবতেই পারছি না।

জেমি বান্দার হাত শক্ত করে ধরে বলল–হয়তো আমরা মরে যাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁচার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

ওরা নানা কথা বলার চেষ্টা করছে। দূর থেকে শব্দ শোনা গেল। এই বেজম্মার দল। সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোস, এবার আয়, আমাকে অনুসরণ কর। সারারাত, তত ঘুমিয়েছিস।

হ্যাঁ, জেমি বুঝতে পারল, এ বার কণ্ঠস্বর ক্রমশ কেঁপে যাচ্ছে। সে সমুদ্রের দিকে তাকাল। ডুবে মরাই কী ভালো? হ্যাঁ, বিরাট পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে পালানো কোনোমতেই সম্ভব নয়।

এক মুহূর্তের জন্য কীসব চিন্তা করল।

হঠাৎ দেখা গেল সমুদ্রে ঝড় উঠেছে। প্রবল জলোচ্ছ্বাস।

বান্দা চিৎকার করল সপ্তাহে দু-তিনবার সে আসে, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। এর হাত থেকে কারও মুক্তি নেই।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

এসে গেল, এসে গেল ওই ঝড়ের উম্মাদনা। মনে হল, বিরাট এক দৈত্য বুঝি তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আঃ আবার আবার এল, মনে হচ্ছে জীবনটা অতিষ্ঠ হয়ে যাবে।

লোকগুলো চিৎকার করছে।

জেমি বলল–আমরা বোধহয় একটা সুযোগ পেলাম।

–হ্যাঁ, মনে হচ্ছে।

–ওই জলোচ্ছ্বাস আমাদের বাঁচিয়ে দেবে। ওরা আমাদের দেখতে পাবে না।

–এতে কোনোই লাভ হবে না, আমরা তো ভেসে যাব। আর এক মুহূর্ত বেঁচে থাকতে পারব না।

***

আকাশ ক্রমশ অন্ধকার হয়ে উঠেছে। হ্যাঁ, ঝড়টা আরও বাড়তে শুরু করেছে। সমুদ্রকে আচ্ছাদিত করেছে। মনে হয়, সে বোধহয় গোটা উপকূলভাগকে গিলে খাবে। এগিয়ে আসছে। জেমি ভাবল, এটা কী আমাকে বাঁচাবে।

দূর থেকে একটা শব্দ শোনা গেল। তোমরা দুজন কোথা থেকে এলে?

জেমি এবং বান্দা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। বালির পাহাড়ের ওপর একশো গজ দূরে একটা ইউনিফর্ম পরা গার্ডকে দেখা গেল। হাতে তার রাইফেল। জেমি সৈকতের দিকে তাকাল।

অত্যন্ত দ্রুত ঝড়টা ছুটে আসছে।

-তোমরা চলে এসো, লোকটা চিৎকার করল। রাইফেল তুলল।

জেমি তার হাত তুলে দিয়েছে। সে বলল–আমি যেতে পারছি না।

–যেখানে আছে সেখানে থাকো। গার্ড চিৎকার করে বলল, আমি এখুনি আসছি।

সে তার রাইফেল নামিয়ে দ্রুত হেঁটে আসার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। ঝড়ের তাণ্ডব তাকে সরিয়ে দিয়েছে।

-ছোটো, জেমি বলতে থাকল, এবার ছুটতে হবে।

–দাঁড়িয়ে যাও, রাইফেলের শব্দ, বিস্ফোরণ।

ওরা ছুটতে শুরু করেছে। না, আর বোধহয় বাঁচা সম্ভব নয়। আর একটা রাইফেলের শব্দ। বুলেট বর্ষণ হচ্ছে। একদম পাশে, আর একটা। এবং আর একটা। একদিকে সমুদ্র ঝড়ের তাণ্ডব, অন্যদিকে তপ্ত সীসার চুম্বন। তারা এখন কোথায় যাবে?

শব্দটা দূর থেকে আরও দূরে চলে যাচ্ছে। ঝড়টা এসে গেছে।

শোনা গেল, দুজন রক্ষীর মধ্যে কথাবার্তা। একজন বলল- গার, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? দুজন লোককে দেখা গেছে। একটা সাদা, একটা কালো। তারা বালুকাবেলায় আছে। তাড়াতাড়ি রক্ষীদের খবর দাও। দেখামাত্র গুলি করতে হবে।

জেমি ফিসফিসিয়ে বলল–হ্যাঁ, এবার পালাতে হবে।

বান্দা জানতে চাইল–কী করব?

-এখান থেকে পালাব।

জেমি কম্পাসটা সামনের দিকে রাখল। দেখাই যাচ্ছে না, বলল, এই দিকে।

–আমি হাঁটতে পারছি না।

–তোমাকে অন্তত কিছু দূর যেতেই হবে।

ওরা ছুটতে শুরু করল, এলোমেলো পায়ে। যেভাবে অন্ধ মানুষ হেঁটে যায়। কিন্তু কিছুতেই যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বালির বুকে পা গেঁথে যাচ্ছে। প্রত্যেক পদক্ষেপ ফেলার আগে জেমি তার কম্পাসের ওপর চোখ রাখছে। এপর্যন্ত একশো গজ হাঁটা শেষ হয়েছে। বেশ কিছুটা বাকি আছে।

-এখান থেকেই ল্যান্ডমাইনের যাত্রা শুরু, তাই তো?

-হ্যাঁ, এবার প্রার্থনা করো। এই ল্যান্ডমাইন অতিক্রম করে কেউ যেতে পারবে না। সব জায়গায় ছড়ানো ছেটানো আছে। ছ-ইঞ্চি অন্তর অন্তর। আমরা জানি না, কোথায় পা ফেলব।

ক্রুগার–আবার শব্দটা শোনা গেল।

-কী হয়েছে বেন্ট?

হ্যাঁ, শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কুয়াশার আবরণ ভেদ করে ছুটে আসছে বুলেট।

–ল্যান্ডমাইন কখনও তুমি দেখেছ? জেমি জানতে চাইল।

–হ্যাঁ, কয়েকটা ল্যান্ডমাইনকে আমি নিষ্ক্রিয় করেছি।

-কতখানি ওজন ধরে?

-একজন মানুষের ওজনের সমান। আশি পাউন্ডের বেশি। সব কিছুকে বিস্ফোরণের মাধ্যমে নষ্ট করে দেয়। তবে তারা কুকুরদের হত্যা করে না।

-আমি একটা বুদ্ধি করেছি। তুমি কি আমার সঙ্গে জুয়া খেলবে? জেমি জানতে চাইল।

–তুমি কী বলতে চাইছ?

–এসো, আমরা হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটি।

–তাহলে কী হবে?

-তাহলে বেশি ওজন হবে না। তুমি তো বলেছ, ৮০ পাউন্ডের বেশি ওজন না হলে সেগুলো ফাটে না।

-এটা তো জীবন আর মৃত্যুর খেলা।

–এখন আর ভাববার উপায় নেই।

জেমি বালির ওপর শুয়ে পড়ল। বান্দা তার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। তারপর তাকে অনুসরণ করল। তারা হামাগুড়ি দিতে দিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

-এবার কোথায় যাওয়া যেতে পারে, জেমি জানতে চাইল। হাত-পা ছুঁড়ো না কিন্তু, তোমার গোটা দেহটা ব্যবহার করার চেষ্টা করো।

এভাবেই তারা সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

***

সামনে একটু অন্ধকার। দূরে দেখা গেল একজন গার্ডকে। আবার কুকুর এবং ল্যান্ডমাইন। জেমিকে যে করেই হোক এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। অনেক কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে।

কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে তারা সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। শেষ পর্যন্ত সময় অনন্তে মিশে গেল। দূর থেকে তখনও শোনা যাচ্ছে সেই উন্মত্ত রক্ষীদের আর্তনাদ- ক্রুগার বেন্ট! ক্রুগার বেন্ট?

তারা কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিল। জেমি কম্পাসটা হাতে ধরে রেখেছে। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেছে। আবার শুরু হল এইভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। হ্যাঁ, চেতনা বোধহয় নষ্ট হয়ে যাবে। বিরাট একটা মরুভূমি, জেমি ভাবল, আমরা বোধহয় এবার জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছি।

এখানে কিছুই নেই, শুধু ধু-ধু বালি।

জেমির মনে হল, শরীরের সব শক্তি একত্রিত করতে হবে। যন্ত্রণা হচ্ছে, জেমি দেখতে পেল, বান্দা আর নড়তে চড়তে পারছে না। সে একটা মৃত কুকুরের কঙ্কালের পাশে শুয়ে আছে।

কুকুরটা অদ্ভুতভাবে মরে পড়ে আছে।

বান্দা জানতে চাইল–আমি আর কতদূর যাব?

জেমি জবাব দিতে পারল না। জেমি অনেকক্ষণ শুয়ে থাকল।

–আমাদের এভাবে এগোতে হবে। ওখানে আরও অনেক রক্ষী আছে। বান্দা বলল।

জেমি ঘাড় কাত করল।

সূচিপত্র

এবার তারা অভিযানের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে। শেষ পর্যন্ত অনেক দূরে পৌঁছে গিয়ে তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল।

জেমি চোখ খুলল। অনেক কিছু পালটে গেছে। সে সমুদ্রের পাশে বালির ওপর শুয়ে আছে। শরীরটা শক্ত। সর্বত্র ব্যথা। কী ঘটেছে বুঝতে পারছে না। দেখতে পেল, ছ ফুট দূরে বান্দা ঘুমিয়ে আছে। চারদিকে উন্মাদ উদ্দাম জলরাশি। আর নৌকোটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সমুদ্রের ঝড় সবকিছু ভাসিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সেটা কোথায় গেল। তার বুকের ভেতর কেমন একটা শব্দ। বান্দা? হ্যাঁ, সমুদ্র ঝড় চলে গেছে। কাছাকাছি শব্দ শোনা যাচ্ছে। কুয়াশা এখন আর আগের মতো নেই। তাহলে? জেমি উঠে বসার চেষ্টা করল। বান্দার কাছে চলে গেল। বান্দা উঠে বসল। হ্যাঁ, ঘুম ভেঙে গেছে।

-আমরা এসেছি কি? বান্দা জানতে চাইল।

–হ্যাঁ, হয়ে গেছে, আমাকে ওই হিরেগুলো দিয়ে দাও।

বান্দা তাকে হিরের পুঁটলিটা দিয়ে দিল।

-আমাকে অনুসরণ করো।

–গেটে কিন্তু ওই প্রহরীরা আছে, বান্দা নীচু স্বরে বলল। তারা দেখতে পেলেই সর্বনাশ।

–ঠিক আছে, আমি দেখছি।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

দুজন এগিয়ে গেল, দুজন প্রহরীর দিকে। তারপর? ওদের কথাবার্তা শান্তভাবে শুনল।

জেমি এবং বান্দা গেট পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। দেখা গেল, বিরাট চেহারার দুজন বন্দুক বাজকে। তারা পায়চারি করছে।

জেমি বলল–এখানে তোমার চাকরি পাওয়া যেতে পারে?

বান্দা তার দিকে তাকিয়ে আছে।

একজন প্রহরী বলল–তোমরা এখানে কী করছ?

-আমরা চাকরির সন্ধানে এসেছি। আমরা শুনেছি, এখানে নাকি গার্ডের চাকরি পাওয়া যায়? আমার চাকরটা ভালোভাবে খননের কাজ করতে পারে।

লোকটার চোখের তারায় কেমন একটা উল্লাস।

সে বলল–বাইরে বেরিয়ে এসো।

–আমরা বাইরে যাব না। জেমি বলল, আমাদের চাকরি চাই।

–এটা সংরক্ষিত এলাকা। এখান থেকে বেরিয়ে এসো তোমরা দুজন।

বাইরে একটা গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। যারা কাজ শেষ করতে পারেনি, তারা এখন এই গাড়িতে উঠবে।

লোকটা আবার বলল- এই ওয়াগন তোমাদের পার্টনোলোথে নিয়ে যাবে। যদি চাকরির সন্ধান থাকে, তবে সেখানেই চলে যাও। সেখানেই আমাদের কোম্পানির অফিস।

-অনেক ধন্যবাদ, স্যার। জেমি বলল। সে বান্দার দিকে তাকাল। দুজন গেটের বাইরে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হল। এবার স্বাধীনতা–শুধুই স্বাধীনতা।

গার্ড বিড়বিড় করে বলল–বোকা হদ্দের দল।

***

দশ মিনিট কেটে গেছে। জেমি এবং বান্দা পোর্টনোলোথের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে। হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে এমন কিছু হিরে আছে, যার দাম পাঁচ লক্ষ পাউন্ডের কম হবে না।

.

০৬.

ক্লিপড্রিফটের নোংরা পথে দামী গাড়িটা গড়িয়ে চলেছে। শহরটা অনেকখানি পালটে গেছে। এক বছরর মধ্যে। জেমি ম্যাকগ্রেগর এক বছর আগে এই শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ১৮৮৪, এই শহরটা এখন ক্যাম্প থেকে একটা ছোট্ট টাউনে পরিণত হয়েছে। কেপটাউন থেকে হোপটাউন পর্যন্ত রেলপথ চালু হয়েছে। তারই একটা স্টেশন হয়েছে ক্লিপড্রিফটে। এর ফলে শহরটার পরিবেশ একেবারে পালটে গেছে। আরও বেশি মানুষের আগমন ঘটেছে। এখনও হিরে সংগ্রহকারীরা এই শহরে আসছে। এর

পাশাপাশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা মানুষদের দেখা যাচ্ছে। হা, ক্লিপড্রিফট আজ এক গৌরব করার মতো শহর।

জেমি নতুন ট্রানসলগুলোর পাশ দিয়ে চলে গেল। অনেকগুলো নতুন সেলুন দেখতে পেল। হ্যাঁ, নতুন তৈরি একটা চার্চ আর সেলুন। গ্র্যান্ড নামে একটা মস্ত বড়ো হোটেল।

জেমি সেখানে থামল, ব্যাঙ্কের ভেতর ঢুকে গেল। ম্যানেজারকে গিয়ে হেঁড়ে গলায় বলল –এক লক্ষ পাউন্ড জমা দিতে চাইছি।

***

কথারা দ্রুত বাতাসের বুকে ভর দিয়ে ভেসে গেছে অনেক দূরে। ব্যাঙ্ক থেকে জেমি সানটাউনার সেলুনে ঢুকল। সে-ই সকলের আকর্ষণ কেড়ে নিয়েছে। সেলুনের ভেতরটা একইরকম আছে। একইরকম লোকের সমারোহ। সকলেই উৎসুক চোখে জেমির দিকে তাকিয়ে আছে। স্মিথ উদাসীন ভাবে বলল–স্যার, কী দেব?

বারটেন্ডারকে দেখে মনে হচ্ছে, সে বোধহয় কখনও জেমিকে দেখেনি।

— হুইস্কি; সব থেকে ভালো মালটা চাই।

–হ্যাঁ, স্যার। লোকটা মাল ঢালতে ঢালতে বলল–আপনি কি এই শহরে নতুন নাকি?

–হ্যাঁ।

–কেন এসেছেন?

–শুনেছি এই শহরে নাকি নতুন নতুন ব্যবসা স্থাপিত হয়েছে। আমি টাকা ঢালতে চাইছি।

বারটেন্ডারের চোখের আলো জ্বলে উঠেছে–হ্যাঁ, এটাই হল মূলধন ঢালার সব থেকে ভালো জায়গা। হ্যাঁ, এক লক্ষ পাউন্ড যার হাতে আছে, পৃথিবীটা তার পায়ের তলায়। আমি কি আপনার কাজে লাগতে পারি?

-হ্যাঁ, কিন্তু কীভাবে?

স্মিথ নীচু হল, তার ঠোঁটের ভেতর ফিসফিসানি কণ্ঠস্বর- আমি একজন মানুষকে জানি, যিনি এই শহরটাকে চালান। তিনি হলেন বড়ো কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। সিটিজেনস কমিটির প্রধান। এই অঞ্চলে তার নাম সকলে জানে। তিনি হলেন ভ্যানডার।

জেমি মদ খেয়ে বলল–আমি....

স্মিথের কণ্ঠস্বরে আগ্রহ ঝরে পড়ছে। স্মিথ আরও বলতে থাকে–আপনি একবার তার সঙ্গে কথা বলবেন?

জেমি আর এক ঢোক মদ গিলে বলল–লোকটাকে এখানে আনা যাবে না?

বারটেন্ডার জেমির হাতের আঙুলে পরানো মস্ত বড়ো হিরের আংটিটার দিকে তাকাল। আংটিটা ঝলসে উঠছে। সে বলল–হ্যাঁ, স্যার। আপনার নাম কী বলব?

ট্রাভিস, ইয়ান ট্রাভিস।

–মি. ট্রাভিস, আমার মনে হয়, ভ্যানডার নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।

সে আরও খানিকটা মদ ঢেলে দিয়ে বলল–আমি ওনাকে ডেকে আনছি। আপনি ততক্ষণ এটাকে সাবাড় করুন।

জেমি বারে বসে রইল। ধীরে ধীরে হুইস্কি খেতে থাকল। সে বুঝতে পারছে, সেলুনে উপবিষ্ট সকলে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ক্লিপড্রিফট থেকে অনেকে টাকার সন্ধানে বাইরে বেরিয়ে যায়। কিন্তু এত টাকা আয় করে এর আগে কেউ এখানে আসেনি। এটা সম্পূর্ণ একটা নতুন অভিজ্ঞতা।

পনেরো মিনিট কেটে গেছে। বারটেন্ডার ফিরে এসেছে। তার সাথে সলোমন ভ্যানডার।

ভ্যানডার এই সাদা চুলের দাড়িওয়ালা লোকটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। হাতে হাত দিয়ে হেসে বললেন –মি ট্রাভিস, আমি সলোমন ভ্যানডার।

-ইয়ান ট্রাভিস।

জেমি ভেবেছিল, ভ্যানডার বোধহয় তাকে চিনতে পারবেন। কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। জেমি ভাবল, আর তো কিছুই নেই। কত কিছু পালটে গেছে। আঠারো বছরের সেই বোকা সোকা অনভিজ্ঞ বালক আজ কত বদলে গেছে। স্মিথ দুজনকে একটা কোণের টেবিলে নিয়ে গেল।

তারা বসল।

ভ্যানডার বললেন আমি বুঝতে পারছি, আপনি ক্লিপড্রিফটে কিছু অর্থ ঢালতে চাইছেন, তাই তো মি. ট্রাভিস?

-হ্যাঁ, আপনি ঠিক অনুমান করেছেন।

-আমি হয়তো আপনাকে সাহায্য করব। একটা ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকবেন স্যার। এখানে বেশির ভাগই বাজে লোকের ভিড়। জোচ্চোর বদমাইস লুটেরা।

জেমি বলল–হ্যাঁ, আমি সব জানি।

ব্যাপারটা সত্যি অবাস্তব। দুজনের মধ্যে একটা অদ্ভুত আলোচনা চলছে। একজন অন্যজনকে ঠকিয়েছেন, তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছেন, ভ্যানডারের প্রতি অন্যজনের ঘৃণা আকাশ ছুঁয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সে প্রতিশোধের জাল বুনেছে। শেষ পর্যন্ত তার স্বপ্ন হয়তো সফল হতে চলেছে।

-মি. ট্রাভিস, আপনি কত টাকা ঢালতে চাইছেন? ব্যাপারটা বলবেন কী?

-আমি এক লক্ষ পাউন্ড দিয়ে শুরু করতে চাইছি। জেমি উদাসীনভাবে বলল। সে দেখল, ভ্যানডারের মুখ কেমন পালটে গেছে। তারপর হয়তো তিন-চার লক্ষ পাউন্ড ঢালব।

-হ্যাঁ, তাহলে তো খুব ভালো ব্যবসা হবে। অবশ্য ভালো একজন পথ নির্দেশক থাকা দরকার। ভ্যানডার বললেন। আপনি কী ভেবেছেন? কোন ব্যবসায় টাকা ঢালবেন?

-না, দেখা যাক কী সুযোগ পাওয়া যায়।

-হ্যাঁ, তা তো ভাবতেই হবে। ভ্যানডার বললেন। আপনি কি আজ রাতে আমার সাথে ডিনার খাবেন? তাহলে আমরা ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। আমার মেয়ে দারুণ রান্না করে। আপনাকে খাওয়াতে পারলে আমি নিজেকে গর্বিত বলে মনে করব।

জেমি হাসল–হ্যাঁ, আমারও ভালো লাগবে মি. ভ্যানডার।

এইভাবেই শুরু হল।

***

নামিব থেকে কেপটাউনের যাত্রাপথ ছিল ঘটনাহীন। জেমি এবং বান্দা একটা গ্রামে এসে থামল। জেমির হাতে চোট লেগেছে। স্থানীয় ডাক্তার সেই চোটের উপশম করলেন। তারা একটা ওয়াগানে চড়ে বসল। দীর্ঘ যাত্রা। কিন্তু তাদের অসুবিধা হয়নি। কেপটাউনে এসে জেমি রয়াল হোটেলে উঠে পড়ল। লেখা আছে–ডিউক অফ এডিনবরার দ্বারা সাহায্যকৃত। সে একটা রয়াল সাইটে গিয়ে থাকল।

-শহরের সেরা নাপিতকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। জেমি ম্যানজারকে বলল। তারপর একজন দরজির সন্ধান দেবে আর একটা মুচিও পাঠাতে হবে।

ম্যানেজার গদগদ হয়ে বলল–সবকিছুই করব স্যার।

-জেমি ভাবল, টাকা দিয়ে আমরা পৃথিবীটাকে পায়ের তলায় কিনে রাখতে পারি।

***

রয়াল স্যুইটের বাথরুমটা বুঝি. এক টুকরো স্বর্গ। জেমি অনেকক্ষণ গরম জলে শুয়ে ছিল। আহা, তার সমস্ত ক্লান্তি এক নিমেষে কোথায় উধাও হয়ে গেল। সে গত কয়েক সপ্তাহের অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলো চিন্তা করল। বান্দা আর সে যখন থেকে ওই নৌকোটা তৈরি। করছিল। মনে হল অনেক বছর বুঝি কেটে গেছে। আহা, জেমি ভাবল, কীভাবে নৌকোটা উপকুলের দিকে চলে গিয়েছিল। সামুদ্রিক ঝড়ের কথাও মনে পড়ল তার। হ্যাঁ, ওই ঝড় হয়তো তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। কতগুলো শব্দ সবসময় তার কানে ধ্বনিত হচ্ছে ক্রুগার বেন্ট! ক্রুগার বেন্ট ইত্যাদি।

কিন্তু, বান্দার কথা মনে রাখতেই হবে। বান্দা না থাকলে এ যাত্রায় সে বাঁচতে পারত না।

তারা কেপটাউনে পৌঁছোনোর পর জেমি বলেছিল, তুমি আমার সঙ্গে থাকো।

বান্দা হেসেছিল, ঝকঝক করছিল তার সুন্দর সাদা দাঁত।–না, জেমি, তোমার সঙ্গে থাকলে জীবনটা ঘটনাবিহীন অবস্থায় কেটে যাবে। আমাকে তো উত্তেজনা আনতে হবে।

-তুমি এখন কোথায় যাবে?

-আমি এখন একটা ফার্ম কিনব। একটা বউ জোগাড় করব। অনেকগুলো ছেলেপুলে চাই আমার।

-ঠিক আছে। তাহলে ওই হিরেগুলো বেচে দেবে?

–না, হিরে আমার চাই না।

জেমি অবাক হয়ে গেছে।–কী বলছ? যে কটা হিরে পাওয়া গেছে, তার আদ্ধেক তোমার। তুমি তো অনেক লক্ষ পাউন্ডের মালিক হলে।

-না, আমার গায়ের রঙের দিকে তাকাও, জেমি, যদি আমি অনেক লাখ টাকার মালিক, হয়ে যাই, আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাবে।

-তুমি এই হিরেগুলো কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারো।

-না, আমাকে একটা ছোটো খামার কিনতে হবে। দুটো ষাঁড় কিনব। আর একটা বউ চাই। দুটো বা তিনটে হিরে হলেই আমার চলবে। বাকি সবকিছু তোমার।

-না, এটা অসম্ভব। আমি তোমাকে তোমার অংশ দেবই।

–জেমি, তুমি তা দিতে পারো না। কারণ তুমি সলোমানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবে।

জেমি অনেকক্ষণ বান্দার দিকে তাকিয়ে বলল –আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

–তাহলে? তোমায় বিদায় জানাচ্ছি আমার বন্ধু।

দুজন হাতে হাত রাখল।

-আমাদের আবার দেখা হবে, আমরা একটা সত্যিকারের দুরন্ত অভিযানে অংশ নেব, কেমন?

বান্দা বলল। সে তিনটে হিরে নিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল।

***

জেমি কুড়ি হাজার পাউন্ডের ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠাল তার বাড়িতে, মা-বাবার কাছে উপহার। ভারী সুন্দর গাড়ি কিনল। এবার তাকে ক্লিপড্রিফটের দিকে এগোতে হবে।

প্রতিশোধের ঘণ্টা বেজে গেছে।

***

জেমি ম্যাকগ্রেগর ভ্যানডারের দোকানে ঢুকে পড়েছে। চারদিকে কেমন একটা অদ্ভুত পরিবেশ। ভ্যানডার তাকে দোকানের পেছন দিকে নিয়ে গেল। ভদ্রলোকের মুখে এক হাসির উদ্ভাস।

উনি বললেন মি. ট্রাভিস, স্বাগতম।

–আপনি কী যেন মিঃ... হ্যাঁ, আপনার নামটা আমি ভুলে গেছি।

-ভ্যানডার, আপনি আমাকে সলোমন বলে ডাকতে পারেন। এই ওলন্দাজ নামগুলো মনে রাখা খুব একটা সহজ নয়। মার্গারেট, খাবার কি তৈরি হয়েছে?

জেমি ভেতরের ঘরে চলে গেল। কোনো কিছুই বদলায়নি। মার্গারেট স্টোভের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে ফ্রাইপ্যান। তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না।

-মার্গারেট, ইনি হলেন আমাদের নতুন অতিথি মি. ট্রাভিস।

মার্গারেট বলল–কী খাবার দেব?

না, মার্গারেট আমাকে চিনতে পারেনি।

জেমি মাথা নেড়ে বলল–আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমি খুশি হয়েছি।

খদ্দের এসে গেছে, ভ্যানডার বলল –আমি এক্ষুনি আসছি। এখানে কোনো অসুবিধা হবে না, মি. ট্রাভিস।

সূচিপত্র

উনি দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

মার্গারেটের হাতে সবজির বাটি। টেবিলের ওপর মাংস সাজানো আছে। সে তাড়াতাড়ি রুটি তৈরি করতে লেগে গেল। জেমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। শান্তভাবে মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে আছে। হ্যাঁ, আহা, সে মেয়েটি এখন আরও প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে। কিশোরী থেকে পরিপূর্ণা যুবতী। তার শরীরের সর্বত্র লেগেছে যৌবনের স্পন্দন। যৌনতার উষ্ণ ছোঁয়া।

–আপনার বাবা বলেছেন, আপনি নাকি দারুণ রান্না করতে পারেন?

মার্গারেটের মুখে প্রথম প্রভাতের আলো- না-না, বাবা বানিয়ে বলেছে।

-অনেকদিন আমি ভালো খাবার খাইনি। আমি ভালো খাবার খেতে আগ্রহী।

জেমি মার্গারেটের হাত থেকে একটা ডিশ নিয়ে নিল। টেবিলের ওপর রাখল। তার জন্য। মার্গারেট অবাক হয়ে গেছে। সে বোধহয় ডিশটা হাত থেকে ফেলেই দিচ্ছিল। এর আগে কোনো পুরুষ মেয়েদের কাজে সাহায্য করেনি। তার চোখের তারায় এক অদ্ভুত ভালোবাসার ছাপ। নাকটা একটুখানি ভেঙে গেছে, আর কপালে কাটা দাগ। তাতে কী হয়েছে? লোকটা তো খারাপ নয়। তার চোখের তারা হাল্কা ধূসর। বুদ্ধিদীপ্ত চাউনি। গভীরতা আছে। তার সাদা চুল বলছে, সে হয়তো কমবয়সী নয়। কিন্তু, তার মধ্যে এখনও যৌবনের উন্মাদনা আছে। লোকটা লম্বা এবং সুদেহ, মার্গারেট তাকাল, হ্যাঁ, এভাবে নিরীক্ষণ করা উচিত হয়নি।

ভ্যানডার অত্যন্ত দ্রুত ঘরে ঢুকে পড়েছেন। হাতে হাত রেখে বললেন –আমি দোকানটা বন্ধ করে দিলাম। আসুন, একসঙ্গে রাতের খাবার খাওয়া যাক।

জেমি একপাশে বসে বলল–হ্যাঁ, আমাদের কাজের কথা শুরু হোক।

মার্গারেট সবকিছু শোনার চেষ্টা করছে। হা, বাবার সেই কণ্ঠস্বর। বাবা বকবক করতে শুরু করেছ। বাবা বলছে–এভাবেই একদিন পাপীরা শাস্তি পায়। শেষ পর্যন্ত হয়তো পাপের শেষ হয়ে যায়। বংশ পরম্পরা এমনটি চলে আসছে। .

সলোমন আবার বলতে শুরু করলেন। আপনি কি এখানে প্রথম আসছেন মি. ট্রাভিস?

জেমি বলল–হ্যাঁ, প্রথমবার?

–আপনার শ্রীমতীকে সঙ্গে আনেননি?

-না, আমি এখনও বিয়ে করিনি। আসলে বিয়ে করার মতো কোনো মেয়েকে এখনও পাইনি।

-ক্লিপড্রিফট একটা সুন্দর শহর। এখানে অনেক সুযোগ পাবেন মি. ট্রাভিস।

–আমি তাই তো চাইছি।

জেমি হঠাৎ মার্গারেটের দিকে তাকাল। মার্গারেট আবার লজ্জা পেয়েছে।

-আমি একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রশ্ন করব, মি. ট্রাভিস, আপনি এত টাকা কী করে পেলেন?

মার্গারেট বুঝতে পারছে, এ প্রশ্ন করা উচিত হয়নি। এই অজানা আগন্তুক একটু রেগে গেল কী?

-এটা আমি আমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছি, জেমি শান্তভাবে বলল।

–বাঃ, মনে হচ্ছে, অভিজ্ঞতা আছে আপনার?

–খুবই অল্প। আমি কারোর সাহায্য এবং সহযোগিতা চাইছি।

ভ্যানডারের মুখ আশায় উদ্ভাস–ভাগ্য আমাদের এক জায়গায় নিয়ে এসেছে মি. ট্রাভিস। আমার খুব ভালো ভালো যোগাযোগ আছে। আমি আপনাকে সবরকমভাবে সাহায্য করব। আমি নিশ্চিন্তে বলতে পারি, আপনি যত টাকা লগ্নী করবেন, তিন-চার মাসের মধ্যে তা দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

উনি একটু নীচু হয়ে জেমির হাতে হাত দিলেন। তারপর বললেন আজ থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু হোক।

জেমি হাসল।

–আপনি কোথায় উঠেছেন? গ্র্যান্ড হোটেলে কি?

–হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।

–ওরা গলাকাটা দাম নেয়। তবে আপনার মতো লোক কোথায়-বা থাকবেন?

জেমি বললেন আমি এখানে কিছুদিন থাকব। আর এই শহরটার চারপাশ ঘুরে দেখব। হ্যাঁ, আপনার মেয়ের কি সময় হবে? আমি একজন ভালো গাইড চাইছি।

মার্গারেটের মনে হল তার হৃৎস্পন্দন বুঝি থেমে গেছে।

ভ্যানডার বললেন–আমি জানি না, ও পারবে কিনা।

সলোমন এখানে একটা লৌহ কঠিন নিয়ম চালু করেছেন। তিনি তার মেয়েকে এখনও পর্যন্ত কোনো পুরুষের সঙ্গে একা ছাড়েননি। ট্রাভিসের ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটা আলাদা হতে পারে।

তিনি বললেন –দেখছি, মার্গারেটকে ছুটি দেওয়া যায় কিনা। মার্গারেট, তুই কি যেতে পারবি?

-তুমি রাজী হলে আমি সময় দিতে পারব।

মার্গারেট শান্তভাবে বলল।

–তাহলে ঠিক থাকল, আমি সকাল দশটায় এখানে আসছি। ঠিক আছে?

***

শেষ পর্যন্ত ওই লম্বা সুন্দর পোশাক পরা অতিথিটা চলে গেল। মার্গারেট টেবিল পরিষ্কার করল। সব কিছু ধুয়ে মুছে সাফ করল। এক আচ্ছন্নের মতো অবস্থা হয়েছে তার। লোকটা নিশ্চয়ই ভাবছে আমি একটা বোকা। হ্যাঁ, আমি কোনো কথা বলিনি। কে যেন, আমার জিভের ডগায় আঠা লাগিয়ে দিয়েছে। আঃ, আমি কেন এমন করলাম? এখানে কত মানুষই তো আসে। তারা সবাই আমাকে বোকা ভাবে। কিন্তু ওই লোকটা আমার দিকে যে ভাবে তাকিয়েছিল! কী অন্তর্ভেদী চাউনি। অন্য কেউ তো তেমনভাবে তাকায়নি।

মা থাকলে হয়তো সব কিছু বুঝতে পারত। মা যে কেন মরে গেল। মার্গারেট তার বাবাকে ভালোবাসে। কিন্তু বাবার কাছে জীবন কাটাতে আর পারে না। মনে হয়, সে বুঝি কোনো বন্দিশালার বন্দিনী। কোনো পুরুষের সাথে কথা বলার অনুমতি পাওয়া যায় না। আমি কোনোদিন বিয়ে করব না, মার্গারেট বলেছিল। বাবার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত। এভাবেই আমি বাবার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব।

-শুভরাত্রি বাবা।

ভ্যানডার তার সোনার চশমাটা খুলে রাখলেন। চোখ দুটো ভালো করে রগড়ে নিলেন। মেয়েকে শুভরাত জানালেন।

বেডরুমে ঢুকে মার্গারেট অনেকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর আয়নায় তাকাল। হ্যাঁ, তার মুখখানা খুব একটা খারাপ নয়। সে খুব একটা সুন্দরী নয়। তবে তার মধ্যে একটা সহজাত লাবণ্য আছে। চোখ দুটিতে আছে দ্যুতি। চেহারাটা মোটামুটি ভালো। সে পায়ে পায়ে আয়নার আরও কাছে এগিয়ে এল। হ্যাঁ, ইয়ান ট্রাভিস আমার মধ্যে কী দেখেছিল। সে নিজেকে পোশাক বিযুক্ত করতে চেষ্টা করল। ভাবল, ইয়ান ট্রাভিস বোধহয় এই ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আমার নগ্ন দেহ দেখে তার চোখের তারায় একটা অদ্ভুত কামনাতুর চাউনি ফুটে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত মার্গারেট তার মসলিনের অন্তর্বাস খুলে ফেলল। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়াল। তাঁ, ওই তো, আমার শরীরের সর্বত্র স্পন্দন জেগেছে। হাতগুলো চারদিকে ঘুরছে। নিজেই নিজেকে আদর করতে চেষ্টা করল মার্গারেট। এই তো, আমার স্তনবৃন্ত কেমন দৃঢ় হয়ে উঠছে। এবার হাত নেমে যাচ্ছে যোনি প্রদেশে। এখানে কী আছে? এখানে আছে সাত রাজার ধন এক মানিক। হ্যাঁ, হাত পৌঁছে গেছে দুটি পায়ের মধ্যবর্তী ওই সংকীর্ণ ত্রিভুজ ত্রিকোণে। সেখানে আঘাত করছে, ঘর্ষণ করছে। প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে জোরে। শেষ পর্যন্ত মার্গারেট আত্মরতির জগতে পৌঁছে গেল। তার শরীরের মধ্যে ছোট্ট একটা বিস্ফোরণ। সে ইয়ানের নাম স্মরণ করল। বিছানাতে শুয়ে পড়ল।

জেমির গাড়িটা ভারি সুন্দর। আহা, শহরটা কত পালটে গেছে। এখানে সেখানে কয়েকটা মাত্র তাঁবু চোখে পড়ছে। এখন সবজায়গাতেই নতুন নতুন বাড়ি।

-ক্লিপড্রিফট খুব উন্নত শহর। জেমি বলেছিল।

-আমার মনে হচ্ছে, নবাগতদের কাছে দারুণ আকর্ষণীয়। মার্গারেট জবাব দিল। মনে মনে সে এই শহরটাকে এখনও ঘেন্না করে।

তারা শহরের বাইরে চলে এল। ভাল নদীর তীরে। গত কয়েকদিনের বর্ষা শহরতলীকে সবুজ রঙে সাজিয়েছে। আহা, কত সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটেছে। এখন কী বসন্ত এল! তারা একদল হিরে সংগ্রহকারীকে দেখতে পেল।

জেমি জিজ্ঞাসা করল–এখানে কী কোনো হিরের খনি আছে নাকি?

-হ্যাঁ, কয়েকটা। যখনই নতুন কোনো খবর আসে, হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসে। বেশির ভাগই এই লড়াইতে জিততে পারে না। তারা হতাশ হয়ে যায়।

মার্গারেটের মনে হল, সে বোধহয় এখানে একটা বিপদের গন্ধ পাচ্ছে।

সে বলল–বাবা, এসব কথা শুনলে রেগে যাবে। কিন্তু আমার মনে হয় মি. ট্রাভিস, এটা খুব বাজে ব্যবসা।

-হয়তো কারও কারও জন্য। জেমি বলল, সকলের জন্য নয়।

–এখানে আপনি কতদিন থাকবেন?

–কিছুদিন তো থাকবই।

মার্গারেটের হৃদয় যেন আনন্দে গান গাইছে।

-ঠিক আছে। তারপর সে বলল–বাবা খুবই খুশি হবে।

***

তারা সমস্ত সকালটা ঘুরে বেড়িয়েছে। মাঝে মধ্যে তারা থেমেছিল। জেমি ওইসব লোকেদের সঙ্গে কথা বলেছে। অনেকেই মার্গারেটকে চিনতে পেরেছে। তার সাথে শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভালোবাসার কথা বলেছে। হা, মার্গারেটের মধ্যে একটা উষ্ণতা আছে। মার্গারেট, সহজেই কারও বন্ধু হতে পারে। কিন্তু বাবার আশ্রয়ে থাকার ফলে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো ঢাকা পড়ে গেছে।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে। জেমি বলল–তোমাকে সকলেই চেনে দেখছি।

মার্গারেটের মুখে লাজুক আভা-হা, কারণ ওরা সবাই আমার বাবার সঙ্গে ব্যবসা করে। বাবাই তো বেশির ভাগ অভিযাত্রীদের হাতে জিনিসপত্র তুলে দেয়।

জেমি কোনো কথা বলল না। চারপাশে যেসব দৃশ্য চোখে পড়ছে, সবকিছু ভালোভাবে দেখতে চাইছে। রেলরোড শহরটাকে একেবারে পালটে দিয়েছে। সত্যি এই শহরটাকে আর চেনা যাচ্ছে না।

— এখানে অনেক ব্যবসায়ীর আবির্ভাব ঘটেছে। যেমন ডি পিয়ারস, আর, বারনাটো। দক্ষিণ আফ্রিকার এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে

আমরা খনিজ সম্পদের রত্নভাণ্ডার বলতে পারি। একজন মানুষের মধ্যে যদি দূরদৃষ্টি থাকে, সাহস এবং শক্তি, তাহলে সে রাজা হয়ে উঠতে পারে।

জেমি এবং মার্গারেট এখন ফিরে আসছে। সবে মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। জেমি তার গাড়িটা ভ্যানডারের দোকানের সামনে থামাল। সে বলল- আজ রাতে তুমি আর তোমার বাবা কি আমার হোটেলে আসবে? ডিনারের নিমন্ত্রণ।

মার্গারেট বলল–আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করছি। মনে হয় বাবা রাজি হবে। এই সুন্দর। দিনটা উপহার দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, মি. ট্রাভিস।

তারপর মেয়েটি কোথায় যেন চলে গেল।

***

বিশাল সাজানো ডাইনিংরুম। নতুন এ্যান্ড হোটেল। তিনজন ডিনারের টেবিলে বসে আছে। আরও অনেককে দেখা যাচ্ছে।

ভ্যানডার বললেন আমি জানি না, এখানে খাওয়া-দাওয়া করতে কত খরচ হয়।

জেমি একটা মেনু কার্ডের দিকে তাকিয়েছে–হ্যাঁ, খুবই বেশী দাম।

ভ্যানডার চিৎকার করে উঠলেন–সত্যিই এরা ডাকাত।

জেমি দেখল, ভ্যানডার সব থেকে দামী খাবারের অর্ডার দিয়েছেন। মার্গারেট কিন্তু শুধুমাত্র স্যুপ খেতে চাইল। মার্গারেট খেতে খেতে উত্তেজিত হয়ে উঠছে। সে ভাবতেই পারছে না কীভাবে এই দিনটা তার কাছে এসেছে।

-যা কিছু খাবে, মন দিয়ে খাও। জেমি মার্গারেটকে বলেছিল। আর কিছু নেবে না তুমি?

মার্গারেটের মুখে লজ্জা –অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমার খুব একটা খিদে পায়নি।

ভ্যানডার মেয়ের মুখের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। তারপর বললেন আমার মেয়ে খুব ভালো। এমন মেয়ে আপনি কোথাও পাবেন না মি. ট্রাভিস।

জেমি মাথা নাড়ল- হ্যাঁ, আপনার কথায় আমি সায় দিচ্ছি।

মার্গারেট খুবই খুশি হয়েছে। সে স্যুপটা খেতে পর্যন্ত পারছে না। ইয়ান ট্রাভিস যে তাকে ভালোবেসেছে, এই খবরটা পেয়ে মার্গারেট আনন্দে আত্মহারা। সে তার সমস্ত উন্মাদনাকে লুকিয়ে রেখেছে। মাঝে মধ্যে ইয়ান মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে হাসছে। তার মানে? ভালো লাগা আরও প্রগাঢ় হচ্ছে বোধহয়। যদি ইয়ানের চোখের তারায় বিরক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে, তাহলে মার্গারেট দুঃখ পাচ্ছে।

ভ্যানডার জানতে চাইলেন- আজ কিছু ভালো জিনিস চোখে পড়ল?

জেমি উদাস হয়ে বলল- না, তেমন কিছু চোখে পড়েনি।

ভ্যানডার ঝুঁকে পড়ে বললেন আমার কথাটা খেয়াল রাখবেন, স্যার। এই জায়গাটার অত্যন্ত দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। এখানে টাকা ঢালাটা খুবই বুদ্ধিমানের কাজ। নতুন রেলপথ তৈরি হয়েছে, দেখবেন, কিছু দিনের মধ্যে এই শহরটা দ্বিতীয় কেপটাউন হয়ে উঠেছে।

জেমি বলল– আমি ঠিক জানি না, আমি শুনেছি এরকম শহর নাকি উন্নত হচ্ছে। আমি কোনো ভুতুড়ে শহরে টাকা লগ্নী করব না।

ভ্যানডার বললেন- না, ক্লিপড্রিফটকে আপনি সেই দলভুক্ত করতে পারেন না। এখানে সব সময় হিরে পাওয়া যাচ্ছে। চারপাশে সোনার খনি আছে।

জেমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল কতদিন এই অবস্থা চলবে?

–সেটা আমরা ঠিক বলতে পারছি না। তবে সহজে শেষ হবে না।

–আপনি কি ঠিক বলছেন?

-হ্যাঁ, চট করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। ভ্যানডার বলতে চেষ্টা করলেন, আপনি এই সুযোগটা হারালে আমার খারাপ লাগবে।

জেমি কী যেন চিন্তা করে বলল- হ্যাঁ, আমার একটু তাড়া ছিল মার্গারেট, তুমি কি কাল আবার আমার সঙ্গে খাবে?

ভ্যানডার কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু চুপ করে গেলেন। ব্যাঙ্কারের কথা মনে পড়ে গেল। ব্যাঙ্কার বলেছেন, উনি এখানে এলেন, এক লক্ষ পাউন্ড জমা দিলেন। শান্ত, সলোমন, আরও অনেক টাকা আসছে।

ভ্যানডার বললেন- হ্যাঁ, ও যাবে, কোনো অসুবিধা হবে না।

***

পরের দিন সকালবেলা, মার্গারেট তার রবিবারের পোশাকটা পরেছে। এখনই জেমির সঙ্গে দেখা হবে।

বাবা তাকে দেখে বললেন–কী মনে হচ্ছে বলে তো? এই লোকটা কি তোমার পোশাক দেখে বিগলিত হবে? মনে রেখো, এটা একটা ব্যবসা। তুমি এই পোশাকটা খুলে ফেলল। রোজ যেটা পরে বাসন মাজো, সেটা পরে যেতে হবে।

-কিন্তু বাবা?

–আমি যা বলছি তাই শোনো।

মেয়েটি আর কথা বলতে পারল না। ঠিক আছে, আমি পোশাক পাল্টে ফেলছি। ভ্যানডার মার্গারেটের দিকে তাকালেন। জেমি ইতিমধ্যে গাড়ি চালিয়ে এসে গেছে।

***

জেমি গাড়িটা নিয়ে উল্টোদিকে চলেছে। হ্যাঁ, শহরটা সত্যি বেড়ে যাচ্ছে। সর্বত্র কর্ম উদ্দীপনা চোখে পড়ছে। যদি এভাবে হিরের খনি থেকে হিরে আবিষ্কৃত হতে থাকে, তাহলে সত্যি শহরটা আরও পাল্টে যাবে। এখানে একের পর এক ব্যবসা গড়ে উঠবে। ক্লিপড্রিফটে আরও অনেক ব্যাঙ্ক আসবে। হোটেল, সেলুন, দোকান, বেশ্যালয় সবকিছু। তালিকাটা শেষ হবে না। তাহলে? সুযোগ হাতে আসতেও পারে।

জেমি বুঝতে পারছে, মার্গারেট তার দিকে তাকিয়ে আছে। কী খারাপ লাগছে কিছু?

মাগারেট সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিল। লজ্জায় আবার লাল হয়েছে সে।

জেমি এবার মার্গারেটকে ভালোভাবে দেখছে। হ্যাঁ, এই মেয়েটির মধ্যে একটা আশ্চর্য উজ্জ্বলতা আছে, মাগারেট জানে, সে তাকিয়ে আছে জেমির মুখের দিকে। জেমির পৌরুষ তাকে আকর্ষণ করেছে। এই মেয়েটির অতীত ইতিহাস বলছে, এ কোনো দিন পুরুষ সংসর্গে আসেনি। জেমি ভাবল।

দুপুরবেলা জেমি প্রধান রাস্তায় এল। সেখানে একটা ছোটো ঝরনা আছে। একটা বাওয়াফ গাছ আছে। সে হোটেল থেকে পিকনিক লাঞ্চ প্যাকেট কিনে নিয়েছে।

মার্গারেট একটা টেবিল ক্লথ বিছিয়ে দিল। বাস্কেটটা খুলল। খাবার সাজিয়ে রাখল। আহা, কত সুন্দর সুন্দর খাবার। ফ্রায়েড চিকেন, হলুদ ভাত, জ্যাম আরও কত কী।

এই আমাদের ব্যাঙ্কোয়েট, মার্গারেট বলল। আমি এসবের যোগ্য নই মিঃ ট্রাভিস।

সূচিপত্র

–তুমি আরও অনেক কিছু পাবার যোগ্য। জেমি বলল।

মার্গারেট চলে যাবার চেষ্টা করছিল। জেমি তার মুখখানা দু-হাতের মধ্যে ধরে বলল মার্গারেট, আমার দিকে তাকাও।

-না-না, আমাকে ছেড়ে দিন। ভয়ে লজ্জায়-অপমানে মার্গারেট থরথর করে কাঁপছে।

–তুমি আমার দিকে তাকাও।

এবার মার্গারেট মুখ তুলল। জেমির চোখে চোখ মেলে দিল। জেমি মার্গারেটকে শক্ত করে চেপে ধরেছে, এবার, দুটি ঠোঁট নেমে আসছে। হ্যাঁ, অনেকক্ষণ তারা এইভাবে আলিঙ্গনে আবদ্ধ ছিল।

শেষ অব্দি মার্গারেট নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। মাথা নেড়ে সে বলল না, এটা উচিত নয়, আমরা নরকে চলে যাব।

–না।

–আমার ভয় করছে।

-ভয়ের কিছু নেই। তুমি আমার চোখের দিকে তাকিয়েছ। আমি তোমার মনের ভেতরের সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তুমি কি তা বুঝতে পারছ না। তুমি আমাকে ভালোবাসতে চাইছ, ভালোবাসা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ অবদান। আমিও তোমাকে ভালোবাসব।

তুমি আমার, তুমি কি তা জানো? নাকি জানো না? মাগারেট, তুমি ইয়ানকে সব দিয়ে দিয়েছ। তুমি আবার বলো।

–হ্যাঁ, আমি ইয়ানকে আমার সব দিয়ে দিলাম।

এবার আবার জেমির ঠোঁট নেমে এসেছে। সে মার্গারেটের বডিসের হুক খোলার চেষ্টা করল। একটু বাদে ঘটনা ঘটে গেল। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। বিস্তীর্ণ এই প্রান্তরে নগ্নিকা মার্গারেট। আহা, একটি মেয়ে তার বালিকা অবস্থা থেকে পূর্ণ যুবতীতে রূপাপ্তরিত হচ্ছে। মার্গারেটের মনে হল, সে বোধহয় আর বেঁচে নেই। এই মুহূর্তটাকে আমি চিরদিন মনে রাখব, মার্গারেট চোখ বন্ধ করে ভাবল। এখানে পাতার শয্যা, অসাধারণ বাতাস, কবোঞ্চতার আহ্বান, মার্গারেটের নগ্ন স্তনবৃন্তে হাওয়ার পরশ। বাওয়াফ গাছের ছায়ার তলায় রচিত হয়েছে স্বর্গশয্যা। তারা একে অন্যকে পাগলের মতো ভালোবাসছে। মার্গারেট ভাবল, আমি এই মানুষটিকে খুব বেশি ভালোবাসব। কোনো নারী এখনও পর্যন্ত কোনো পুরুষকে অতখানি ভালোবাসা উপহার দেয়নি।

সময়টা কেটে গেল। তখনও জেমি মার্গারেটকে শক্ত হাতে ধরে আছে। মার্গারেট ভাবছে, যদি এই মুহূর্তটা অনন্ত হত, তা হলে কেমন হত? সে জমির দিকে তাকিয়ে বলল- তুমি কী ভাবছ?

জেমি বলল– আমি অনেক দিন ক্ষুধার্ত, উপোসী এবং তৃষ্ণার্ত।

মার্গারেট হাসল। তারা গাছের ছায়ায় চলে গেল। এখানে কেউ দেখতে পাবে না। তারা শুয়ে রইল, ওই সুর্যদীপ্ত ভূমিখণ্ডের ওপর। মার্গারেটকে জেমি উন্মত্তের মতো আদর

করল। হ্যাঁ, মার্গারেট শেষ পর্যন্ত ভাবল, এই দিনটাকে আমি চিরস্থায়ী এবং চিরস্মরণীয় করে রাখতে চাই।

***

সেদিন সন্ধ্যেবেলা, জেমি এবং ভ্যানডার সানটাউনারের কোণের টেবিলে বসে আছে।

জেমি বলল- আমি যা ভেবেছিলাম, তার থেকেও সম্ভাবনা বেশি।

ভ্যানডারের চোখে আলো। হ্যাঁ, আমি আপনাকে চালাক মানুষ বলেই ভাবি।

আমি কী করব বলুন তো?

ভ্যানডার চারদিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বললেন- আমি আজ একটা ভালো খবর পেয়েছি। পিনেলেতে একটা নতুন হিরের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত দশজন সেখানে গেছে। আমরা ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যে ভাগ করতে পারি। আমি ৫০ হাজার পাউন্ড দিয়ে পাঁচজনের সবকিছু নিয়ে নেব। আপনি যদি ৫০ হাজার পাউন্ড ঢালেন, তাহলে বাকি পাঁচজনের সংগৃহীত হিরে আপনার পকেটে চলে আসবে। ওখানে আরও অনেক হিরে পাওয়া যাবে। আমরা রাতারাতি বড়োলোক হয়ে যাব। আপনি কী চিন্তা করছেন?

আবার সেই পুরোনো খেলা, জেমি বুঝতে পারল। ভ্যানডার সব টাকা নিজের পকেটে রেখে দেবেন, আর আমি পাব কাঁচকলা, না, এবার আর তা হবে না।

ব্যাপারটা ভালোই লাগছে। জেমি বলল, মোট কতজন দাবিদার আছে?

মাত্র দুজন।

–তাহলে এত টাকা লাগছে কেন?

–আহা, এটা ভালো প্রশ্ন। আপনি বুঝছেন না কেন, এটা তো ওরা দাবি করেছে। কিন্তু ওদের হাতে টাকা নেই। তাই তো আমরা এখানে ঢুকে পড়ব। আমরা ওদের হাতে একলক্ষ পাউন্ড দেব। আর তারা ওখানে কাজ করবে।

হ্যাঁ, আমি আবার বুঝতে পারছি, সেই পুরোনো দেওয়া নেওয়ার খেলা। জেমি জানে, এভাবেই এক-একজন হিরে অন্বেষককে আবার চোট করা হবে। সব টাকা ভ্যানডারের পকেটে চলে আসবে।

ভ্যানডার সাবধান করে দিয়ে বললেন- তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে। এই খবরটা ছড়িয়ে পড়লে সর্বনাশ।

-না, এটা আমরা করবই ভ্যানডারের মুখে হাসি–চিন্তা করবেন না। আমি কাজটা শুরু করব। ওই চুক্তিপত্রে সই করতে হবে।

জেমি মনে মনে ভাবল। আফ্রিকান ভাষায়, তাই তো!

–আমার হাতে আরও দু-একটা লোভনীয় ভালো ব্যবসা আছে, ইয়ান।

***

নতুন পার্টনারকে খুশি রাখতে হবে। তাই ভ্যানডার কোনো ভাবেই জেমিকে চটাতে চান না। যখন-তখন মার্গারেটের সাথে জেমি এখানে সেখানে বেরিয়ে পড়ে। দিনে দিনে মার্গারেটের ভালোবাসোর পরিমাণ আরও বাড়ছে। মার্গারেট বিছানায় শুয়ে শুয়ে জেমির কথা চিন্তা করে। চোখ খুললেই জেমির মুখখানা দেখে। জেমি তার জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছে। জীবন যে এত উত্তেজনাপূর্ণ হতে পারে বেচারী মার্গারেট তার খবর রাখত না। হঠাৎ এই শরীরটা নতুনভাবে দেখা দিয়েছে তার কাছে। সবকিছু এক নতুন আঙ্গিক পেয়েছে। এতদিন পর্যন্ত যৌনতা তার কাছে ছিল নরকের অন্ধকার। লুকোনো অভিজ্ঞতা। কিন্তু জেমির সংস্পর্শ তাকে অনেক কিছু বুঝিয়েছে। প্রেমের মতো পবিত্র আবেগ আর অনুভূতি আর কিছু নেই। প্রেম এক নতুন জগৎ। এতদিন পর্যন্ত সে নিষিদ্ধ উপত্যকায় ঘুরে বেড়িয়েছে। আজ মধুর সাগরে ভাসছে।

গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একের পর এক ফাঁকা জায়গা পেয়েছে। সেখানে একে অন্যকে উন্মোচিত করেছে। মার্গারেট অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

না, সেই পুরোনো পাপবোধ আর তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে না। সলোমন ভ্যানডার ডাচ রিফরম চার্চের এক ঘনিষ্ঠ সদস্য। মার্গারেট বাবার কাছ থেকে শুনেছিল, পাপ করলে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। কিন্তু এখন পাপের সংজ্ঞাটা পাল্টে গেছে।

একদিন তারা ভাল নদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। মার্গারেট বলল-ইয়ান, তুমি কি জানো, আমি তোমাকে কত ভালবাসি? তুমি কি বিয়ের কথা ভেবেছ?

জেমি হেসে বলল- মার্গারেট, আমি এ ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এবার দুজনে একই সঙ্গে হেসে উঠল। মার্গারেটের জীবনে সবথেকে সুখী মুহূর্ত এসে গেছে।

***

রবিবার সকালবেলা সলোমন জেমিকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছেন। তিনি জেমি আর মার্গারেটের সঙ্গে চার্চে যাবেন। একটা বিরাট বাড়িতে এই চার্চটা অবস্থিত। তারা সেখানে ঢুকে পড়ল। সেখানকার প্রধান যাজক ভ্যানডারকে অভিবাদন জানালেন।

–আমি এই চার্চটা তৈরি করতে সাহায্য করেছি। আমি এখানকার সম্মানীয় সদস্য।

ভ্যানডার জেমিকে গর্বিত হয়ে বললেন।

এবার ধর্মানুষ্ঠান শুরু হল। ভ্যানডার সেখানে বসে থাকলেন। প্রতি শব্দ উচ্চারণ করছেন।

জেমি ভাবল, শুধু রবিবার এই ভদ্রলোক ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসেন। বাকি দুদিন শয়তানের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব।

ভ্যানডারের দুপাশে দুজন বসে আছে, একদিকে মাগারেট, অন্যদিকে জেমি। মার্গারেট কিন্তু এক দৃষ্টিতে জেমির দিকে তাকিয়ে আছে, মাঝে মধ্যে হেসে উঠছে। আহা, মহান ধর্মযাজক কি জানেন, আমি কী বিষয়ে চিন্তা করছি?

***

সেই সন্ধ্যাবেলা মার্গারেট আর জেমি সানটাউনার সেলুনে গেল। স্মিথকে দেখা গেল, ড্রিঙ্ক দিচ্ছে। তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

–শুভ সন্ধ্যা, মিঃ ট্রাভিস, কী দেব? যা খান তাই তো?

না, স্মিথ, আজ আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি, তুমি কি একবার ভেতরের ঘরে যাবে?

–অবশ্যই যাব, স্যার। সে তার সহকারীর হাতে সবকিছু দায়িত্ব দিয়ে ভেতরে চলে গেল।

এটা এখন আর বন্ধ নয়, এখানে এখনও কিছু নিরাপত্তা আছে। একটা গোলটেবিল আছে, চারটে চেয়ার, টেবিলের ওপর একটা লণ্ঠন। স্মিথ আলো জ্বেলে দিল।

বসো।

স্মিথ চেয়ারে বসে বলল- হ্যাঁ, স্যার। কীভাবে সাহায্য করব?

–আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাইছি, স্মিথ।

–সত্যি?

–হা, সিগার থেকে ধোঁয়া ছেড়ে জেমি বলল- আমি তোমাকে বাঁচতে দেব না।

একটা অদ্ভুত ভয়ের চিহ্ন স্মিথের চোখে আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না মিঃ ট্রাভিস।

ট্রাভিস নয়, আমার নাম ম্যাকগ্রেগর। জেমি ম্যাকগ্রেগর। আমাকে মনে আছে? এক বছর আগে তুমি আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলে? ভ্যানডারের নির্দেশ মতো। ওই পরিত্যক্ত ওয়্যার হাউসে।

স্মিথ এবার কাঁপতে শুরু করেছে। সে বলল- আমি ভুলে গেছি।

–চুপ করো এবং আমার কথা শোনো। জেমির কণ্ঠস্বরে আগুন ঝরছে।

জেমি বুঝতে পারল, স্মিথ এখন ভয়ে কাঁপছে। তার মুখে একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি। একবছর আগের চেহারার সাথে এই সাদা চুলের মানুষটার সদৃশতা আনার চেষ্টা করছে।

-দেখো আমি বেঁচে আছি, আমি অনেক বড়োলোক। আমার হাতে এত টাকা আছে। যে, তোমার এই সেলুনটা পুড়িয়ে ফেলতে পারি। তোমার সাথে আমার শেষ বোঝাঁপড়াটা বাকি আছে।

স্মিথ অবাক হবার ভান করছিল। কিন্তু জেমি ম্যাকগ্রেগরের চোখের দিকে তাকিয়ে তার ভয় আকাশ ছুঁয়ে গেল। সে শান্তভাবে বলল- ইয়েস, স্যার।

–ভ্যানডার, তোমাকে অনেক টাকা দেয় যাতে ওই লোকগুলোকে প্রতারিত করা যেতে পারে। তাই তো? তোমাদের মধ্যে একটা গোপন চুক্তি আছে, তাই না? এক-একটা কাজের জন্য ও তোমাকে কত টাকা করে দেয়?

কিছুক্ষণের নীরবতা। স্মিথ বুঝতে পারছে না, এখন তার কী করা উচিত? কোন দিকে। সে ঝাঁপ দেবে?

জেমি চিৎকার করে বলল কত দেয়?

দু-শতাংশ।

–আমি তোমাকে পাঁচ শতাংশ দেব। তুমি এখন আমার হয়ে কাজ করবে। এখানে কোনো লোক এলেই তাকে পাকড়ে আমার কাছে নিয়ে যাবে। আমি টাকা দেব। তবে একটা তফাত, আমি কিন্তু ওই বুড়ো ভামের মতো লোকটাকে ঠকাব না। তার প্রাপ্য আমি মিটিয়ে দেব। তুমি যদি মনে করো, এখনও দু-শতাংশ নিয়ে ভ্যানডারের হয়ে কাজ করবে, তা হলে তোমাকে একটা গবেট বলতে হবে। আশা করি আমার কথা বুঝতে পারছ।

স্মিথ আমতা আমতা করে বলতে থাকে- হ্যাঁ, স্যার। মিঃ ট্রাভিস– মিঃ ম্যাকগ্রেগর আমি বুঝতে পারছি।

জেমি উঠে দাঁড়াল। বলল- না, এখনও পুরোটা বুঝতে পারোনি। সে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল- ভ্যানডারের কাছে গিয়ে আমাদের এই ছোট্ট কথাবার্তা জানিয়ে দাও। তাহলে তুমি দু-দিক থেকে টাকা পাবে। তাই তো? কিন্তু একটাই সমস্যা হবে স্মিথ...

কথাটা এখন ফিসফিসানিতে পরিণত হয়েছে তাহলে তুমি আর বেঁচে থাকার ছাড়পত্র পাবে না, বুঝলে তো?

.

০৭.

জেমি তখন পোশাক পরছিল। হঠাৎ দরজাতে ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দ। সে শুনল, শব্দটা আবার হচ্ছে। সে দরজার কাছে গিয়ে খুলে দিল মার্গারেট দাঁড়িয়ে আছে।

–ভেতরে এসো ম্যাগি, জেমি বলল। কিছু হয়েছে কি? এই প্রথম ম্যাগি তার হোটেল ঘরে এল।

সে ভেতরে ঢুকল, মুখোমুখি দাঁড়াল। কথা বলতে পারছে না। গতকাল সারারাত সে জেগে কাটিয়েছে। কীভাবে এই খবরটা দেবে। হয়তো এই খবর শুনে লোকটা আমাকে ফেলে পালিয়ে যাবে।

সে কোনোরকমে বলল- ইয়ান, আমি তোমার সন্তানের মা হতে চলেছি।

মার্গারেটের মুখে একটা ভয়ার্ত চাউনি। মনে হচ্ছে সে বোধহয় হারিয়ে যাবে।

হঠাৎ জেমির মনোভাব পাল্টে গেল। সে এগিয়ে এল। মাগারেটের ছোট্ট শরীরটা আকাশের দিকে তুলে দিয়ে, পরক্ষণে তাকে লুফে নিয়ে বলল- খবরটা দারুণ, ম্যাগি। তুমি কি তোমার বাবাকে বলেছ?

মার্গারেট বলল- না, এখনও বলিনি। সে সোফাতে গিয়ে বসে পড়ল। তুমি আমার বাবাকে চেনো না। বাবা কিছুই বুঝতে চাইবে না।

জেমি বলল- না-না, এসো, আমরা একসঙ্গে খবরটা দেব।

–তুমি বলবে তো?

–হ্যাঁ, আমি একথা তোমার বাবাকে জানাব।

***

ভ্যানডার আর একটা লোককে পাকড়াবার চেষ্টা করছিলেন। জেমি এবং মার্গারেট তার দোকানে গিয়ে পৌঁছোল।

তিনি কথা বলা শেষ করলেন– আমি আসছি।

জেমি বলল- একটা খবর দিচ্ছি। খবরটা শুনে আপনার ভালো লাগবে না। ম্যাগির পেটে বাচ্চা এসেছে।

বাতাসের ভেতর শনশনে নীরবতা। ভ্যানডার বললেন- আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ব্যাপারটা খুবই সহজ। আমি তাকে গর্ভবতী করেছি।

ভ্যানডারের মুখের রং পাল্টে গেছে। তিনি বিড়বিড় করে বললেন– ঘটনাটা কি সত্যি?

সলোমনের মাথায় নানা রকম চিন্তা–হ্যাঁ, হারিয়ে গেল, আমার প্রিয় কন্যার কুমারীত্ব? সে গর্ভবতী? শহরের সকলে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। কিন্তু ইভান ট্রাভিস খুব বড়োলোক। তার বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব হবে না। যদি ওরা তাড়াতাড়ি বিয়ে করে...

ভ্যানডার জেমির দিকে তাকিয়ে বললেন- আপনি তাড়াতাড়ি বিয়ে করবেন তো?

জেমি অবাক হল বিয়ে? তুমি তোমার মেয়ে ম্যাগিকে এমন একটা লোকের সাথে বিয়ে দিতে চাইছ, যাকে এক বছর আগে ঠকিয়েছিলে?

ভ্যানডারের মাথা ঘুরছে আপনি কী বলছেন ইয়ান, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমার নাম ইয়ান নয়, জেমি বলল, আমার নাম জেমি ম্যাকগ্রেগর। তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না?

ভ্যানডারের মুখে একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি না, সে লোকটা তো মরে গেছে।

–তুমি তাকে মেরে ফেলেছ, তাই তো? কিন্তু ভ্যানডার, আমি এখনও বেঁচে আছি। আমি তোমাকে এটা উপহার দিলাম। আমার বীজ তোমার মেয়ের পেটে বড়ো হবে।

জেমি বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। দুজনে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

মার্গারেটের মনে হল, পৃথিবী বোধহয় ফাঁক হয়ে যাবে। না আমি সত্যি সত্যি ওকে ভালোবেসেছিলাম।

সলোমন তার মেয়ের দিকে তাকালেন। অসম্ভব রাগে কাঁপছেন। বলছেন– তুই কুত্তি, বেশ্যা। তারপর বললেন, যা বেশ্যা, এখান থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে যা।

মার্গারেট থরথর করে কাঁপছে। এক্ষুনি যে ঘটনাটা ঘটে গেল, তার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। ইয়ান তাকে এত ভালোবাসে? জেমি ম্যাকগ্রেগর কে?

চলে যা, ভ্যানডার তার মেয়েকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন। আমি তোর মুখ দেখতে চাইছি না।

মার্গারেট সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। তার হৃদয় ভেঙে গেছে। সে নিঃশ্বাস নেবার জন্য চেষ্টা করছে। তার মুখটা দেখে মনে হচ্ছে, সে বুঝি আর পারছে না। সে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। পেছন দিকে তাকাল না।

***

ভ্যানডার মেয়েকে চলে যেতে দেখলেন। তারপর হতাশ হয়ে ভেঙে পড়লেন। না, জীবনটা বোধহয় পাল্টে গেল। সকলের কাছে ব্যাপারটা রাষ্ট্র হবে। এখন কী হবে? হায় ঈশ্বর, ভ্যানডার ভাবলেন, তার চোখে মেয়ের নগ্ন দেহটা ফুটে উঠল। একজনের সাথে

সঙ্গম করছে। জন্তুর মতো। ইস, ভাবতেই পারা যাচ্ছে না। কিন্তু তখনই হঠাৎ তার দণ্ডটা উত্থিত হল।

তিনি বুকের ওপর ক্রুশ চিহ্ন আঁকলেন। দরজার সামনে চলে এলেন। না, আর নড়তে পারছেন না। সত্যি, এখন আর পথে বেরোবেন কী করে? সকলেই তাঁর দিকে আঙুল তুলে তাকাবে। এটা অসহনীয়। হায় ঈশ্বর, তুমি এ কী করলে? আমি সারা জীবন তোমার সেবা করেছি। তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করলে, ঈশ্বর? ওকে মরতে দাও, আমার মেয়েকে, আমাকেও মেরে ফেলো।

***

সানটাউনার সেলুনে অনেক মানুষের ভিড়। জেমি ঢুকল। সে বারের এককোণে চলে গেল। বলল- আপনারা অনুগ্রহ করে শুনবেন। আজ আমি সকলকে মদ খাওয়াব।

স্মিথ হাসল– কেন?

জেমি হেসে বলল- বন্ধু, সলোমনের অবিবাহিতা মেয়ে গর্ভবতী। এই ঘটনা ঘটানোর জন্য আমি গর্বিত। তাই আজ আনন্দ করব।

স্মিথ বলল- হায় যিশু।

–এর সাথে যিশুর কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু আছে জেমি ম্যাকগ্রেগর।

***

এক ঘণ্টার মধ্যে ক্লিপড্রিফটের সর্বত্র খবরটা ছড়িয়ে গেছে। ইয়ান ট্রাভিস আসলে জেমি ম্যাকগ্রেগর। কীভাবে সে ভ্যানডারের মেয়েকে গর্ভবতী করেছে।

ফিসফিসানি কানাকানি গুজব চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

বেশির ভাগ লোকই হাসাহাসি করতে শুরু করেছে।

***

ভ্যানডার বিকেলবেলা দোকান থেকে বেরোলেন। যে ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটেছে তার জন্য তিনি প্রস্তুত নন। তিনি মার্গারেটকে পরবর্তী কোচে কেপটাউনে পাঠিয়ে দেবেন। সেখানে হয়তো ওই জারজটার জন্ম হবে। কিন্তু ক্লিপড্রিফটের কেউ খবরটা জানতে পারবে না।

ভ্যানডার বাইরে এসে দাঁড়ালেন। রাস্তা দিয়ে হাঁটলেন। হ্যাঁ, একজনকে দেখা গেল শুভ বিকেল, ভ্যানডার, কী হল? নাতির জন্য জামাকাপড় বুঝি?

-শুভদিন সলোমন, আমি কি আপনাকে সাহায্য করব? নাকি নাতিবাবু সব করবে?

–হ্যালো সলোমন, আমি শুনলাম, আপনার মেয়ে নাকি মা হতে চলেছে?

ভ্যানডার চারদিকে তাকালেন, দোকান বন্ধ করে দিলেন। সেখানে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন।

***

সানটাউনার সেলুন, জেমি হুইস্কি খাচ্ছে। চারদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। ক্লিপ ড্রিফটের সব থেকে বড়ো কেলেঙ্কারী আর কেচ্ছা। আহা, শহরটা টগবগ করে ফুটছে। জেমি ভাবল, বান্দা থাকলে কত ভালোই না হত। হ্যাঁ, এভাবেই সলোমনের বিরুদ্ধে আমার প্রতিশোধ নেওয়া শুরু হল। বান্দার বোনের ওপর যা অত্যাচার উনি করেছেন, এভাবেই শাস্তি দিতে হবে। এটা তো সবেমাত্র শুরু। এখনও অনেক কাজ বাকি আছে। ভ্যানডারকে আমি শেষ করে দেব। মার্গারেটের জন্য তার কোনো সহানুভূতি নেই। হ্যাঁ, সেও এই খেলার একটা অংশ। প্রথমদিন বলেছিল, আমার বাবা, আপনাকে সাহায্য করবেন। বাবা সব কিছু জানেন। তার মানে? এই মেয়েটিকেও ধ্বংস করতে হবে।

স্মিথ জেমির কাছে গিয়ে বলল– আপনার সঙ্গে এক মুহূর্ত কথা বলব, মিঃ ম্যাকগ্রেগর?

কী?

দুজন অভিযাত্রী আসছে। তারা পিনিয়ানের কাছে দশটা হিরের সন্ধান পেয়েছে। তাদের হাতে পয়সা নেই। জিনিসপত্র কিনতে পারছে না। তারা একজন অংশীদারকে চাইছে। আপনি কি রাজী হবেন?

জেমি বলল- ঠিক আছে, এই লোকগুলোর ব্যাপারে ভ্যানডারের সাথে কথা বলোনি

স্মিথ বলল- না স্যার। আমি আপনার প্রস্তাব নিয়ে ভেবে দেখেছি। আমি আপনার সঙ্গে ব্যবসা করব।

জেমি সিগার ধরিয়ে লম্বা টান দিয়ে বলল আচ্ছা, কথা চালিয়ে যাও।

***

প্রথম দিকে ক্লিপট্রিফটে বেশ্যাবৃত্তির খুব একটা চল ছিল না। এলোমেলোভাবে এই ব্যবসাটা চালানো হত। কালো মেয়েরাই লাইনে দাঁড়াত। রাস্তার ধারে টিনের শেডের মধ্যে এক-একটা গণিকালয়। পরে সাদা চেহারার বারাঙ্গনাদের আবির্ভাব ঘটল। তারা হল বারমেড। যখন হিরের খনির সন্ধানে আরও বেশি লোক আসতে শুরু করল, শহরটা বেড়ে গেল চারদিকে, আরও বেশি সাদা বেশ্যাদের দেখা গেল।

এখন ক্লিপড্রিফট শহরের এখানে সেখানে গোটা ছয়েক বেশ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। কাঠের বাড়ির ওপর টিনের ছাদ দেওয়া। মাদাম অ্যাগনেস কিন্তু একটা ভারী সুন্দর গণিকালয় স্থাপন করেছেন, ব্রিস্টিটের ওপর, দোতলা বাড়ির মধ্যে, লুপস্ট্রিটের পাশে। এখানে ভালো মেয়েদের আনা হয়। পয়সাও বেশি লাগে। আনন্দ পাওয়া যায় অনেক। মেয়েদের বয়স কম। বেশির ভাগই ছলাকলায় অভ্যস্তা। পয়সাটা পুরো উসুল হয়ে আসে। সুন্দর সাজানো ড্রয়িং রুমে বসে মাল খাওয়া যায়। মাদাম অ্যাগনেস সবসময় সকলের ওপর নজর রাখেন। তিনি নিজেও এক অত্যন্ত সুন্দরী মহিলা। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, ভালো স্বাস্থ্য, মাথায় লাল চুল। তিনি লন্ডনের একটা গণিকালয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে সহজে টাকা পাওয়া যায়, সেই গল্প শুনে ছুটে এসেছেন। শেষ অব্দি নিজেই একটা ব্যবসা স্থাপন করেছেন। শুরু থেকেই ব্যবসাটা ফুলে ফেঁপে বড়ো হয়ে গেছে।

মাদাম অ্যাগনেস মানুষকে বুঝতে পারেন, কিন্তু জেমি ম্যাকগ্রেগরকে তিনি কিছুতেই– চিনতে পারছেন না। জেমি এখানে প্রায়ই আসে। হৈ-হৈ করে টাকা খরচ করে। মেয়েদের কাছে তার একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। কিন্তু জেমিকে দেখে মনে হয়, সে সর্বদা উদাসীন, তাকে সহজে ধরাছোঁয়া যায় না। তার চোখের ভেতর এমন একটা আকর্ষণ আছে, যা অ্যাগনেসকে অবাক করে দেয়। চোখের ছায়া ধূসর, ঠাণ্ডা এবং দিশাহীন। অন্যান্য পুরুষদের মতো সে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। এমন কী ফেলে আসা দিনযাপনের গল্পকথা কখনও বলেনি। জেমি সম্পর্কে কিছু কথা মাদাম ইতিমধ্যেই শুনেছেন। এই ছেলেটি নাকি সলোমনের মেয়েকে ধর্ষণ করে, মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে, কিন্তু সে ওকে বিয়ে করতে চায়নি। বেজন্মার জাত আর কী! মাদাম অ্যাগনেস ভাবলেন, কিন্তু তার মধ্যে একটা আলাদা আকর্ষণ আছে।

জেমি লাল কার্পেটে ঢাকা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। বলল– শুভরাত, এবং চলে গেল।

***

জেমি তার হোটেলে ফিরে এসেছে। মার্গারেট ঘরে বসেছিল। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। সে জেমির দিকে তাকিয়ে বলল- হ্যালো জেমি।

-তুমি এখানে কী করছ?

–তোমার সঙ্গে কথা আছে।

–তোমার সঙ্গে আমার কোনো কথা নেই।

-আমি জানি, তুমি কেন এটা করেছ। তুমি আমার বাবাকে ঘেন্না করো, তাই তো? কিন্তু আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। আমাকে বিশ্বাস করো। আমাকে ঘেন্না করো না। আমি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি।

জেমি বলল- এটা তোমার সমস্যা, আমার নয়।

–এভাবে আমার দিকে তাকিও না। তুমিও তো আমাকে ভালোবাসো, নাকি?

জেমি কিছুই শুনছে না। আবার সেই মারাত্মক ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। সে প্রায় মরেই গিয়েছিল। শেষ অব্দি অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে। হিরের খনির সন্ধান পেয়েছে। ভ্যানডার তার সবথেকে বড়ো শত্রু। ভ্যানডারের কণ্ঠস্বর তার মনে পড়ল তুমি আমার হয়ে কাজ করবে, আমি তোমাকে সাহায্য দেব। না, শকুনগুলো আবার আর্তনাদ করতে শুরু করেছে... মাংসগুলো খাবলে খাবলে খাচ্ছে।

অনেক দূর থেকে সে বোধহয় মার্গারেটের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল তোমার কি মনে পড়ছে না, আমি তোমাকে ভীষণভীষণ ভালোবাসি?

না, মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে লাভ নেই। ভালোবাসা? এই শব্দটার আসল অর্থ জেমি কোনো দিন জানতে পারবে না। ভ্যানডার তার সমস্ত আবেগকে হত্যা করেছে। একটাই শব্দ শুধু দগদগে ঘায়ের মতো বেঁচে আছে– ঘৃণা। সে ঘৃণার মধ্যেই থাকবে। এটাই তার জীবনের নির্যাস। এই ব্যাপারটাই তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। ঘৃণাকে ভর করে সে হাঙরদের সাথে লড়াইতে জয়যুক্ত হয়েছে। খাড়াই পাহাড়ের পথ ডিঙিয়ে হিরের খনিতে পৌঁছেছে।

তারপর? নামিব মরুভূমির বুকে বিজয় অভিযানের নায়ক হয়েছে। কবিরা সব সময় ভালোবাসার কথা বলে থাকেন। সংগীতকাররা এ বিষয়ে গান লেখেন। কিন্তু এটা বোধহয় পৃথিবীতে নেই, যা আছে তাকে শুধুমাত্র ঘৃণা বলা যেতে পারে।

–তুমি ভ্যানডারের কন্যা, তুমি তার নাতিকে পেটে বহন করছ। এখান থেকে বেরিয়ে যাও!

***

– মার্গারেটের যাবার কোনো জায়গা নেই। বাবাকে সে ভালোবাসে। বাবা ক্ষমা না করলে সে কোথায় যাবে? কিন্তু সে জানে, বাবা তাকে ক্ষমা করবে না। বাবা তার জীবনটাকে নরক করে ছাড়বে, তাকে কোথাও যেতে হবে।

মার্গারেট হোটেল থেকে বেরিয়ে বাবার দোকানের দিকে এগিয়ে গেল। সে বুঝতে পারল, সকলে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ কেউ ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসছে। সে মাথাটা উঁচু করে হাঁটতে থাকল। দোকানে পৌঁছে একটু ভাবল। ভেতরে ঢুকল। দোকান একেবারে ফাঁকা।

বাবা বেরিয়ে এলেন- তুমি? কণ্ঠস্বরে অপমান এবং ঘৃণা ঝরে পড়ছে। বাবার মুখে হুইস্কির গন্ধ। তুমি এই শহর থেকে অন্যত্র চলে যাও। এখানে আর কখনও এসো না। আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?

কিছু খুচরো পয়সা মেয়ের হাতে ছুঁড়ে দিয়ে উনি বললেন- এগুলো নিয়ে চলে যাও।

–আমার পেটে তোমার নাতি।

–তুমি শয়তানের ছেলেকে বহন করছ। উনি আরও কাছে এগিয়ে এলেন। হাতটা মুঠো বন্দি করলেন- তোমার দিকে সকলে তাকিয়ে কী বলে জানো? তোমায় বাজারের বেশ্যা কুত্তি বলে। তোমার কথা ভাবলে লজ্জায় আমার মাথা হেট হয়ে যায়। তুমি শেষ হয়ে গেছো।

মেয়েটি তাকাল, অনেকক্ষণ ধরে। তারপর দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

–বেশ্যা, তোর টাকাটা নিয়ে যা, কুত্তি!

***

শহরের উপকণ্ঠে অল্প দামের হোটেল আছে। মার্গারেট সেখানে ঢুকে পড়ল। তার মনের আকাশে ঝড় উঠেছে। সে মিসেস আওনসের দিকে তাকাল। বাড়িউলি।

মিসেস আওনসের বয়স বছর পঞ্চাশ, স্বামীর সঙ্গে এক দিন ক্লিপড্রিফটে এসেছিলেন। স্বামী তাকে ফেলে পালিয়ে গেছেন। এমন এক মহিলা, হয়তো মরে যেত। কিন্তু মিসেস আওনসের স্বভাব ছিল একেবারে অন্যরকম। তিনি দেখলেন, অনেক মানুষ এখানে ভিড় করেছে। দালাল, ফোড়ে, উটকো ব্যবসাদার আরও কত জন। কিন্তু সতেরো বছরের একটি মেয়ে? এখন কী হবে?

–তুমি এখানে কেন এসেছ?

–একটা কাজ পাওয়া যাবে?

কী কাজ?

–আমি ভালো রান্না করতে পারি। খাবার দাবার সরবরাহ করতে পারি। আমি ঘর মুছতে পারি, ঝাঁট দিতে পারি। যে কোনো একটা কাজ।

মিসেস আওনস থরথরিয়ে কাঁপতে থাকা ওই মেয়েটির দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, আমার মনে হচ্ছে, তোমাকে হয়তো কাজে লাগবে। তুমি কত দিয়ে শুরু করবে?

মার্গারেটের মুখে হাসি।, আপনি যা দেবেন।

এবার মিসেস আওনস বললেন- তোমাকে আমি এক পাউন্ড দু শিলিং এগারো পেন্স করে দেব। প্রতি মাসে। খাওয়া-থাকায় পয়সা লাগবে না।

মার্গারেট শান্তভাবে বলল- তা হলেই হবে।

***

ভ্যানডারকে এখন আর ক্লিপ ড্রিফটের রাস্তাঘাটে বিশেষ দেখা যায় না। মাঝে মধ্যেই দোকানটা বন্ধ থাকে। এখন খদ্দেররা অন্য জায়গায় যেতে শুরু করেছে।

কিন্তু ভ্যানডার প্রতি রবিবার চার্চে যান। তিনি এখন আর প্রার্থনা করেন না। তিনি ভগবানের কাছ থেকে কৈফিয়ত তলব করেন। এখন অনেকখানি পাল্টে গেছেন। অর্থ আর তার চারদিকে প্রাচীর তুলতে পারছে না। তিনি বুঝতে পারছেন, সকলেই আড়ালে আবডালে তাকে নিয়ে রসালো আলোচনা করছে। কোথা থেকে কী যেন হয়ে গেল। শেষ অব্দি কী হবে, ভ্যানডার তার জবাব জানেন না।

আবার তিনি ভাবলেন, এই চার্চে এসে কী লাভ?

একদিন চার্চে বাজে বাজে কথা শুনতে হল তাকে। তিনি সেই থেকে চার্চে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন!

ব্যবসার হাল ক্রমশ খারাপ হয়েছে। পাশাপাশি জেমি ম্যাকগ্রেগরের ব্যবসা হু-হু করে বাড়ছে। একটির পর একটি সোনার খনির খবর আসছে। জেমি ম্যাকগ্রেগর সবকিছু পাগলের মতো কিনে নিচ্ছে। একইরকম পদ্ধতিতে সে টাকা লগ্নী করছে। কিন্তু সে কখনও তার অংশীদারদের ঠকায়নি। এর পাশাপাশি সে সম্পত্তির ব্যবসায় নেমে পড়ল। সোনা কম দামে

আবার তিনি তার জবাব জাকেরছে। কোতে পারছেন পাল্টে গেছে কিনে বেশি দামে বেচতে লাগল। ব্যবসার ব্যাপারে তার সততা আকাশছোঁয়া। ধীরে ধীরে তার সুনাম চারদিকে বাড়তে লাগল। আরও বেশি লোক তার সঙ্গে হাত বাড়াতে উদগ্রীব।

শহরে দুটো ব্যাংক ছিল। একটা ব্যাংকের অবস্থা খারাপ হল। ব্যাংকটা কিনে নিল। নিজের লোকজনকে চারদিকে বসাল। নিজেকে লেনদেনের মধ্যে জড়াল না।

সবকিছুই এখন এগিয়ে চলেছে তরতর করে। ছোটোবেলায় যে স্বপ্ন সে দেখেছিল, সেই স্বপ্নটা সফল হয়ে গেছে। সে ভ্যানডারের বিফলতার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এখনও অবশ্য পুরোপুরি প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি।

মাঝে মধ্যে জেমি মার্গারেটের দেখা পায়, কিন্তু মার্গারেটকে দেখে সে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।

জেমি জানে না। মার্গারেটের সঙ্গে কী ধরনের ব্যবহার করা উচিত। মার্গারেটকে দেখে বুঝতে পারা যায়, সে একেবারে ভেঙে পড়েছে। কিন্তু মার্গারেট এখনও তাকে ভালোবাসে এ বিষয়ে জেমির কোনো সন্দেহ নেই। কোনো কিছুই মার্গারেটকে পরিবর্তিত করতে পারল না। বাবাকে শাস্তি দিতে গিয়ে সে বোধহয় মেয়েটিকেও শাস্তি দিয়ে ফেলল। হ্যাঁ, মার্গারেট একটা দুদিকে ধারালো তরবারির মতো। তার গর্ভে জেমির সন্তান। যখন জেমি এই সন্তানকে দেখবে, তখন কী করবে? তখন হয়তো মার্গারেটকে বিয়ে করতে বাধ্য হবে। মার্গারেট একদিন কি শ্রীমতী জেমি ম্যাকগ্রেগর হিসেবে পরিচিত হবে? এসব নেহাতই কষ্টকল্পনা।

***

একরাতে শুতে যাবার আগে মার্গারেট ভাবল, এই সন্তানকে নিয়ে কী করা যায়? না, এটা কি এক পুত্র সন্তান হবে? সবাই তো ছেলেই চায়!

ক্রমশ পেটটা বাড়তে থাকল। মার্গারেট আরও ভয় পেয়ে গেল। কারও সঙ্গে কথা বলতে হবে। কিন্তু শহরের কোনো মহিলা তার সঙ্গে কথা বলবে না। ওদের ধর্মে কুমারি মাকে শাস্তি দেওয়া হয়। সে একা, চারপাশে অজ্ঞাত আততায়ীদের ভিড়। সমস্ত রাত ধরে সে কাঁদল। নিজের এবং অজাতক ওই শিশুটির জন্য।

***

জেমি ম্যাকগ্রেগর শহরের মাঝখানে দোতলা বাড়ি কিনেছে। এটাই তার ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র। একদিন জেমির প্রধান অ্যাকাউনট্যান্ট হারি ম্যাকমিলান তার সাথে কথা বলতে এল।

–আমরা অনেকগুলো কোম্পানিকে একসঙ্গে জুড়ে দেব। তার একটা সুন্দর নাম দিতে হবে। কী নাম দেওয়া যায় বলুন তো?

আমি ভাবব।

জেমি ভাবতে থাকল। অনেক আগে শোনা কতগুলো শব্দ তার মনে পড়ে গেল। যখন সে নামিব মরুভূমিতে মরতে বসেছিল। একটা নাম দিতে হবে। সে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকাউনট্যান্টকে ডেকে পাঠাল, বলল– আমরা নতুন কোম্পানির নাম দেব, ক্রুগার ব্রেন্ট ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেড, কেমন?

***

অ্যালভিন কুরি, জেমির ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, একদিন দেখা করতে এলেন। তিনি বললেন আমি মিঃ ভ্যানডারের ঋণের কথা শুনেছি। তার অবস্থা খুবই খারাপ। তার এই ঋণ কী করে শোধ হবে?

-না।

কুরি অবাক হয়ে বললেন তিনি আজ সকালে আরও কিছু টাকা ধার চাইতে এসেছিলেন।

সবকিছু দেবেন, কিছু ইতস্তত করবেন না।

ম্যানেজার অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন– মিঃ ম্যাকগ্রেগর, আপনি কী বলছেন?

আমায় কিছু বলবেন না, সবসময় টাকা ধার দিতে থাকবেন।

***

প্রত্যেক দিন সকালবেলা পাঁচটার সময় মার্গারেটের ঘুম ভাঙত। তাকে অনেক কাজ করতে হত। একা হাতে ব্রেকফাস্ট তৈরি করা, সবকিছু বানানো। এখানে যারা থাকে, তারা সকলেই হিরের সন্ধানে চলেছে। তাদের অনেকে এই ব্যাপারে জিতেছে, কেউ কেউ জিততে পারেনি।

ক্লিপড্রিফটে একটা অলিখিত নিয়ম আছে তা হল, সুন্দরী মহিলাদের কখনও ধর্ষণ করা যাবে না, যদি কোনো পুরুষের মনে যৌনেচ্ছা জেগে ওঠে, তাহলে তাকে অবশ্যম্ভাবী

ভাবে এক বেশ্যার কাছে যেতে হবে। মার্গারেট অবশ্য এ ব্যাপারে একটা বিস্ময়। কারণ তাকে কোন দলভুক্ত করা হবে, কেউ তা বলতে পারছে না। সুন্দরী মেয়েরা তো এভাবে গর্ভবতী হয়ে পড়ে না। মার্গারেট একবার ধর্ষিতা হয়েছে, তাই সকলের সঙ্গে বিছানাতে শুতে আগ্রহী, এমন কথাই বলা হল।

কেউ কেউ খোলাখুলি এবং সাহসী। কেউ আবার লুকিয়ে-চুরিয়ে প্রেম করতে ভালোবাসে। মার্গারেট শান্তভাবে সকলের সঙ্গে কথা বলল। একরাতে মিসেস আওনস বিছানা তৈরি করছিলেন। তিনি মার্গারেটের ঘর থেকে আর্তনাদের শব্দ শুনতে পেলেন। দরজা খুলে ছুটে এলেন। একটা মাতাল খদ্দের মার্গারেটের নাইটি টেনে ছিঁড়ে নামিয়ে দিয়েছে। তাকে বিছানায় ফেলে দিয়েছে।

মিসেস আওনস তার ওপর বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি লাঠিপেটা কতে শুরু করলেন। ওই লোকটার তুলনায় শরীরটা তার অর্ধেক। কিন্তু তাতে কী বা হবে। প্রচণ্ড রেগে গেছেন। ওই লোকটাকে মারতে মারতে অচেতন করে ফেললেন। তাকে রাস্তায় ফেলে দিলেন। তারপর মার্গারেটের দরজাতে এসে দাঁড়ালেন।

মার্গারেটের ঠোঁট দিয়ে রক্ত পড়ছে। লোকটা মার্গারেটকে ভীষণভাবে মেরেছে।

মিসেস আওনসের সমস্ত শরীর কাঁপছে। তিনি বললেন- তুমি ঠিক আছে ম্যাগি?

-হ্যাঁ, অনেক ধন্যবাদ মিসেস আনস।

মার্গারেটের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। এই শহরে কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না। কিন্তু এই মহিলা আমার প্রতি অনেক সমবেদনা দেখিয়েছেন।

মিসেস আওনস মার্গারেটের মোটা পেটটা দেখে ভাবলেন, আহা, জেমি ম্যাকগ্রেগর কোনোদিন একে বিয়ে করবে না!

***

মার্গারেট এখন খুব শান্ত। নীচু হতে পারছে না। হাঁটাচলা করতে কষ্ট হয়। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে, পেটের ভেতর বাচ্চাটা এবার নড়াচড়া করছে। হ্যাঁ, আমি আর আমার পুত্রসন্তান পৃথিবীতে একলা থাকব। আমি তার সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলব। জীবনে কত উত্তেজনা আছে। তাকে সব কিছু বলব।

এক সন্ধ্যেবেলা, খাবার পরে কালো রঙের একটা ছেলে এসে বোর্ডিং হাউসে পৌঁছোল। সে মার্গারেটের হাতে একটা বন্ধ খাম তুলে দিয়েছে।

সে বলল আমি উত্তরের জন্য অপেক্ষা করব।

মার্গারেট চিঠিখানা পড়ল। আবার পড়ল। তারপর বলল- হ্যাঁ, আমি যাব!

***

পরের শুক্রবার, দুপুর হয়েছে, মার্গারেট মাদাম অ্যাগনেসের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। সামনে একটা চিহ্ন লেখা আছে–বন্ধ। মার্গারেট দরজাটা ঠেলল। কেউ তার দিকে তাকাল

না। সে ভাবল, এখন এখানে আসা ঠিক হল কিনা। শেষ পর্যন্ত তাকে একটা কঠিন কঠোর সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। এই একাকীত্বের যন্ত্রণা থেকে তাকে বেরিয়ে আসতে হবে।

চিঠির মধ্যে লেখা ছিল- ডিয়ার মিস ভ্যানডার, এটা আমার কথা নয়, আমি শুনেছি, তোমার অবস্থা খুবই খারাপ। তুমি লজ্জা করো না। তোমাকে এবং তোমার বেবিকে আমি সাহায্য করব। তুমি কি আমার কাছে একবার আসবে? শুক্রবার দিন এলে ভালো হয়।

তোমার বিশ্বস্ত
মাদাম অ্যাগনেস

পুনশ্চ- ব্যাপারটা গোপন রেখো।

মার্গারেট ভাবছে, চলে যাবে কিনা? শেষ পর্যন্ত দরজাটা খুলে গেল।

মাদাম অ্যাগনেস মার্গারেটের হাতে হাত রাখলেন–এসো, তোমার ব্যাপারটা শোনা যাক।

তিনি মার্গারেটকে পার্লারে নিয়ে গেলেন। ভারী সুন্দর কৌচ, চেয়ার এবং টেবিল আছে। রিবন দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো। নানারঙের বেলুন ঝুলছে। লেখা আছে ওয়েলকাম বেবি। হ্যাঁ, এটা একটা ছেলে হবে। শুভ জন্মদিন।

মাদাম অ্যাগনেসের আটজন তরুণী বসে আছে বিভিন্ন বয়স, আকার আর রঙের। তারা সকলেই ভারি সুন্দর পোশাকে সেজে উঠেছে। আহা, মার্গারেট ভাবল, কত সুন্দর, এই শহরের কোনো অভিজাত মহিলাও বোধহয় দেখতে এত সুন্দরী নয়।

মার্গারেট ওইসব বেশ্যাদের দিকে তাকিয়ে থাকল। কী করতে হবে সে বুঝতেই পারছে না। হ্যাঁ, কতগুলি মুখ খুবই পরিচিত। যখন সে তার বাবার দোকানে কাজ করত। তখন এইসব মেয়েরা জিনিস কিনতে আসত। তখন তারা কিশোরী ছিল এবং আরও সুন্দরী। কয়েক জনের বয়স হয়েছে, চুলে রঙ পড়েছে, তবে সকলের মধ্যেই একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে। তাদের দেহের যত্ন করা হয়। তারা বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করছে। তারা জীবনটাকে আনন্দে কাটাতে চায়।

মার্গারেটকে তারা ভালোভাবেই গ্রহণ করল। কোনো খারাপ কথা বলল না। তাদের মধ্যে এসে মার্গারেটের মনে হল, সে বোধহয় নতুন জীবন পাবে।

মাদাম অ্যাগনেস বললেন- তোমার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করি। মনে হচ্ছে, তোমার খুবই খিদে পেয়েছে।

আসলে অনেক দিন সে খিদে-তেষ্টার বাইরে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। কেউ তাকে আদর করে বসিয়ে খাওয়ায়নি।

দারুণ আয়োজন, সুস্বাদু খাবার। খেতে খেতে মার্গারেটের চোখে জল এসে গিয়েছিল। এ জল আনন্দের। মাদাম অ্যাগনেস নিজের হাতে পরিবেশন করছিলেন। পাশে বসেছিল আর একটি সুন্দরী মেয়ে। মার্গারেট অবাক হয়ে এইসব বারাঙ্গনাদের দিকে

তাকিয়েছিল। সে ভাবতেই পারছে না, এখানে এত আনন্দ আর কৌতূহল লুকিয়ে আছে। তবে কেন আমরা মিছিমিছি এদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করি?

খাওয়ার পর তার জন্য একটা দারুণ বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। মাদাম অ্যাগনেস তাকে ভেতরের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। সেখানে টেবিলের ওপর অনেকগুলো প্যাকেট পাশাপাশি সাজানো রয়েছে। প্রত্যেকটা সুন্দরভাবে মোড়ক বন্দী।

মাদাম অ্যাগনেস একগাল হেসে বললেন– মার্গারেট, এসব তোমাকে দেওয়া হল। তোমার অনাগত শিশুর শুভ আগমনকে স্মরণে রেখে। তুমি একটা একটা করে সবকটা প্যাকেট খুলতে পারো।

মার্গারেটের বিস্ময় তখন আকাশ ছুঁয়েছে। হায় ঈশ্বর, আমার জন্য এত অন্ধ ভালোবাসা। আমি কী এর যোগ্য? অতীত ইতিহাসের কথা ভেবে মার্গারেট আবার কেঁদে ফেলল। সত্যি, কত যত্ন করে এইসব উপহারগুলো আনা হয়েছে।

এবার বিদায়ের পালা। মেয়েরা তাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল। মার্গারেটকে আবার ওই বোর্ডিং হাউসে ফিরে যেতে হবে। মার্গারেট ছলছল চোখে স্বার দিকে তাকাল। বুঝতে পারল, এই স্মৃতিকে সে কোনোদিন ভুলতে পারবে না। হয়তো অনেক দিন বাদে গল্পছলে সে তার ছেলেকে এই সুন্দর সন্ধ্যেটার কথা বলবে। বলবে, তুই না আসার আগেই তোকে নিয়ে সে কী উন্মাদনা, তুই তা কখনও জানতেও পারলি না!

.

০৮.

ফঁাদটা ভালোভাবেই পাতা হয়েছে। গত ছমাস ধরে জেমি ম্যাকগ্রেগর ধীরে ধীরে ভ্যানডারের সমস্ত ব্যবসার ওপর তার প্রভাব এবং কর্তৃত্ব বিস্তার করে চলেছে। শুধু একটা স্বপ্ন এখনও সফল হয়নি, যে করেই হোক নামিবের ওই মরুভূমির ওপর দখলদারি কায়েম করতে হবে। এই মরুভূমির সঙ্গে তার জীবনের সবকিছু জড়িয়ে আছে। মৃত্যু এবং জীবন, কান্না ঘাম রক্ত– সবকিছু। সে ওই হিরেগুলো দিয়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য রচনা করতে পারে, কিন্তু এটা তার আসল উদ্দেশ্য নয়। যে করেই হোক ভ্যানডারকে ধ্বংস করতে হবে। তা না হলে জেমি শান্তি পাবে না।

ভ্যানডার আরও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। এই শহরের কেউ তাকে আর টাকা ধার দিতে রাজি হচ্ছে না। কিন্তু যে ব্যাঙ্কের মালিকানা জেমি প্রথমে কিনে নিয়েছে, সে ব্যাঙ্ক দরাজ হাতে টাকা ধার দিয়ে চলেছে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কাছে জেমি বলে দিয়েছে, ভ্যানডারকে সবকিছু দিয়ে দেবেন, কোনো কার্পণ্য করবেন না।

এখন আর ওই মুদিখানাটা একেবারেই ভোলা হয় না। ভোর থেকে ভ্যানডার মদ খেতে শুরু করেন। সন্ধ্যেবেলা উনি মাদাম অ্যাগনেসের কাছে গিয়ে হাজির হন। সমস্ত রাত সেখানে থাকতেই ভালোবাসেন।

একদিন সকালবেলা মার্গারেট মাংসের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। কিছু মুরগি কিনতে হবে। মিসেস আওনস মুরগির জন্য বলেছেন। জানালা দিয়ে মার্গারেট তাকিয়ে

দেখল, বাবা বেশ্যাখানা থেকে বেরিয়ে আসছে। হ্যাঁ, ওই লোকটা কদিনে এত বুড়ো হয়ে গেছে। হায় ঈশ্বর, এ কী হল?

ভ্যানডার জানতেন না, তার ভাগ্যে কী ঘটতে চলেছে। হ্যাঁ, নিজের জন্য বড্ড কষ্ট হয়। সব বিশ্বাস আজ হারিয়ে গেছে। এ জীবনে উনি আর উঠে দাঁড়াতে পারবেন না।

এখনও কিছু আছে কি? কয়েকটা হিরের খনির ওপর মালিকানা? তা দিয়ে আর কত দিন চলবে?

একদিন সকালে জেমি তার ব্যাংক ম্যানেজারকে ডেকে বলল- এক্ষুনি ওই লোকটাকে ডেকে পাঠান। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সব ধার শোধ করতে হবে।

পরের দিন বিকেল চারটে। সহকারী ম্যানেজার ওই মুদিখানায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। তার সাথে আইনের নির্দেশনামা আছে। সলোমনের সব পার্থিব সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হবে। জেমি অফিসে বসে ভ্যানডারের কথা ভাবতে থাকল– আহা, দোকান থেকে ভ্যানডারকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বুড়ো লোকটা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছেন পিটপিট চোখে। এখন কী করবেন বুঝতে পারছেন না। সব কিছুই নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এভাবেই জেমির প্রতিশোধের পালা শেষ হল। হ্যাঁ, আমি জিতে গেছি। যে লোকটা আমাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিলেন, আমি তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছি।

সেই রাতে জেমি মাদাম অ্যাগনেসের বারাঙ্গনা পল্লিতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল।

অ্যাগনেস বলেছিলেন- জেমি, তুমি কি খবরটা শুনেছ? ভ্যানডার একটু আগেই মারা গেছেন!

***

শোক অভিযান অথবা মিছিল। শহরের বাইরে। মাত্র দুজন মানুষকে দেখা গেল মার্গরেট এবং জেমি। মার্গারেট একটা কালো পোশাক পরেছে। তার অসাধারণ রূপ লাবণ্যকে ঢেকে রাখার জন্য। মুখে বিবর্ণতা। জেমি দাঁড়িয়ে আছে মাথা নীচু করে। হ্যাঁ, একটু উদাস হয়েছে বটে। দুজন দুদিকে দাঁড়িয়ে আছে, কফিনটা এসে গেছে। সেটা ধীরে ধীরে মাটিতে নামিয়ে দেওয়া হল। মাটি ফেলা হল। মার্গারেটের মনে হল, বাবা বোধহয় তার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলছে- তুই একটা বেশ্যা। কুত্তি বেশ্যা!

সে বাবার কফিনের দিকে তাকাল। তারপর জেমির দিকে। চোখে চোখে মিলন। জেমির চোখের দৃষ্টিতে শীতলতা, মনে হচ্ছে, তারা কেউ যেন কাউকে চেনে না। কিন্তু মার্গারেট? সে এখনও জেমিকে অসম্ভব ভালোবাসে। সে মনে মনে নিজেকে জেমির স্ত্রীর ভূমিকাতে বসাতে চায়। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। সে কফিনের দিকে তাকাল, হ্যাঁ, শেষবারের মতো মাটি চাপা দেওয়া হচ্ছে।

পেছন ফিরে দেখল, কিন্তু জেমিকে কোথাও দেখতে পেল না।

***

ক্লিপড্রিফটে দুটো কাঠের বাড়িতে হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে। ব্যবস্থাটা খুবই খারাপ। রোগীরা সেখানে গিয়ে আর বেঁচে ফিরতে পারে না। শিশুরা এখনও বাড়িতে জন্মায়। মার্গারেটের সময় এসে গেছে। মিসেস আওনস সবকিছু ব্যবস্থা করে দিলেন। একটা কৃষ্ণকায়া ধাত্রীর ব্যবস্থা করা হল। তার নাম হান্না, রাত্রি তিনটের সময় প্রসব যন্ত্রণা উঠল।

হান্না বলল এবার তোমাকে যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে।

–হ্যাঁ, প্রথমে মার্গারেটের মুখে হাসি, সে তার পুত্রসন্তানকে পৃথিবীর বুকে নিয়ে আসছে। তার একটা নাম দিতে হবে। সে জানে না, জেমি এই ছেলেটিকে স্বীকার করে নেবে কিনা। নাকি তার ছেলেকে শুধু শুধু শাস্তি দেওয়া হবে।

ঘন্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। বোর্ডাররা কেউ কেউ মার্গারেটের বেডরুমে এসে উপস্থিত হল। কিন্তু কিছুই হচ্ছে না।

হান্না মার্গারেটেকে বলেছিল– আরও কিছুটা যন্ত্রণা সহ্য করো।

মার্গারেট জানতে চাইল- ছেলে হবে তো?

হান্না মার্গারেটের শরীরটা তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে বলল- আমি জানি না। হ্যাঁ, চেষ্টা করো।

এইভাবে আর কিছুটা সময় এগিয়ে গেল। যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর বোধহয় ছিঁড়ে যাচ্ছে। হায় ঈশ্বর, কিছু একটা ভুল হয়েছে।

হান্না বলল- এবার চেষ্টা করো। না, তার কণ্ঠস্বরে কেমন উদ্বিগ্নতা। আমি এটাকে বার করতে পারছি না।

মার্গারেট দেখতে পেল, হান্না নীচু হয়েছে, দেহটাকে বেঁকিয়ে ধরেছে। তারপর চোখের সামনে অন্ধকার। আর কোনো যন্ত্রণা নেই। মনে হচ্ছে, মার্গারেট যেন মহাশূন্যে ভেসে চলেছে। একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে জেমি বোধহয় চিৎকার করে বলছে- এখানে আমি ম্যাগি, ডার্লিং, তুমি একটা সুন্দর শিশুসন্তান উপহার দিয়েছ। আমি একে বড্ড বেশি ভালোবাসি।

একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল ব্যাপারটা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, একটা তীব্র আর্তনাদ। হান্না বলল– ওটা আসছে।

এক সেকেন্ড বাদে মার্গারেট বুঝতে পারল, কিছু একটা তার শরীর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছে।

হান্না একটা লাল কাপড় মেলে বলেছিল ক্লিপড্রিফট শহর তোমাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছে। হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত ছেলেই হয়েছে।

মার্গারেট আদর করে তার নাম রেখেছিল জেমি!

***

মার্গারেট জানে, এই শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার খবর অচিরে জেমির কানে পৌঁছে যাবে। জেমি কেন আসছে না? কয়েক সপ্তাহ পার হল, মার্গারেট কোনো খবর পেল না। অবশেষে সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে একটা বার্তা পাঠাল। বাতাবাহক তিরিশ মিনিট বাদে ফিরে এল।

মার্গারেট অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিল। সে বলল– ম্যাকগ্রেগরের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

-হ্যাঁ, ম্যাডাম।

খবরটা দিয়েছিলে?

–হ্যাঁ, ম্যাডাম।

–ও কী বলল?

ছেলেটা একটু বিরক্ত- উনি বললেন, ওনার কোনো ছেলে নেই মিস ভ্যানডার।

মার্গারেটের মনে হল, পৃথিবীটা একেবারে শূন্য হয়ে গেছে। কিন্তু এখন কী হবে? কিছু। তো একটা করতেই হবে।

পরের দিন সকালবেলা শ্রীমতী আওনস দরজায় ধাক্কা দিলেন। মার্গারেট দরজা খুলে দিল। মার্গারেট বেশ শান্ত মনে হচ্ছে।

ম্যাগি, তুমি ঠিক আছো?

–হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি। জেমিকে একটু বাইরে নিয়ে যাব।

অ্যাওনস একটা সুন্দর ছোট্ট গাড়ি তৈরি করেছেন। এই গাড়িতে শিশুরা বেড়াতে পারে।

মার্গারেট ওই বেবি ক্যারেজটাকে ব্রুকস্ট্রিটে নিয়ে এল। কেউ কেউ ওই ছোট্ট শিশুর দিকে তাকিয়ে হাসছে। তবে শহরের মেয়েরা কিন্তু ভুলেও তাকাচ্ছে না। কেউ আবার অন্যদিক দিয়ে চলে যাচ্ছে। পাছে ওই খারাপ মেয়েটার মুখোমুখি হতে হয়।

মার্গারেট কোনো কিছুই দেখছে না। সে শুধু একজনের জন্য অপেক্ষা করে আছে। মার্গারেট ছেলেটাকে সুন্দর পোশাক পরিয়েছে। এক সপ্তাহ কেটে গেছে, না, জেমির সাথে কোথাও দেখা হচ্ছে না, মার্গারেট বুঝতে পারল, জেমি ইচ্ছে করেই তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

শেষ পর্যন্ত মার্গারেট ভাবল, যদি বাবা ছেলের সঙ্গে দেখা করতে না আসে, তাহলে আমি ছেলেটাকে নিয়ে বাবার কাছে যাব।

পরের দিন সকালবেলা মার্গারেট আওনসকে পার্লারে দেখতে পেল। মার্গারেট বলল আমি একটু বেরোচ্ছি। এক সপ্তাহ বাদে আসব।

-এইটুকু ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যেও না ম্যাগি।

না, ছেলেটা এই শহরেই থাকবে।

মিসেস আওনস অবাক হয়ে গেছেন তার মানে? এখানে?

না, মিসেস আনস, এখানে, অবশ্য অন্য কোথাও!

***

জেমি ম্যাকগ্রেগর একটা সুন্দর বাড়ি তৈরি করেছে। ক্লিপড্রিফটের পাহাড়ি অঞ্চলে। বাংলো টাইপের বাড়ি। দুটো বড়ো বড়ো উইং-এ ভাগ করা আছে। বাড়ির চারপাশে সবুজ লন আছে, আছে ভারী সুন্দর গোলাপ বাগান। বাড়ির পেছন দিকে পরিচারকদের থাকার ব্যবস্থা।

মার্গারেট সেই বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। ছোট্ট শিশুটিকে হাতে জড়িয়ে রেখেছে।

তখন সকাল দশটা। জেমি হয়তো অফিসে চলে গেছে। মিসেস ট্যালি দরজাটা খুলে দিল। সে অবাক হয়ে মার্গারেটকে এবং ওই ছোট্ট শিশুর দিকে তাকাল।

মার্গারেট কিছু বলার চেষ্টা করল। বলল- আমি দুঃখিত, মিঃ ম্যাকগ্রেগর তো এখন বাড়িতে নেই। হাউসকিপার জবাব দিল। দরজাটা বন্ধ করার চেষ্টা করল।

মার্গারেট বলল- আমি মিঃ ম্যাকগ্রেগরের সঙ্গে দেখা করতে আসিনি। আমি তাকে তার ছেলে ফেরত দিতে এসেছি।

আমার ভয় হচ্ছে, এ ব্যাপারটা বোধহয় ঠিক নয়। আপনি কে?

আমি এক সপ্তাহ এখানে থাকব না। এক সপ্তাহ বাদে ফিরে আসব, কেমন?

মার্গারেট ছেলেটিকে তার হাতে তুলে দিয়ে বলল- এর নাম জেমি জুনিয়ার।

মিসেস ট্যালির মুখে আতঙ্কিত অভিব্যক্তি না-না, ওকে এখানে রেখে যাবেন না। মিঃ ম্যাকগ্রেগর জানতে পারলে রাগ করবেন।

না, তোমাকে একটা বিষয়ে ঠিক করতে হবে, হয় তুমি একে বাড়িতে নিয়ে যাও, অথবা একে আমি দরজায় গোড়ায় ফেলে রেখে চলে যাব।

মিঃ ম্যাকগ্রেগর সেটা কি ভালো চোখে দেখবেন?

আর কোনো কথা না বলে মার্গারেট শিশুটিকে ওই হাউসকিপারের কোলে ঠেলে দিয়ে অতি দ্রুত ছুটে সামনের দিকে চলে গেল।

এরকম কাজ করবেন না, মিস।

মার্গারেট পেছন দিকে তাকাল না। ট্যালি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ভাবছে, এখন কী হবে? ম্যাকগ্রেগরকে কী করে শান্ত করবে?

***

তাকে এমন অবস্থায় কখনও পড়তে হয়নি। সে ভাবল- আমি কী বোকা! দরজাটা কেন জোর করে বন্ধ করে দিলাম না।

হা, মিঃ ম্যাকগ্রেগর, আমি চেষ্টা করেছিলাম।

–ওই কুত্তিটার বাচ্চাটাকে আমি এখানে রাখতে দেব না।

রাগের চোটে ম্যাকগ্রেগর ভুল বকতে শুরু করেছে। সে হাউসকিপারের দিকে তাকাচ্ছে। আর চিৎকার করে বলছে- তোমার ফাইন হবে।

এক সপ্তাহ বাদে মেয়েটি ফিরে আসবে।

–আমি ওসব কথা জানতে চাই না। এই ছেলেটাকে চোখের সামনে থেকে নিয়ে যাও।

আমি কী করব মিঃ ম্যাকগ্রেগর।

–ওকে ডাস্টবিনে ফেলে দাও। কোথাও একটা লুকিয়ে রাখতে পারবে?

–কোথায়?

—জাহান্নামে।

মিসেস ট্যালি ওই ছেলেটির দিকে তাকাল–আহা, শিশুটি কাঁদতে শুরু করেছে। মিসেস ট্যালি বলল, ক্লিপড্রিফটের কোনো অনাথ আশ্রম নেই? সে ছেলেটির গায়ে হাত রাখল। আবার চিল চিৎকার।

একে দেখাশুনা কে করবে?

জেমি হতাশ হয়ে সামনে এগিয়ে এল– আঃ, আমি আর পারছি না। সত্যি, তুমি ওর দেখাশুনা করার চেষ্টা করো, কেমন?

-হ্যাঁ, স্যার।

–আমার চোখের সামনে থেকে চলে যাও। ওকে আর এখানে রেখো না। ও যেন এই বাড়িতে না ঢোকে। ওর মা ফিরে এলে ওকে দিয়ে দিও। কিন্তু ওর মা যেন আমার মুখ দেখতে না পায়। কথাটা বুঝতে পারলে?

ছেলেটা চনমনে হয়ে উঠেছে।

–মিঃ ম্যাকগ্রেগর, আমি চলে যাচ্ছি।

জেমি তার ঘরে একলা বসে আছে। একটু আগে বেশ খানিকটা ব্র্যান্ডি খেয়েছে। এখন সিগারেটে টান দিচ্ছে। বোকা মেয়েটা, ভেবেছে, ওর ছোেটা ছেলেটাকে দেখে আমার হৃদয় গলে যাবে। আমি ওর কাছে গিয়ে ভুল স্বীকার করব। বলব, তোমাকে আমি

ভালোবাসি, আমি তোমাকে বিয়ে করব। এসব ন্যাক-ন্যাকা কথা। না, আমি কখনও ওই শিশুর দিকে তাকাব না।

আমি প্রতিশোধ নিয়েছি, এখনও হয়তো কিছুটা বাকি আছে!

***

জেমির মনের ভেতর শূন্যতা। নতুন একটা উদ্দেশ্য সফল করতে হবে, সে ভাবল, কী উদ্দেশ্য সে জানে না। ক্লিপড্রিফটের অধিকাংশ সম্পত্তি সে দখল করে ফেলেছে। নামিব থেকে কেপটাউন পর্যন্ত অনেকটা অঞ্চলে এখন তারই একচ্ছত্র আধিপত্য। হ্যাঁ, এতে আনন্দ আছে, কিন্তু এর শেষ কোথায়? সে মা-বাবাকে এখানে ডেকে আনবে কি? কিন্তু ওরা হয়তো স্কটল্যান্ড থেকে এখানে আসবে না। ভাইবোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। জেমি মা-বাবার। কাছে অনেক অর্থ পাঠিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, জীবনটা এখন সহজ সুন্দর শান্ত হয়ে গেছে। কয়েক বছর আগে জীবনে অনেক চড়াই-উতরাই ছিল। তখন জেমি বাঁচার মতো বাঁচত। এখন এত শান্ত জীবন ভালো লাগছে না।

সে আবার ব্রান্ডি ডিকানটারের কাছে গেল। দেখল, বোতলটা একেবারে খালি হয়ে গেছে। কী আশ্চর্য! মিসেস ট্যালির মাথায় কিছু নেই।

সে চিৎকার করতে থাকল।

মিসেস ট্যালি কিন্তু এখন ছেলেটিকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নানা ছড়া বলে ছেলেটির মন জয় করার চেষ্টা করছে। তাকে সুন্দর ছোট্ট পরী বলে ডাকা হচ্ছে।

ছেলেটি শান্ত হয়ে গেছে। জেমি মিসেস ট্যালির খোলা বেডরুমের সামনে গেল। ভেতর দিকে তাকাল। হ্যাঁ, একটা সুন্দর ছোটো খাট কিনে আনা হয়েছে। ছেলেটা সেখানে শুয়ে আছে। মিসেস ট্যালি তাকে আদর করছে।

ছোট্ট শয়তান, তুমি একদিন বড়ো হবে...

মিসেস ট্যালি অনেক কিছু বলছে।

–আঃ, মিঃ ম্যাকগ্রেগর, আপনি কখন এলেন?

ম্যাকগ্রেগর ছোটো খাটটির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল– এই শব্দে আমার তন্দ্রা ভেঙে গেল।

জেমি এই প্রথম তার সন্তানের দিকে তাকাল। হ্যাঁ, সে যা ভেবেছিল, তার থেকেও ছেলেটা আকারে বড়ো। বেশ সুগঠিত চেহারা। সে বোধহয় বাবার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

–আমি দুঃখিত মিঃ ম্যাকগ্রেগর। ছেলেটি সত্যিই সুন্দর, স্বাস্থ্যবান। দেখুন, আপনার দিকে তাকিয়ে কেমন হাসছে।

কোনো কথা না বলে জেমি ঘর থেকে বাইরে চলে গেল।

***

জেমি ম্যাকগ্রেগরের কোম্পানিতে পঞ্চাশ জন চাকরি করে। নানা কোম্পনি স্থাপন করেছে সে। সবথেকে বড়ো কোম্পানিটা হল ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেড। সে ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল নামে এক ফোরম্যানের মোলো বছরের ছেলেকে নিয়ে এসেছে। ফরগ্যান অরিগান থেকে আমেরিকান, যে দক্ষিণ আফ্রিকাতে এসেছে হিরের সন্ধানে। ব্ল্যাকওয়েলের টাকাপয়সা যখন শেষ হয়ে গেল, তখন জেমি তাকে ভাড়া করেছিল। একটা খনি দেখাশুনা করার জন্য। ছেলেটা চালাক চতুর, হ্যাঁ, এত ভালো ছেলে খুব একটা পাওয়া যায় না।

ডেভিড, তুমি কি একবার মিসেস আনস-এর বোর্ডিং হাউসে যাবে? সেখানে মার্গারেট নামে একটা মেয়ে থাকে।

ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল ওই নামের সাথে পরিচিত কি? সে বলল- হ্যাঁ, স্যার।

তুমি শুধু মাত্র তার সঙ্গে কথা বলবে। সে তার ছোট্ট শিশুকে আমার হাউসকিপারের কাছে রেখে পালিয়ে গেছে। তাকে বলল, সে যেন আজই এসে ছেলেটাকে নিয়ে যায়।

-হ্যাঁ, মিঃ ম্যাকগ্রেগর।

আধঘণ্টা কেটে গেছে। ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল ফিরে এল। জেমি তার দিকে তাকাল।

সে বলল- স্যার, আমি আপনার মনের মতো কাজটা করতে পারিনি।

–কেন? এ তো সহজ কাজ।

মিস ভ্যানডার ওখানে নেই।

–ওকে বার করতে হবে।

–তিনি ক্লিপড্রিফট ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছেন। পাঁচদিন বাদে ফিরে আসবেন। আর কিছু?

–না, জেমি বলল, ঠিক আছে, তুমি ভালো কাজ করেছ ডেভিড।

ওই মেয়েটির মাথায় বাজ পড়ুক, ফিরে আসার পর কী হবে? হঠাৎ চলে আসবে। ছেলেটাকে ফেরত নিয়ে যাবে তো?

***

সেদিন সন্ধ্যেবেলা জেমি একা একা খাবার খাচ্ছিল। ব্র্যান্ডি শেষ হয়ে গেছে। এবার কী খাওয়া যায়?

হাউসকিপার এসে বলল- ক্ষমা করবেন মিঃ ম্যাকগ্রেগর, জেমি জুনিয়ার কাঁদছে।

সে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জেমি তার ব্রান্ডি বোতলের দিকে তাকাল-হা, একেবারে শেষ হয়ে গেছে। ছেলেটা দেখছি, আমার মাথা না খেয়ে ছাড়বে না।

দশ মিনিট কেটে গেছে। মিসেস ট্যালি বলল- আমি কি আর একটু ব্র্যান্ডি দেব?

–আর দরকার নেই, কী কাজের জন্য তোমাকে রাখা হয়েছে, তা কী ভুলে গেছো? ওই ছেলেটাকে কবে তাড়াবে?

–আমি চেষ্টা করছি, স্যার।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাড়াবার চেষ্টা করো। তা না হলে অবস্থা খারাপ হবে। তুমি কি বুঝতে পারছ?

-হ্যাঁ, স্যার। আর কিছু?

না।

চলে যাবার জন্য মিসেস ট্যালি পা বাড়াল।

মিসেস ট্যালি?

–ইয়েস, ম্যাকগ্রেগর?

–সত্যি ছেলেটা কাঁদছে? ওর কি শরীর খারাপ হয়েছে?

না, স্যার। একটু ঠাণ্ডা লেগেছে। বায়ু পরিবর্তন করতে হবে।

জেমি বলল- হ্যাঁ, একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে।

জেমি ভাবল, অন্য কোথাও গেলে কেমন হয়? সে ভাবল, চাকরদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলবে। কিন্তু কার কাছে গেলে বুদ্ধি পরামর্শ পাওয়া যাবে?

***

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা জেমি একটা কাজে খুব ব্যস্ত ছিল। সে একটা নতুন কোম্পানিতে বেশ কিছু টাকা ঢালতে চলেছে। কোম্পানিটা ছোটো, কিন্তু একসময় বড়ো হয়ে উঠবে, নামিব ডেজার্ট পর্যন্ত রেলপথ চলে যাবে। কেপটাউন-কিম্বারলি লাইন পাতার পরিকল্পনা চলেছে। তখন আরও সহজে হীরে নিয়ে আসা যাবে। সোনাগুলোকেও বন্দরে আনা যাবে।

১৮৬০ সালে প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকা রেলপথ খুলে দেওয়া হয়েছে তো। কেপটাউন থেকে ওয়েলিংটন। এখন অন্যান্য জায়গাতেও রেলপথ পাতার কাজ অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এভাবেই তার পরিকল্পনা সফল হবে, জেমি ভাবল, হ্যাঁ, বেশ কয়েকটা জাহাজ কিনতে হবে। আমার নিজস্ব জাহাজ অসংখ্য ধনরত্ন নিয়ে মহাসমুদ্রে ভেসে বেড়াবে।

সে আটটি বাড়ি করেছে, পোশাক পাল্টেছে, বিছানায় শুয়েছে। হ্যাঁ, লন্ডন থেকে সুন্দর সাজসজ্জা আনিয়েছে। সাজিয়েছে। এককোণে আছে স্পেন দেশীয় মস্ত বড়ো ক্যাবিনেট। দুটো বড়ো বড়ো ওয়াড্রোব আছে। সেখানে পঞ্চাশ জোড়া সুট এবং তিরিশ জোড়া জুতো থাকতে পারে। জেমি জামাকাপড়ের ব্যাপারে খুব একটা নজর দেয় না। কিন্তু সেগুলো ওখানে থাকা দরকার। সে অনেক সময় কম্বল পরে সময় কাটিয়ে দেয়।

হ্যাঁ, একটা কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। জেমি উঠে বসল এবং শান্তভাবে ভাবার চেষ্টা করল, ছেলেটা কি কাঁদছে? তার মানে? ছোট্ট খাট থেকে পড়ে গেছে নাকি? জেমি জানে, মিসেস ট্যালি ঘুমোলে আর জ্ঞান থাকে না। হ্যাঁ, যদি ছেলেটার কিছু হয়ে যায়? আমার বাড়িতে? না, তাহলে আমাকেই সবাই দায়বদ্ধ করবে।

মেয়েটার নিকুচি করেছে। আমি উঠব।

সে স্লিপার পরে এগিয়ে গেল। মিসেস ট্যালির ঘরের দরজা বন্ধ। একটু চিন্তা করে দরজাটা খুলে দিল। মিসেস ট্যালি গভীর ঘুমে অচেতন। হ্যাঁ, নাক ডাকছে। জেমি ছোট্ট খাটটার দিকে এগিয়ে গেল। ছেলেটা ঘুমোচ্ছে। না, ওই তো জেগে আছে। চোখ দুটো একদম খোলা, জেমি তার দিকে তাকাল। হ্যাঁ, একই রকম দেখতে। হায় ঈশ্বর, আমার মতোই মুখ আর চিবুক পেয়েছে। চোখ দুটো এখন নীল, সব শিশুরাই বোধহয় এইভাবে নীল চোখ নিয়ে জন্মায়। হ্যাঁ, পরবর্তীকালে এই চোখ ধূসর হয়ে উঠবে। ছেলেটা ছোট্ট দুটো হাত বাড়িয়ে সামনে ডাকার চেষ্টা করছে। মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত কু-কু শব্দ করছে। হা, সাহসী ছেলে, জেমি ভাবল, এখানে শুয়ে আছে, কোনো শব্দ করছে না। অন্য ছেলেরা যেমন চিল চিৎকার করে। তাও করছে না।

সে নীচু হল। হ্যাঁ, এর সাথে ম্যাকগ্রেগরের অনেক সাদৃশ্য আছে, তা মানতেই হবে।

জেমি একটা আঙুল বাড়িয়ে দিল। ছেলেটা আঙুলটা ধরার চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত ধরে ফেলল, হ্যাঁ, ষাঁড়ের মতো শক্তিশালী, জেমি ভাবল, সেই মুহূর্তে তার মনে হল, এই ছেলেটার গা থেকে একটা অদ্ভুত গন্ধ বেরিয়ে আসছে।

মিসেস ট্যালি?

সে উঠে দাঁড়াল। বলল- কী হয়েছে স্যার?

–ছেলেটাকে ভালো করে দেখাশুনা করতে হবে। আমি কি ভাসব নাকি?

জেমি ম্যাকগ্রেগর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

***

ডেভিড, শিশুদের সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?

–কোন বিষয়ে স্যার?

–তুমি কি জানো, তারা কী খেলতে ভালোবাসে?

ওই আমেরিকান বলল, তারা ছোটো ছোটো খেলনা খেলতে ভালোবাসে, মিঃ ম্যাকগ্রেগর।

অনেকগুলো খেলনা কিনে আনবে, কেমন?

জেমি কথা আর বাড়াল না। ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

***

সেই দিন বিকেলবেলা জেমি একটা ছোট্ট বাদামী রঙের প্যাকেট নিয়ে ঘরে ঢুকল।

মিসেস ট্যালি বলল- গতরাতের ঘটনার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন, স্যার। আমি জানতাম না, এতটা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আজ থেকে আর তেমন কিছু ঘটবে না। ও এত চিৎকার করেছে যে, আপনার ঘুম ভেঙে গেছে।

না, ও মনে হয় চিৎকার করেনি। জেমি বলল, আমি এমনি উঠে এসেছি। সে প্যাকেটটা তুলে দিয়ে বলল, ছেলেটাকে এই খেলনাটা দিও।

–আমি নিশ্চয়ই দেব।

–ওকে কেন বাইরে নিয়ে যাও না? বাগানে তো নিয়ে যেতে পারো?

–হ্যাঁ, তাই করব।

–শরীর খারাপ হলে বলবে কিন্তু।

–হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলব।

স্যার, আমি কি ওঁকে এখানে নিয়ে আসব?-

-হ্যাঁ, এখানে নিয়ে এসো।

কিছুক্ষণ বাদে জেমি জুনিয়ারকে নিয়ে আসা হল। ছেলেটা মহা আনন্দে খেলতে শুরু করেছে।

–ওকে আমার কোলে দাও। শান্তভাবে মিসেস ট্যালি ছেলেটাকে জেমির কোলে বসিয়ে দিল। জেমি এই প্রথম নিজের ছেলেকে কোলে বসাল। হ্যাঁ, তার সমস্ত শরীরে একটা অদ্ভুত অনুভূতি। মনে হচ্ছে, সে যেন দূর শৈশবে হারিয়ে গেছে। এ হল তার সন্তান। জেমি ম্যাকগ্রেগর জুনিয়ার। হ্যাঁ, আমার সবকিছু এ পেয়েছে। কিন্তু একে আমি কী করব?

মিসেস ট্যালি, ওর খাটটা আমার ঘরে নিয়ে এসো।

***

সাতদিন কেটে গেছে। মার্গারেটকে দেখা গেল।

মিসেস ট্যালি বলল- মিঃ ম্যাকগ্রেগর এখন অফিসে আছেন, মিস ভ্যানডার। তিনি আমাকে বলেছেন, ওই ছেলেটাকে আপনার হাতে তুলে দিতে। কিন্তু তার আগে উনি আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

মার্গারেট লিভিংরুমে বসে অপেক্ষা করছে। ছোট্ট জেমিকে কোলে বসিয়ে রেখেছে। আঃ কতদিন এই ছেলেটার সঙ্গে দেখা হয়নি। একটা একটা করে সাতটা দিন কেটে গেছে। অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত জেমি লিভিংরুমে ঢুকে পড়ল। মার্গারেটের মনে আবার আবেগ আমি এখনও কেন ওকে এত ভালোবাসি?

হ্যালো ম্যাগি?

-হ্যালো জেমি?

আমি আমার সন্তান চাইছি।

মার্গারেটের মনে আনন্দ- হ্যাঁ, এ তো তোমারই সন্তান জেমি, আমি তাতে আপত্তি করব না।

-হ্যাঁ, ওকে ঠিক মতো বড় করে তুলতে হবে। আমার কাছে রাখো। আমি সবরকম সুযোগ করে দেব। তুমি সেভাবে ওকে মানুষ করতে পারবে কি?

মার্গারেট বুঝতে পারল না, সে বলল- আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আমাকে আমার ছেলে ফেরত দাও।

–আমি জানি না। তুমি আর আমি...

–না, ও শুধু আমার ছেলে।

মার্গারেট ভীষণ রেগে গেছে– অসম্ভব, আমি কিছুতেই ওকে ছাড়ব না।

জেমি এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল, তারপর বলল- এসো, আমরা একটা আপোস করি। তুমি জেমিকে নিয়ে এখানে থাকতে পারবে। তুমি তার গভর্নের্স হবে।

জেমি মার্গারেটের মুখের দিকে তাকাল।

-তুমি কী চাইছ?

–আমি চাইছি, ও ওর বাবার পরিচয়ে পরিচিত হোক।

–ঠিক আছে, আমি ওকে দত্তক নেব।

মার্গারেট রাগত চোখে তাকাল আমার ছেলেকে দত্তক নেবে? না, তুমি আমার ছেলেকে স্পর্শ করতে পারবে না। তোমার অনেক টাকা আছে, প্রতিপত্তি আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমার কিছুই নেই। তোমাকে দেখে আমার করুণা করতে ইচ্ছে হয়।

জেমি দাঁড়িয়ে থাকল। মার্গারেট ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ছেলেকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরেছে।

পরের দিন সকালবেলা মার্গারেট ভাবল, এবার আমি আমেরিকাতে চলে যাব।

***

মিসেস আওনস কথা বলার চেষ্টা করলেন। এভাবে সমস্যার সমাধান হয় না।

সূচিপত্র

-আমাকে যেতেই হবে। সেখানে গিয়ে আমি আমার ছোট্ট শিশুসন্তানকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করব।

না, সে আর কিছুতেই জেমি ম্যাকগ্রেগরের অপমান সহ্য করবে না।

-কখন তুমি যাবে?

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমরা ট্রেন ধরে পোর্টসিস্টারে যাব, সেখান থেকে কেপটাউন। তারপর নিউইয়র্ক।

অনেক সময় লাগবে।

***

–তাতে কী হয়েছে? আমেরিকাতে গেলে আমি কিছু করতে পারব।

জেমি নিজেকে শান্ত স্বভাবের মানুষ বলে মনে করে। সবকিছু সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। অফিসটা আরও সুন্দর হয়েছে। সব তার হাতের মুঠোবন্দী, কিন্তু মার্গারেট? এটা এক জীবন্ত রহস্য। ছেলেটা কোথায় গেল? শেষ পর্যন্ত ডেভিড ব্ল্যাকওয়েলকে সে বলল তোমাকে একটা দরকারী কাজ দেব, করতে পারবে তো?

–হ্যাঁ, স্যার।

–তুমি মিস ভ্যানডারের সঙ্গে কথা বলবে। বলবে, আমি তাকে কুড়ি হাজার পাউন্ড দেব, সে যেন তার বিনিময়ে একটা জিনিস আমার হাতে তুলে দেয়।

জেমি একটা চেক লিখল। বলল- এটা ওকে দাও।

যাচ্ছি, স্যার।

পনেরো মিনিট বাদে ডেভিড ফিরে এল। চেকটা জেমি ম্যাকগ্রেগরের হাতে তুলে দিল। সেটা অর্ধেক ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। জেমি বুঝতে পারল, কী ঘটেছে। অপমানে তার মুখ লাল হয়েছে।

-তোমাকে ধন্যবাদ, ডেভিড। তোমার কাজ তুমি ঠিক করেছ।

তার মানে মার্গারেট আমার কথা শুনতে রাজী নয়। ঠিক আছে, এবার ওকে আমি শাস্তি দেব।

ব্যাপারটা আমি নিজেই পরিচালনা করব।

বিকেলবেলা জেমি ম্যাকগ্রেগর মিসেস আওনস-এর বোর্ডিং হাউসে গিয়ে উপস্থিত হল।

–এখনই মিস ভ্যানডারকে নিয়ে এসো।

–তা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। সে আমেরিকাতে চলে গেছে।

জেমির মনে হল, তার সমস্ত শরীরে ব্যথা– তা হতে পারে না। কখন সে গেছে?

–সে তার ছেলেকে নিয়ে আজ দুপুরবেলা ওডসিস্টারে চলে গেছে।

*

ওডসিস্টার স্টেশন, ভীষণ ভিড় হয়েছে। অসংখ্য মানুষের জমায়েত। চিৎকার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, নাবিকরা, তাদের বউ, বিক্রয় প্রতিনিধি, হিরের সন্ধানী, সাধারণ মানুষ, তাদের সকলেই। এই প্রথম ট্রেনে আসছে হয়তো। একটা উৎসব মুখর পরিবেশ। মার্গারেট কোনরকমে একটা ছোেট্ট বসার জায়গা পেয়েছে জানালার ধারে। জুনিয়ার জেমির যাতে অসুবিধা না হয় সেদিকে তার সতর্ক দৃষ্টি।

প্রতি মুহূর্তেই সে ভারছে, এই ছেলেটা বোধহয় কারও পায়ের চাপে পিষ্ট হয়ে যাবে।

কনডাক্টর বলল- এবার যাত্রা শুরু হবে।

মার্গারেট তাকাল– এ কী? জেমি দাঁড়িয়ে আছে।

জেমি বলল- তোমার জিনিসপত্র নিয়ে এক্ষুনি নেমে এসো।

ও আমাকে কিনবে? মার্গারেট বলল তুমি আমাকে কত দেবে?

জেমি তার ছেলের দিকে তাকাল, আহা, ছেলেটি মার্গারেটের কোলে ঘুমিয়ে আছে আমি বিয়ের বদলে তোমাকে কিনতে চাইছি।

.

০৯.

তিনদিন বাদে তারা একটা সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল। এটা একান্ত ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান। ডেভিড ব্ল্যাঙ্কওয়েল ছাড়া আর কেউ সাক্ষী ছিল না।

বিয়ের অনুষ্ঠানে জেমি ম্যাকগ্রেগরের মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। সে নিজের রাগ এবং আবেগকে সুনিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। সে শান্ত স্বভাবের মানুষ। মাঝে মধ্যে মার্গারেটের দিকে তাকাল। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। আহা, অসাধারণ সুন্দরী, মনে পড়ল সেই কামনাদগ্ধ প্রহরগুলির কথা। এটা একটা স্মৃতির উদ্বাটন ছাড়া আর কিছুই নয়। হ্যাঁ, মুহূর্তের বশে এ ঘটনা ঘটে গেছে। সে মার্গারেটকে ব্যবহার করেছে, প্রতিশোধের অন্যতম উপায় হিসেবে। এইভাবেই মার্গারেটের গর্ভে তার সন্তান এসেছে, তার সার্থক উত্তরাধিকারী হয়ে।

যাজক বললেন আমি তোমাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করছি। তুমি এখন তোমার বউকে চুম্বন দাও।

জেমি উঠে গেল, মার্গারেটের চিবুকে চুমুর চিহ্ন এঁকে দিল।

জেমি বলল চলো, আমরা বাড়িতে যাব। ছেলেটা অপেক্ষা করছে।

তারা বাড়িতে ফিরে এল। জেমি মার্গারেটকে একটা বেডরুম দেখাল।

-এটা তোমার শোবার ঘর।

–ঠিক আছে।

-আমি আর একজন হাউসকিপার রাখছি, মিসেস ট্যালি জেমি জুনিয়ারের দায়িত্ব নেবে। কোনো কিছু দরকার হলে ডেভিডকে বলল, কেমন?

মার্গারেটের মনে হল, তাকে বারবার অপমানিত হতে হচ্ছে। হা, ও আমাকে ক্রীতদাসীর মতো ব্যবহার করছে। কিন্তু এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নয়। শেষ অব্দি আমার সন্তানকে জারজ হিসেবে বেঁচে থাকতে হবে না, সে একটা পিতৃ পরিচয় পেল।

সেই ডিনারের আসরে জেমি ছিল না। মার্গারেট অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছে। তারপর একা একা খেয়ে নিল। সমস্ত রাত সে জেগেছিল। বাড়িতে নানা ধরনের শব্দ হচ্ছে। ভোর চারটে, সে ঘুমিয়ে পড়ল। সে ভাবল, এখন আমার স্বামী মিসেস অ্যাগনেসের ঘরে কোনো বারাঙ্গনার সাথে সঙ্গমরত?

***

মার্গারেটের সম্পর্কটা এখন কেমন হয়ে গেছে। বিয়ের পরও কোনো পরিবর্তন হয়নি। ক্লিপড্রিফটের মানুষজন এই রূপান্তরে অবাক হয়ে গেছেন। মার্গারেট এখন এক গুরুত্বপূর্ণ মহিলা। তাকে আর নীচুস্তরের মেয়ে বলা যাবে না। এই শহরের সকলেই অর্থনৈতিক দিক থেকে জেমি ম্যাকগ্রেগরের ওপর নির্ভরশীল। তার কোম্পানিও

অনেকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করছে। তাই মার্গারেটকে বুঝে সমঝে চলতে হবে। মার্গারেট মাঝে মধ্যেই জেমি জুনিয়ারকে নিয়ে বাইরে বেরোয়। সকলের সাথে সে কথা বলার চেষ্টা করে। হা; বাতাবরণ পালটে গেছে। অনেক জায়গাতে তাকে নিমন্ত্রণ করা হয়। তাকে খুশি রাখার চেষ্টা করা হয়। কখনও চায়ের আসর, কখনও দাঁতব্যসভা, কখনও নৈশভোজ। কখনও কোনো কমিটির সদস্য হবার আমন্ত্রণ। হ্যাঁ, সে নানাভাবে নিজেকে সজ্জিত করে। এই শহরের অনেকে তাকে ভালোবেসে ফেলেছে। যখন সে নতুন হলুদ পোশাক কেনে, হলুদ পোশাক সহসা জনপ্রিয় হয়ে যায়।

***

জেমি মাঝে মধ্যেই তার ছেলের সাথে সময় কাটায়। মার্গারেটের প্রতি তার আচরণ আগের মতোই রয়ে গেছে। দূরবর্তী এবং শান্ত। প্রত্যেক সকালবেলা ব্রেকফাস্টের আসরে মার্গারেট সুখী স্ত্রীর ভূমিকা পালন করে। হ্যাঁ, চাকরদের সুবিধার্থে। তা না হলে তাদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করতো। জেমি চলে যাবার পর মার্গারেট ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তার সমস্ত শরীরে ঘাম জমেছে। নিজেকে ঘেন্না করতে ইচ্ছে হয়। এই কি আমার অহংকার? মার্গারেট জানে, সে এখনও জেমিকে ভালোবাসে। চিরকাল আমি ওকে ভালবাসবো। ভগবান, তুমি আমাকে সহায়তা করো।

***

জেমি কেপটাউনে গেছে। তিনদিনের ব্যবসায়িক কাজে। যখন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল, একজন কালো ড্রাইভার বলল- গাড়ি লাগবে স্যার?

-না, আমি হাঁটব।

–বান্দা বলেছে, আপনি যেন গাড়িতে ওঠেন।

জেমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল–বান্দা!

–হা, মি. ম্যাকগ্রেগর।

জেমি গাড়িতে বসল। ড্রাইভার ঘোড়ার ওপর চাবুক চালিয়ে দিয়েছে। ঘোড়া চলতে শুরু করেছে। জেমি বান্দার কথা ভাবছে। বান্দার সাহস এবং বন্ধুত্ব। হ্যাঁ, গত দুবছর ধরে জেমি অনেক খুঁজেছে, কিন্তু পায়নি। এবার বোধহয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে।

গাড়িটা জলের ধার দিয়ে এগিয়ে চলেছে। জেমির মনে পড়ল, কত ঘটনা।

পনেরো মিনিট কেটে গেছে। গাড়িটা একটা পরিত্যক্ত ওয়্যার হাউসের সামনে থামল, একদা এখানে জেমি এবং বান্দা বসে বসে নামিব অভিযানের কথা ভেবেছিল। হ্যাঁ, আমরা কেমন বেহিসেবী যুবক ছিলাম, জেমি ভাবল। এখন সব কিছু পালটে গেছে। জেমি গাড়ি থেকে নেমে ওয়্যারহাউসের দিকে চলে গেল। বান্দা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। একই রকম দেখতে। কিন্তু সে এখন সুন্দর পোশাক পরেছে। শার্ট পরেছে, টাই বেঁধেছে।

তারা পরস্পরের দিকে তাকাল। তারা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরল।

জেমি বলল–তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, হাতে অনেক পয়সা এসেছে।

বান্দা মাথা নাড়ল–হ্যাঁ, খুব একটা খারাপ নয়। ফার্মটা আমি কিনে ফেলেছি। বউ আছে, দুটো ছেলে। আমি ওখানে গম উৎপাদন করি। আর উটপাখি।

উটপাখি?

–হ্যাঁ, উটপাখির পালক থেকে অনেক অর্থ আসে।

–তোমার পরিবারের সাথে দেখা করাবে না বান্দা?

জেমি তার নিজস্ব পরিবারের কথা ভাবল তারা কত দূরে? স্কটল্যান্ডে আছে। প্রতি মুহূর্তে ওদের কথা মনে পড়ে। চার বছর ধরে সে বাড়ি ছাড়া।

-তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করেছি।

-আমিও ব্যস্ত ছিলাম। বান্দা কাছে এসে বলল–তোমাকে একটা ব্যাপারে সতর্ক করতে এলাম। সমস্যা দেখা দিয়েছে।

জেমি বলল–কী ধরনের সমস্যা?

-নামিব হিরকখনিতে যাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার নাম হানস জিমারম্যান। লোকটা মোটেও ভালো নয়। সমস্ত শ্রমিকরা ওকে ঘেন্না করে। তারা লোকটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চলেছে। যদি এই ঘটনা ঘটে তাহলে কী হবে? তাহলে তোমার রক্ষীরা হয়তো বাধা দেবার চেষ্টা করবে। দাঙ্গা বেধে যাবে।

জেমি বান্দার মুখের দিকে তাকাল।

–একবার একটা লোকের কথা তোমায় বলেছিলাম, মনে আছে তোমার? জন টেঙ্গো?

–হ্যাঁ, উনি একজন রাজনীতিক নেতা। ওনার সম্পর্কে কিছু প্রবন্ধ আমি পড়েছিলাম।

–উনি কিন্তু হানসের এক অনুগামী।

জেমি মাথা নাড়ল–কী করা যায় ভাবতে হবে।

-হ্যাঁ, তুমি তো এখন এক শক্তিশালী মানুষ হয়ে উঠেছ জেমি, এই ব্যাপারটা ভাবতে আমার ভালো লাগে।

-তোমাকে ধন্যবাদ, বান্দা।

-তোমার একটা সুন্দর ছেলে হয়েছে নাকি।

জেমি তার বিস্ময় চেপে রাখতে পারল না–তুমি কী করে জানলে?

-আমি তো পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখি। আমাকে এখন যেতে হবে জেমি, নামিবের ব্যাপারে নজর দিও।

-হ্যাঁ, দেখব, কখন আবার দেখা হবে?

–আমি কাছাকাছি থাকব। তুমি আমার হাত থেকে এত সহজে নিস্তার পাবে না।

এক মুখ হাসি হেসে বান্দা চলে গেল।

***

জেমি ক্লিপট্রিফটে ফিরে এল। ডেভিড ব্ল্যাকওয়েলকে পাঠাল ওখানকার সমস্যা সমাধান করতে।

সুপারভাইজারের নামও বলে দেওয়া হল, যদি সুপারভাইজার শ্রমিকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তাহলে তাকে সরিয়ে দিতে হবে।

পরের দিন সকালবেলা ব্ল্যাকওয়েল চলল হিরকখনির দিকে।

***

ডেভিড নামিবের হিরকখনিতে অবতরণ করল। দু ঘণ্টা সে সেখানে অতিবাহিত করল। শান্তভাবে প্রহরী এবং শ্রমিকদের সাথে কথা বলল। বুঝতে পারল, এখানে একটা চাপা উত্তেজনা আছে। এই উত্তেজনার কারণ হানস জিমারম্যান।

হানস মস্ত বড়ো চেহারার এক ভদ্রলোক। তিনশো পাউন্ড ওজন, ছ ফুট ছ ইঞ্চি লম্বা। মুখখানা পোরসিলিন দিয়ে তৈরি বলে মনে হয়। লাল আপেলের মতো চোখ দুটো। ডেভিড এ ধরনের অনাকর্ষক মানুষকে খুব একটা দেখেনি। হ্যাঁ, ক্রুগার ব্রেন্ট

লিমিটেডের অন্যতম সেরা সুপারভাইজার, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সে তার ছোট্ট অফিসে বসেছিল। ডেভিড ঢুকে পড়ল।

জিমারম্যান উঠে ডেভিডের হাতে হাত দিয়ে বলল–মি. ব্ল্যাকওয়েল, তুমি যে আসবে আমাকে বলোনি কেন?

ডেভিড জানে, তার আগমনের সংবাদ ইতিমধ্যে জিমারম্যানের কানে পৌঁছে গেছে।

— হুইস্কি চলবে?

–ধন্যবাদ।

জিমারম্যান আবার চেয়ারে বসে পড়ল কী করতে পারি বলো? এখানে কি খুব বেশি হিরে পাওয়া যাচ্ছে না? বস কি খুশি হচ্ছে না?

কিন্তু সকলেই জানে, নামিবের হিরে উত্তোলনের ব্যাপারটা দারুণ।

জিমারম্যান আবার বলতে থাকল আর কিছু নতুন করে করতে হবে কি?

-এখানকার অবস্থা সম্পর্কে কিছু অভিযোগ শুনতে পাচ্ছি।

জিমারম্যানের মুখ থেকে হাসির রেখা মিলিয়ে গেল–কী অভিযোগ?

-শ্রমিকদের ওপর নাকি অকথ্য অত্যাচার করা হচ্ছে।

এই কথা শুনে জিমারম্যান উঠে দাঁড়াল। সে তার উত্তেজনা আর দমন করতে পারছে না। মুখ রাগে থমথম করছে।

-না, এদের শ্রমিক বলে ভালোবেসো না। ওরা হল বুনো জন্তু জানোয়ারের দল। তোমরা হেডকোয়াটার বসে বসে কী ভাবোবা বলো তো? কাজ তো আমাকেই করতে হয়।

-আমার কথা শোনো, ডেভিড বলতে চেষ্টা করল।

-তুমি আমার কথা শুনবে, আমি সব থেকে বেশি হিরে তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। আর তোমরা ওই শ্রমিকদের কী দিচ্ছ? কীভাবে আমি কাজ করি, তা কি তোমরা জানো?

অন্য খনিগুলোর কথা বলব কি? সেখানে আমরা প্রতি মাসে উনষাট শিলিং করে দিয়ে থাকি, আর এখানে কী দেওয়া হয়? মাসে মাত্র পঞ্চাশ শিলিং।

হ্যাঁ, তাহলে আমি কী করতে পারি? তোমরা তো শুধু পয়সা গুনছ।

-জেমি ম্যাকগ্রেগর এই ব্যাপারে রাজি হচ্ছেন না। যে করেই হোক বেতনটা বাড়াতে হবে।

জিমারম্যান শান্তভাবে বলল–বসের টাকা, আমি কী বা বলব?

–আমি শুনেছি, কাজ করতে না পারলে নাকি চাবুক মারা হয়?

জিমারম্যান নাকে ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করে বলল–তুমি একথা কোথা থেকে শুনলে? হ্যাঁ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা করতে হয় বৈকি?

-না, এটা করা উচিত নয়, তাহলে তো তোমাকেই শ্রমিকদের মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হবে।

জিমারম্যান কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল–আমি ব্যাপারটা ভেবে দেখব।

ডেভিড ভাবল –লোকটা একটা কুকুরের বাচ্চা। ভয়ঙ্কর। সে ওই বিরাট চেহারার সুপারভাইজারের দিকে তাকাল–যদি আর কোনো সমস্যা হয়, তাহলে তোমাকে সরিয়ে দেওয়া হবে। মানুষের সাথে মানুষের মতো ব্যবহার করার চেষ্টা করো। আর যেন অত্যাচার করা হয়।

জিমারম্যান তাকাল ডেভিডের দিকে। তার রাগ সংবরণ করে বলল–আর কিছু?

-তিন মাস বাদে আমি আবার ফিরে আসব। আমার মনে হয়, তুমি অন্য কোন কোম্পানিতে চাকরি দেখে নাও।

ডেভিড বেরিয়ে গেল। হানস অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। রাগে থরথর করে কাঁপছে। এখন সে কী করবে? সে জাতে বুয়ের, তার বাবাও তাই ছিল। এই জায়গাটা তাদের, আর ঈশ্বর তাকে পাঠিয়েছে ওদের সেবা করার জন্য। মানুষের মতো ব্যবহার, না, ভাবাই যাচ্ছে না। সে তো ওই লোকগুলোর গায়ের রং আর কালো করে দেয়নি। জেমি ম্যাকগ্রেগর এই অবস্থাটা বুঝতে পারছেন না কেন? না, কেউ যদি কালো কুত্তাদের

ভালোবাসে, আমি কী করব? হানস জিমারম্যান বুঝতে পারল, ভবিষ্যতে তাকে আর একটু সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু নামিবের দায়িত্ব সে অন্য কারও হাতে তুলে দেবে না।

***

ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেড ক্রমশ বেড়ে উঠছে। জেমি ম্যাকগ্রেগর এখন আরও ভালো কাজ করছে। সে কানাডাতে একটা পেপার মিল কিনে নিল। অস্ট্রেলিয়াতে কিনল একটা জাহাজ কারখানা। বাড়িতে থাকার সময় জেমি তার ছেলের সাথে সবটা সময় কাটায়। ছেলেটা বাবার মতো হয়ে উঠছে। জেমি মনে মনে খুব অহঙ্কার বোধ করে। সে ছেলেটাকে তার সাথে লম্বা ভ্রমণে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু মার্গারেট যেতে দিতে চায় না।

সে এখন খুবই ছোটো, আর একটু বড়ো হলে-যাবে। আর তুমি তখন রাগ করতে পারবে না।

জেমি ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। এর আগেই তার ছেলের প্রথম জন্মদিন পালিত হল। তারপর দ্বিতীয়। জেমি অবাক হয়ে গেল। সময় কী দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

১৮৮৭-মার্গারেটের কাছে গত দু বছর কোনোরকমে কেটে গেছে। প্রত্যেক সপ্তাহে একবার জেমি তার বন্ধু-বান্ধবদের আমন্ত্রণ করে। মার্গারেটকে তখন সুখী গৃহকর্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। অন্য লোকেরা তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। তার সঙ্গে কথা বলে। তারা খুবই আমোদ পায়। মার্গারেট জানে, কয়েকজন খুবই সুন্দর চেহারার, কিন্তু তাদেরকে ভালোবেসে কী লাভ? সে তো জেমি ম্যাকগ্রেগরের বিবাহিতা স্ত্রী।

শেষ অতিথি চলে যাবার পর মার্গারেট জিজ্ঞাসা করল-সন্ধ্যেটা কি ভালো কেটেছে?

জেমি উত্তর দিল–হ্যাঁ, শুভরাত্রি।

ছোট্ট জেমিকে তার কোলে নিল। কয়েক মিনিট কেটে গেছে। মার্গারেট শুনতে পেল, জেমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

রাতের পর রাত মার্গারেট ম্যাকগ্রেগর তার বিছানাতে শুয়ে থাকে এবং ফেলে আসা দিনগুলোর কথা ভাবে। সে জানে, এই শহরের সবাই তাকে কত ঈর্ষা করে। এই ব্যাপারটা তার মোটেই ভালো লাগে না। তার কাছে ঈর্ষা করার মতো কী আছে? সে একটা বন্দীশালায় জীবন যাপন করে। স্বামী তাকে মোটেই ভালোবাসে না। এটা বোধহয় একটা চুক্তি, না, এই জীবন সে কতদিন রাখবে? মাঝে মধ্যে সে একটা অদ্ভুত কষ্টকল্পনা জগতের বাসিন্দা হয়ে যায়। হো হো করে হেসে ওঠে। হাসিটা দূর থেকে আরও দূরে চলে যায়। হাসি শেষ পর্যন্ত কান্নাতে পরিণত হয়। আমি জানি না, সে কেন আমাকে ভালোবাসছে না।

***

১৮৯০- ক্লিপড্রিফট আরও বড়ো শহর হয়ে উঠছে। জেমি ভাবতেই পারেনি। গত সাত বছর ধরে সে এখানকার বাসিন্দা। এখন এটাকে একটা প্রাণসম্পন্ন শহর বলা যায়। আরও অনেক হিরক সন্ধানীরা পৃথিবীর নানা অংশ থেকে এখানে আসছে। সেই একই গল্প। তারা কোচ কিংবা ওয়াগনে আসে। কেউ আসে পায়ে হেঁটে। তাদের হাতে কিছুই

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

থাকে না। শুধু পরনে একটুকরো কম্বল। খাবারের দরকার হয়। মাথার ওপর ছাদ এবং কিছু টাকা। জেমি একই ভাবে সবকিছু দিয়ে দেয়। সে এখন অনেকগুলো হিরে আর সোনার খনির মালিক। তার নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

একদিন সকালে অ্যাটর্নি ডে পিয়ারসের পক্ষ থেকে তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ভদ্রলোক কিম্বারবলিতে বিরাট হিরক খনি চালিয়ে থাকেন।

জেমি জানতে চাইল- স্যার, আপনার জন্য কী করব।

-আমাকে একটা প্রস্তাব দিয়ে পাঠানো হয়েছে মি. ম্যাকগ্রেগর। ডে পিয়ারস আপনার সবকিছু কিনতে চাইছে। কত লাগবে বলুন?

একটা অদ্ভুত প্রস্তাব। জেমি দাঁত কিড়মিড় করে বলল –আপনি এখুনি এখান থেকে বেরিয়ে যান।

***

ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল জেমির কাছে ক্রমশ আরও অপরিহার্য হয়ে উঠছে। ওই অল্পবয়সী আমেরিকান যথেষ্ট শক্তিশালী এবং অনুসন্ধানী। হ্যাঁ, এর মধ্যে সততা আছে, আছে বুদ্ধির দীপ্তি এবং আনুগত্য। জেমি ডেভিডকে তার সেক্রেটারির পদে বরণ করেছে। পরবর্তী কালে ডেভিড হল তার আত্মসহায়ক এবং শেষ পর্যন্ত ছেলেটার বয়স হল একুশ, তখন জেনারেল ম্যানেজার।

ডেভিড ব্ল্যাকওয়েলের কাছে জেমি বোধহয় বাবার মতো। ডেভিডের বাবার হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয়। জেমি তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিল এবং ডাক্তারের খরচ চালিয়েছিল। শুধু তাই নয়। মৃত্যুর পর সমস্ত খরচ জেমি ম্যাকগ্রেগর বহন করেছে। বিগত পাঁচ বছর ধরে ডেভিড ক্রুগার ব্রেন্টের হয়ে কাজ করছে। সে জেমিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। শুধু তাই নয়, জেমি আর মার্গারেটের মধ্যে যে একটা ঠাণ্ডা লড়াই চলছে, সে ব্যাপারে ডেভিড অবগত। এ ব্যাপারে সে মনে মনে দুঃখ প্রকাশ করে। কারণ সে দুজনকেই ভালোবাসে। যদিও এটা তার ব্যবসার অন্তর্গত নয়। ডেভিড মনে মনে ভাবল, আমার কাজ হল জেমিকে সাহায্য করা।

***

জেমি আরও বেশি সময় তার ছেলের সঙ্গে কাটাচ্ছে। ছেলেটার বয়স এখন পাঁচ বছর। জেমি তাকে একদিন হিরের খনিতে নিয়ে গেল। জেমি জুনিয়ার কিছুই বুঝতে পারছে না। সে খুবই দুর্বল। সে টেন্টে তারা ভরা আকাশের তলায় ঘুমিয়ে পড়ল। জেমি স্কটল্যান্ডে থাকার সময় নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত। এখানে দক্ষিণ আফ্রিকাতে আকাশের অবস্থান সে ঠিক বুঝতে পারছে না। সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তবুও আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে।

সকালবেলা ওদের ঘুম ভেঙে গেছে। ওরা তিতির পাখি শিকার করল। গায়না, লাল ঝুঁটি মোরগ–আরও কত কী! ছোটো জেমির ছোটো টাটুঘোড়া আছে। বাবা আর ছেলে সেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। হ্যাঁ, কত কী দেখার আছে এখানে।

কোথাও কোথাও বিপদের সম্ভাবনা। একবার জেমি তার ছেলেকে নিয়ে নদীর ধারে তাবুর তলায় শুয়ে ছিল। সেখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। একদল বুনো বাইসন তাদের প্রায় মেরেই ফেলছিল।

হঠাৎ আকাশের দিকে কালো ধুলোর ঝড় উঠল। জেমি অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকল। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, এখনই এখান থেকে পালাতে হবে। জেমি জুনিয়ারকে কোলে করে সে তাঁবুর বাইরে চলে এল। তারপর ছুটতে ছুটতে টিলার ওপর চলে গেল। দেখতে পেল, সব জন্তুরা সভয়ে আর্তনাদ করতে করতে পালাচ্ছে। তার মানে? ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটছে বোধহয়। কিছু বোঝার আগেই কালো একটা রেখা ঝাঁপিয়ে পড়ল। হ্যাঁ, প্রায় তিনঘন্টা ধরে এই তাণ্ডব চলেছিল।

সব কিছু শেষ হয়ে যাবার পর জুনিয়ারকে বুকে চেপে ধরে জেমি বলল–তোকে একদিন কেপটাউনে নিয়ে যাব। সেখানে গেলে দেখবি, শহর কাকে বলে।

জুনিয়ার জানতে চাইল- বাবা, মাকে সঙ্গে নেবে না? মা স্বীকার করতে চায় না, কিন্তু শহর দেখতে ভালোবাসে।

ছেলেটিও অবাক হয়ে ভাবে, মা আর বাবার মধ্যে এত ব্যবধান কেন? কিন্তু সমস্যাটার সমাধান কী ভাবে হবে বা এই সমস্যাটার উৎস কোথায়, বেচারী বুঝতে পারে না।

***

জেমির নিজস্ব রেলওয়ে কারে চড়ে তারা বেড়াতে বেরিয়েছে।

১৮৯১–দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবহন ব্যবস্থা রেল এখন আরও জনপ্রিয় হয়ে গেছে। কেন? এতে ভাড়া কম লাগে, সহজে যাওয়া যায়। দ্রুতগামী।

জেমি নিজের জন্য একটা সুন্দর রেল বানিয়েছে। একাত্তর ফুট লম্বা, তাতে চারটে বড়ো বড়ো কামরা আছে। বারোজন যেতে পারে। একটা সেলুন আছে, যেটা অফিস হিসেবে ব্যবহার করা যায়, একটা ডাইনিং কমপার্টমেন্ট, বাথরুম এবং সুন্দর সাজানো কিচেন। রাজকীয় আভিজাত্যের সমাহার।

ছোট্ট ছেলেটি জানতে চাইল অন্য যাত্রীরা কোথায়?

জেমি হাসল–আমরাই হলাম যাত্রী, এটা তোর নিজস্ব ট্রেন সোনামনি।

জুনিয়ার জেমি খুব মজা করতে শুরু করল। সে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে। আহা, কত সুন্দর এই যাত্রাপথ।

বাবা তাকে বলেছে–এটা ভগবানের নিজস্ব জায়গা। এখানে দামি হিরে, সোনা আছে, চারপাশে ছড়ানো আছে আবিষ্কারের আশা। আমরা শুধুমাত্র শুরু করেছি জেমি জুনিয়ার।

***

তারা কেপটাউনে পৌঁছে গেল। এখানকার লোকজন আর বিরাট বিরাট বাড়ি দেখে ছোট্ট জেমি অবাক হয়ে গেছে। বড়ো জেমি তাকে ম্যাকগ্রেগর শিপিং লাইনে নিয়ে গেল।

অনেকগুলো জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। সে ছোটো ছেলেকে বলল- এইগুলো দেখ, এসবই আমাদের।

***

তারা ক্লিপট্রিফটে ফিরে এল। জেমি জুনিয়ার আনন্দে ডগমগ। সে বলল–বাবা সমস্ত শহরটার মালিক। তুমি পরের বার যাবে তো?

মার্গারেট তার ছেলেকে আদর করে বলল–হ্যাঁ, যাব সোনা।

জেমি বেশির ভাগ সময় বাড়ির বাইরে থাকে। মার্গারেট জানে সে মাদাম অ্যাগনেসের বেশ্যাখানায় রাত কাটায়। সে শুনেছে, জেমি একটা বাড়ি কিনেছে তার আদরের রক্ষিতাকে রাখার জন্য, যাতে সেখানে নিরাপদে এবং নিশ্চিন্তে ভ্রমণ করতে পারে। সে জানে না, এই খবরটা সত্যি কিনা। মার্গারেট শুধু জানে, ওই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হলে সে ওই মেয়েটাকে খুন করবে।

***

মার্গারেট মাঝে মধ্যে শহরে বেড়াতে যায়। সে একটা নতুন চার্চের জন্য চাঁদা তুলছে। একটা মিশন তৈরি করতে হবে। যেসব হিরক সন্ধানীরা এখানে আসে, তাদের পরিবারকে সাহায্য করার জন্য।

তার এইসব কাজে জেমি খুবই রেগে যায়। একদিন জেমি চিৎকার করে বলল–এসব করে কেন টাকা নষ্ট করছ?

মার্গারেট বলল- কিছু ভালো কাজ তো করতেই হবে।

একবার সে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দিল। যেসব হিরক সন্ধানীরা যায়, তাদের কেপটাউনে ফিরিয়ে আনতে হবে। জেমি যেন তার ব্যক্তিগত রেলগাড়িটা এজন্য বিনা পয়সায় দিয়ে দেয়।

শেষ পর্যন্ত জেমি রাজী হয়েছিল, কিন্তু এই ব্যাপারে তার মত ছিল না।

মার্গারেট জেমির অফিসের বাইরে চলে গেল। একটা অদ্ভুত আচ্ছন্নতা জেমিকে গ্রাস করল। মনে হচ্ছে, ও বোধ হয় অন্য কারও স্ত্রী, আমার নয়।

***

জেমি যার জন্য একটা বাড়ি কিনেছে সেই মেয়েটির নাম ম্যাগি। সে হল এক অসাধারণ রূপবতী উপপত্নী, জেমি ভাবল, আহা, দুজনের এক নাম হল কী করে? তাদের মধ্যে কোন কিছুর মিল নেই। এই ম্যাগির বয়স একুশ বছর, সোনালি চুলের বন্যা আছে। অসাধারণ যৌবনবতী শরীর। বিছানায় শুলে বাঘিনীর মতো হিংস্র হয়ে যায়। জেমি মাদাম অ্যাগনেসের হাতে যথেষ্ট অর্থ তুলে দেবার পর তবে ম্যাগিকে অধিকার করতে পেরেছে। প্রতি মাসে সে ম্যাগিকে যথেষ্ট টাকা দেয়। জেমির মন যখন খারাপ থাকে, তখন সেই ছোট্ট বাড়িটাতে আসে। বেশির ভাগ সময় মাঝরাতে। সে জানে, কেউ তার

ওপর নজর রাখেনি। কিন্তু আসলে তাকে অনেকেই দেখছে। কিন্তু কেউ তার এই চালচলনের ওপর মন্তব্য করতে চায় না। এটা জেমি ম্যাকগ্রেগরের নিজস্ব শহর। এখানে সে যা খুশি তাই করতে পারে।

সেই সন্ধ্যেবেলা জেমির মনে কোনো আনন্দ ছিল না। সে ভাবল, ওই বাড়িতে যাবে।

ম্যাগির মন ভালো নেই। সে পা ছড়িয়ে বিছানাতে শুয়ে আছে। তার লাল রঙের ড্রেসিং গাউনটার মধ্যে থেকে বুকের উদ্ভাস। আহা, এত সুন্দর ত্রিভুজ, তার দুটি উরুর মাঝে অবস্থান করছে।

ম্যাগি বলল আমার ভালো লাগছে না। এই বাড়ির মধ্যে বন্দিনী থাকতে। আমি কি তোমার ক্রীতদাসী নাকি? মাদাম অ্যাগনেসের ওখানে কত হৈ-হৈ হত। তুমি কেন আমাকে, সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যাও না।

-আমি তো সেকথা তোমায় বুঝিয়ে বলেছি, ম্যাগি। আমি তা করতে পারি না।

ম্যাগি উপুড় হয়ে শুল। আর একটু কাছে এগিয়ে এল। তার ড্রেসিং গাউনটা অনেকটা খোলা। সে বলল–তুমি তোমার ছেলেকে সব জায়গায় নিয়ে যাও। আমি কি তোমার ছেলের মতো নই?

সে এগিয়ে গিয়ে ব্র্যান্ডি ঢেলে নিল। হ্যাঁ, এটা চার নম্বর। আরও বেশি সে খাবে কি?

-ভালো লাগছে না। আমি কি একটুকরো আসবাবপত্র? কী বলল, আমার এ জীবন ভালো লাগছে না। এভাবে আমি থাকব না।

জেমি এবার বলার সময় পেয়েছে–তুমি কাল সকালে মাদাম অ্যাগনেসের ওখানে ফিরে যেতে পারো। আমি মাদামকে খবর দিয়ে আসব।

সে হ্যাটটা তুলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

–কুত্তির বাচ্চা, তুমি কিছুতেই আমার হাত থেকে ছাড় পাবে না।

ম্যাগি উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে।

জেমি দরজার কাছে গিয়ে বলল –এই মাত্র আমি তোমাকে পরিত্যাগ করলাম। তারপর সে রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অবাক হয়ে সে দেখল, তার পা ঠিক মতো পড়ছে না। তার মন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কেন? ব্র্যান্ডির প্রভাব বোধহয়? হ্যাঁ, ম্যাগির নগ্ন শরীরটার কথা ভাবল। আহা, সে কেন ম্যাগিকে ত্যাগ করে এল। ম্যাগি তার সঙ্গে আনন্দের খেলা খেলতে চেয়ে ছিল। কীভাবে ম্যাগি আদর দেয়, দেহের প্রত্যেক অংশে জিভের পরশ রাখে, পুংদণ্ডটা মুখের ভেতর নিয়ে চুষতে শুরু করে। তারপর দুজনের মধ্যে একটা নকল যুদ্ধের মহড়া হয়ে যায়। একে অন্যকে হারিয়ে দেবার চেষ্টা করে। সেই রাতে অন্যরকম হয়ে গেল সব। ম্যাগির সান্নিধ্যে সে এল, কিন্তু তৃপ্তি পেল কই?

জেমি শেষ পর্যন্ত বাড়িতে পৌঁছোল। হলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেল। ঘরের ভেতর ঢুকবার চেষ্টা করল। মার্গারেটের বেডরুম। আলো জ্বলছে। মার্গারেট এখনও জেগে আছে। হঠাৎ মার্গারেটের দিকে চোখ পড়ে গেল জেমির। পাতলা রাত পোশাকে মার্গারেটের শরীরটা ঢাকা। অথবা সে হয়তো কিছুই পড়েনি। আহা, এক সময় তার সাথে কত সুন্দর মুহূর্ত কেটে গেছে। অরেঞ্জ নদীর তীরে গাছের ছায়ায় ছায়ায়। মদ তার কাজ করতে শুরু করেছে। সে মার্গারেটের বেডরুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

কেরোসিনের আলো জ্বলছে। মার্গারেট কিছু পড়ছে মনে হয়। সে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল–জেমি, কিছু হয়েছে কী?

-আমি কি আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারি না? কণ্ঠস্বর জড়ানো।

হ্যাঁ, মার্গারেট একটা পাতলা ফিনফিনে রাতপোশাক পরেছে। জেমি তার পরিপূর্ণ স্তন দুটি দেখতে পাচ্ছে। দুটি বৃন্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। হায় ঈশ্বর, এত সুন্দর চেহারা, সে পোশাক ছাড়তে শুরু করল।

মার্গারেট অবাক হয়ে প্রশ্ন করল–তুমি কী করছ?

জেমি দরজাটা বন্ধ করে দিল। মার্গারেটের কাছে হেঁটে এল। এক মুহূর্ত বাদে সে মার্গারেটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একেবারে নগ্ন অবস্থায়। তারপর বলল–ম্যাগি, আমি তোমাকে চাই।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

মাতাল অবস্থায় সে কী যেন করে বসল। সে জানে না, কোন ম্যাগিকে সে চাইছে? হ্যাঁ, এই ছোট্ট বুনো বেড়ালনি? সে হো হো করে হেসে উঠল। হাত-পা ছড়িয়ে ম্যাগির ওপর গিয়ে পড়ল। ম্যাগি তাকে আরও জোরে আদর করছে। সে বলল–সোনামনি জেমি, তোমাকে আমার ভীষণ ভালো লাগে।

ব্যাপারটা কী, বুঝতে পারা যাচ্ছে না। মাদাম আগনেসের কাছে যাব নাকি? মার্গারেট মনে মনে ভাবল।

পরের দিন সকালবেলা মার্গারেটের ঘুম ভেঙেছে। অবাক হয়ে সে দেখল, বিছানাতে কেউ নেই। এ কী? সে এখনও অনুভব করছে জেমির উপস্থিতি। জেমির ওই দণ্ড তার মধ্যে প্রবেশ করানো হয়েছিল, এখন ম্যাগির মনে আনন্দ, পূর্ণ আনন্দ, সে ভাবল এ ভাবেই আমার আনন্দ পরিপূর্ণ হয়েছে। আমার স্বামী আমাকে ভালোবাসে। অনেক বছরের একাকীত্বের যন্ত্রণা কেটে গেছে।

সমস্ত দিনটা কেটে গেল অভাবিত উন্মাদনার মধ্যে। সে সুন্দর করে স্নান করল। প্রসাধন করল। তার মনে ভাবনার অনুরণন। আহা, জেমি আমাকে দেখে কত খুশি হবে। নিজের হাতে রান্না করল। জেমির ভালো লাগে, এমন খাবার। ডাইনিং টেবিল সাজাল। আবার আলো জ্বেলে দিল, মোমের আলো। সুগন্ধিত পুষ্প, সুন্দর একটা সন্ধ্যার স্বাগত সম্ভাষণ।

জেমি কিন্তু ডিনার খেতে আসেনি। রাতে আর ফিরল না। মার্গারেট সমস্ত রাত লাইব্রেরিতে বসে ছিল। ভাবছিল, জেমি যে কোনো সময় আসবে। রাত্রি তিনটে বাজল। একা একা সে তার শয্যায় চলে গেল।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা জেমি ফিরল। সে শান্তভাবে মার্গারেটের সঙ্গে কথা বলল। তার ছেলের ঘরে চলে গেল। মার্গারেট তাকিয়ে থাকল, অবাক হয়ে গেছে। তারপর আয়নাতে মুখ দেখল। আয়না বলল, তাকে এখনও সুন্দরী দেখতে। কিন্তু আরও কাছে গিয়ে সে তার চোখ দেখতে পেল। চোখের তারায় কী ধূসর বিষণ্ণতা!

.

১০.

মিসেস ম্যাগগ্রেগর, ডাঃ ট্রিগার বললেন, আপনার জন্য একটা ভালো খবর আছে। আপনি মা হতে চলেছেন।

মার্গারেটের মনে একটা অনাস্বাদিত আনন্দ। সে কাঁদবে, না হাসবে, বুঝতে পারছে না। ভালো খবর? আর একটা শিশুকে এই প্রেমহীন বিয়ের ফসল করতে হবে। এটা অসম্ভব। না, মার্গারেট আর অপমান সহ্য করতে পারবে না। যে কোনো একটা উপায় বের করতে হবে। তার সমস্ত শরীরে ঘাম।

ডাঃ ট্রিগার বললেন–অসুস্থ বোধ করছেন?

–একটু।

তিনি কয়েকটা ওষুধ তুলে দিলেন –এগুলো নিয়ে যান। এগুলো খেলে আপনার ভালো লাগবে। আপনার স্বাস্থ্যের অবস্থা খুবই ভালো, মিসেস ম্যাকগ্রেগর, কোনো বিষয়ে চিন্তা করবেন না। আপনি এখনই বাড়িতে গিয়ে আপনার স্বামীর কাছে সুসংবাদটা দিন।

-হ্যাঁ, আমি নিশ্চয়ই বলব।

***

ডিনার টেবিলে তারা মুখোমুখি বসে আছে।

মার্গারেট বলল–আজ আমি ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলাম। আমি মা হতে চলেছি।

কোনো কথা না বলে জেমি তার ন্যাপকিনটা ফেলে দিল। চেয়ার থেকে উঠে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল। মার্গারেট বুঝতে পারল। এবার জেমিকে ঘৃণা করার সময় এসেছে।

এটা এক কঠিন গর্ভাবস্থা। মার্গারেট বেশিরভাগ সময় শুয়ে কাটাচ্ছে। দুর্বল এবং ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। ঘন্টার পর ঘন্টা শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়। মনে হয় জেমি তার পায়ের তলায় বসে আছে। ক্ষমা ভিক্ষা করছে। আবার ভালোবাসার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছে। কিন্তু এগুলো শুধুই স্বপ্ন বাস্তব হল, তাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। তার যাবার কোনো জায়গা নেই। জেমি কিছুতেই তাকে ছাড়বে না। তার ছেলেকে হাতে দেবে না।

জুনিয়ার জেমির এখন সাত বছর। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল এক শিশু। ভারি সুন্দর কথা বলতে পারে। তার মনের ভেতর কৌতুক বোধ আছে। সে মাঝে মধ্যে মায়ের কাছে আসে।

মায়ের মনে দুঃখের কারণ কী, তা ভাবার চেষ্টা করে। ছোটো ছোটো উপহার নিয়ে আসে। আহা, মার্গারেট সেসব দেখে হেসে ওঠে। জুনিয়ার জেমি বাবার কথা জিজ্ঞাসা করে। বাবা কেন রাতে আসে না, জানতে চায়। মা কোনো কথা বলে না। মাঝে মধ্যে বলে, জেমি তোমার বাবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। তাকে অনেক দামী কাজ করতে হয়।

বাবা আর আমার মধ্যে যেটা চলছে, সেটা ঠাণ্ডা যুদ্ধ, মার্গারেট ভাবল। আমি কেন ছোট্ট জেমিকে এ ব্যাপারে ঢোকাব। জেমি কেন তার বাবাকে ঘেন্না করতে শিখবে?

***

মার্গারেটের গর্ভাবস্থা আরও প্রকটিত হয়ে উঠেছে। এখন রাস্তায় গেলে সকলে তার দিকে তাকিয়ে বলে–কী মিসেস ম্যাকগ্রেগর, আর একটা ছেলে আসবে তো? আমার মনে হচ্ছে এটা পুত্রসন্তান হবে। তোমার স্বামী খুবই খুশী হবে।

আড়ালে তারা বলে, আহা, দেখো, মেয়েটাকে আবার ফাঁসানো হয়েছে। তাই তো হবে। বাজারের বেশ্যাকে কেউ কি বিয়ে করে?

মার্গারেট জুনিয়ার জেমিকে বোঝাবার চেষ্টা করে। সে বলে–জেমি, তোমার একটা ভাই কিংবা বোন আসছে। তোমরা একসঙ্গে খেলবে, তাই তো?

জেমি জুনিয়ার এগিয়ে এসে বলে–কবে আসবে? কিন্তু ওকে তো তুমি বেশি ভালোবাসবে।

মার্গারেট কেঁদে ফেলে।

***

শেষ অব্দি প্রসব যন্ত্রণা উঠল। রাত চারটের সময়। মিসেস ট্যালি হান্নাকে পাঠালেন। দুপুরবেলা মেয়েটার জন্ম হল। ফুটফুটে পরীর মতো। মায়ের মতো মুখ পেয়েছে। বাবার মতো চিবুক। কালো চুল, ছোট্ট লাল মুখ। মার্গারেট তার নাম দিল কেটি। আহা, সুন্দর নাম, মার্গারেট ভাবল, ওকে আরও শক্তি দিতে হবে। হ্যাঁ, আমি আমার ছেলেমেয়েকে এখান থেকে নিয়ে যাব। কিন্তু কীভাবে, তা জানি না।

***

ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল জেমি ম্যাকগ্রেগরের অফিসে বসে আছে। সে প্রচণ্ড রেগে গেছে। সে বলল–নামিবে দাঙ্গা শুরু হয়েছে।

জেমি বলল–সে কী?

-একটা কালো ছেলে নাকি হিরে চুরি করেছিল। সে তার বগলের ভেতর হিরের টুকরোটা রেখে দেয়। তারপর হিরেটা পাথরের আড়ালে নিয়ে যায়। হানস তাকে সবার সামনে বেত মেরেছে। ছেলেটা মারা গেছে। তার বয়স মাত্র বারো বছর।

জেমির মুখ লাল হয়ে গেছে। হায় ঈশ্বর, এ কী হল? আমি তো বলেছিলাম, আমার খনিতে যেন চাবুক মারা বন্ধ হয়।

-আমি জিমারম্যানকে সাবধান করেছিলাম।

–এখুনি ওকে তাড়াতে হবে।

–ও তো আর বেঁচে নেই।

–সে কী?

জেমির বিস্ময়ের মাত্রা আকাশ ছুঁয়েছে।

–হ্যাঁ, কালো মানুষরা খেপে গিয়ে ওকে মেরে ফেলেছে।

জেমি বলল–আমি ওখানে যাচ্ছি। আমি ফিরে না আসা অব্দি তুমি অপেক্ষা করো।

-এখন আপনি ওখানে যাবেন না, মি ম্যাকগ্রেগর, জিমারম্যান যে ছেলেটাকে মেরেছে সে দুর্ধর্ষ উপজাতিদের একজন। লোকজন ক্ষেপে গেছে। প্রাণ ভয়ে জিমারম্যান পালিয়ে গেছে।

তবু জেমি চলে গেল।

***

হিরক খনির কাছাকাছি পৌঁছোনো মাত্র জেমি বুঝতে পারল, বাতাসে বারুদের গন্ধ। আকাশে কালো ধোঁয়া। হায় বোকার দল। নিজেদের তৈরি বারুদ তারা নিজেরাই পুড়িয়ে

দিচ্ছে। সে এক সাংঘাতিক অবস্থা। গুলির শব্দ কানে এল তার। সারি সারি মৃতদেহ চারপাশে ছড়ানো ছেটানো পড়ে আছে। মানুষজন প্রাণভয়ে আর্তনাদ করতে করতে পালাবার চেষ্টা করছে। একটু পরে তার সঙ্গে হেড কনস্টেবলের দেখা হয়ে গেল।

হেড কনস্টেবল সামনে এগিয়ে এল। সে বলল –স্যার, চিন্তা করবেন না। আমি কিছুদিনের মধ্যেই এই ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলব।

জেমি খেপে গিয়ে বলল এখনই আপনার লোকদের বলুন, গুলি চালানো বন্ধ করতে।

হেড কনস্টেবল অবাক হয়ে গেছে এ কী কথা বলছেন? এখানে তো দাঙ্গা বেঁধে গেছে।

-আমি যা বলছি, তাই করুন। আর কালোদের নেতাকে আমার সামনে নিয়ে আসুন।

একটু বাদে গুলি চালানো বন্ধ হল। তার আগেই গুলির আঘাতে এক কালো মহিলার মৃত্যু হল। ছটফট করতে করতে সে মারা গেল।

ছেলেটিকে ধরে আনা হয়েছে। বেশি বয়স নয়, তার হাতে হাতকড়া পরানো। সমস্ত শরীরে রক্তের ছিটে দাগ। কিন্তু মনে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। সে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। তার চোখের তারায় কী এক অদ্ভুত উজ্জ্বলতা। জেমির মনে পড়ল, বান্দা তাকে একটা শব্দ শিখিয়ে ছিল তাকে বলে ইশিকো অর্থাৎ আত্মাভিমান।

-আমি জেমি ম্যাকগ্রেগর।

লোকটা থুথু ফেলল।

-এখানে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তার জন্য আমি দায়ী নই। এসব ঘটনার অন্তরালে আছে তোমার জাতিভুক্ত লোকেরা।

–এসব কথা ওদের বিধবাদের বলুন।

জেমি হেড কনস্টেবলের দিকে তাকিয়ে বলল –হানস জিমারম্যান কোথায়?

–ওঁকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি, স্যার।

জেমি দেখতে পেল, কালোলোকটার চোখের তারায় এক অদ্ভুত দ্যুতি। সে জানে হানস জিমারম্যানকে আর কখনওই পাওয়া যাবে না।

জেমি বলল–আমি তিনদিনের জন্য হিরের খনি বন্ধ রাখব। তুমি তোমার লোকেদের সঙ্গে কথা বলো। তোমাদের কী অভিযোগ সব দাখিল করো। আমি দেখব। আমি কথা দিচ্ছি আমি সু-আচরণ করব। আমি অব্যবস্থা বন্ধ রাখব।

লোকটা তাকাল। তার চোখের ভেতর একটা সন্দেহতার ছাপ।

-নতুন একজন ফোরম্যানকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। কাজ করার পদ্ধতি এবং পরিবেশ পালটানো হবে। কিন্তু আমি চাইছি তোমার লোকেরা যেন তিনদিনের মধ্যে কাজে যোগ দেয়।

চিফ কনস্টেবল বলল–হ্যাঁ, এটা কখনও হবে না। আপনি কি জানেন, ও আমাদের কয়েকজন পুলিশকে মেরে ফেলেছে।

এ ব্যাপারে, পূর্ণ তদন্ত হবে।

ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। জেমি ঘুরে তাকাল। ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল, কী আশ্চর্য, জেমির মনের ভেতর বিপদের ঘন্টাধ্বনি।

ডেভিড ঘোড়া থেকে নেমে বলল–মি. ম্যাকগ্রেগর, আপনার ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

এক মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী আর একটু বেশি শীতল বলে মনে হল জেমির কাছে।

***

ক্লিপড্রিফট শহরের আদ্ধেক মানুষ অনুসন্ধানের কাজে লেগে পড়েছে। শহরের উপকণ্ঠে, তারা হানা দিয়েছে। প্রত্যেকটা উপত্যকা, না, কোথাও ছেলেটার কোনো চিহ্ন নেই।

জেমি অবাক হয়ে ভাবছে নিশ্চয়ই ও ফিরে আসবে। হয়তো কোথাও খেলতে গেছে। পথ হারিয়ে ফেলেছে।

সে মার্গারেটের বেডরুমে প্রবেশ করল। মার্গারেট বিছানায় শুয়ে। ছোট্ট মেয়েটিকে যত্ন করছে।

মার্গারেট জানতে চাইল–কোনো খবর আছে?

–এখনও পাইনি, কিন্তু আমি খবরটা বের করবই।

জেমি এক মুহূর্ত তার ছোট্ট মেয়েটির দিকে তাকাল। তারপর কোনো কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিসেস ট্যালি ঘরে এসে ঢুকল। অ্যাপনে হাত মুছে বলল –মিসেস ম্যাকগ্রেগর, চিন্তা করবেন না, জেমি এখন বড়ো হয়েছে, সে জানে, কীভাবে নিজেকে বাঁচাতে হয়?

মার্গারেটের চোখ জলে পরিপূর্ণ। আঃ, আমার ছোট্ট জেমিকে কে আঘাত করবে?

মিসেস ট্যালি এগিয়ে এল। মার্গারেটের কোল থেকে কেটিকে নিয়ে গেল।

-একে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করো তো।

সে ছোট্ট মেয়েটাকে নিয়ে নার্সারিতে চলে গেল। কেটি তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

–এখন ঘুমিয়ে পড়ো সোনা, তোমার সামনে ব্যস্ততাপূর্ণ জীবন।

মিসেস ট্যালি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘরটা বন্ধ করল।

মধ্যরাত, শোবার ঘরের জানালাটা হঠাৎ খুলে গেছে। একজন ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে। সে ধীরে ধীরে ওই দোলনার কাছে চলে গেল। ছোটো মেয়েটার ওপর কম্বল চাপা দিল। তারপর তাকে কোলে তুলে নিল।

বান্দা যত তাড়াতাড়ি এসেছিল, তত তাড়াতাড়ি চলে গেল।

মিসেস ট্যালি দেখল কেটিকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে ভাবল, মিসেস ম্যাকগ্রেগর হয়তো এসে তাকে নিয়ে গেছেন। সে মার্গারেটের ঘরে গেল এবং জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটি কোথায়?

মার্গারেটের মুখে একটা অদ্ভুত আতঙ্কের ছাপ। মার্গারেট হয়তো বুঝতে পেরেছে, কী ঘটে গেছে।

***

আর একটা দিন চলে গেল। ছেলেটার কোনো চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না। জেমি তখন প্রায় পাগল হয়ে গেছে। সে বারবার ডেভিড ব্ল্যাকওয়েলকে বলছে–কী ঘটতে পারে বলো তো?

নিজের কণ্ঠস্বরকে সে দমন করতে পারছে না।

ডেভিড ভালোভাবে বলার চেষ্টা করল মি. ম্যাকগ্রেগর, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

হ্যাঁ, ডেভিড ক্লান্ত। ইতিমধ্যে সে জেমি ম্যাকগ্রেগরকে সাবধান করেছিল। বান্টুরা কখনও ক্ষমা করে না। কোনো অপমান তারা ভোলে না। একজন বান্টু একাজটা করেছে। করার অন্তরালে কারণ আছে। বান্টু যুবককে হত্যা করা হয়েছে। ডেভিড একটা ব্যাপারে

সুনিশ্চিত। বান্টুরা যদি ছোটো জেমিকে নিয়ে যায়, তাকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলা হয়েছে। কারণ তারা রক্তের বদলে রক্তই খুঁজে বেড়ায়।

জেমি পরের দিন সকালে ফিরে এল। বিধ্বস্ত অবস্থায়, সমস্ত রাত ধরে খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে। সর্বত্র লোক পাঠানো হয়েছে। কোথায় এই ছেলেটা লুকিয়ে থাকতে পারে? সম্ভাব্য সব জায়গায়। সবই ব্যর্থ এবং বিফল প্রয়াস।

ডেভিড সেই দুঃসংবাদটা জানাল–মি. ম্যাকগ্রেগর, আপনার মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে।

জেমি তাকিয়ে থাকল। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। সে ধীরে ধীরে বেডরুমে প্রবেশ করল।

গত আটচল্লিশ ঘণ্টা জেমি বিছানাতে শোবার সুযোগ পায়নি। সে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অবস্থায় বিছানাতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। হ্যাঁ, তার মনে হল সে যেন একটা বিশাল বাওয়াফ গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক দূরে একটা সিংহ বসে আছে। সিংহটা তার দিকে এগিয়ে আসছে। জেমি জুনিয়ার তাকে জাগাবার চেষ্টা করছে।–বাবা, একটা সিংহ আসছে। হ্যাঁ, সিংহটার গতি আরও বেড়ে গেছে। হাত ঝাঁকানিটা আরও দ্রুত হয়েছে–বাবা ওঠো, জেমি চোখ খুলল। বান্দা সামনে দাঁড়িয়ে আছে। জেমি কিছু বলার চেষ্টা করেছিল। বান্দা জেমির মুখে হাত চাপা দিল।

–শান্তভাবে থাকার চেষ্টা করো।

–আমার ছেলে কোথায়, জেমি জানতে চাইল।

–ও মরে গেছে।

ঘরে অন্ধকার।

-আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারিনি। তোমার লোকেরা বান্টুর রক্ত ঝরিয়েছে, আমার উপজাতির মানুষেরা এভাবে প্রতিহিংসা নিয়ে থাকে।

জেমি হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বলল–আমি কী করব?

বান্দার কণ্ঠস্বরে সীমাহীন দুঃখ–হ্যাঁ, আমি তার মৃতদেহটা দেখতে পেয়েছি, মরুভূমির মধ্যে পড়ে ছিল। তাকে সমাহিত করে দিয়েছি।

-আঃ! না, একথা বলো না।

–আমি তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছি, জেমি।

জেমি কথাটা শুনে বলল আমার মেয়ে?

-আমি তাকে নিয়ে গেছি, যাতে ওরা তার সন্ধান না পায়। তাকে আবার তোমার বেডরুমে পৌঁছে দিয়েছি। কিন্তু তোমাকে একটা শপথ নিতে হবে।

জেমি তাকাল। তার মুখে একটা অদ্ভুত অসহায়তা–আমি আমার শপথ রাখব। কিন্তু যারা আমার ছেলেকে হত্যা করল, তাদের শাস্তি দেব না?

বান্দা শান্তভাবে বলল–জেমি, তাহলে সমস্ত মানুষকে শাস্তি দিতে হবে। তুমি কি এত শক্তিশালী?

***

এটা বোধহয় একটা দুঃস্বপ্ন। কিন্তু সে তখনও চোখ বন্ধ রেখেছে। সে ভাবছে, চোখটা খুললেই বোধহয় দুঃস্বপ্নটা সত্যি হবে। হ্যাঁ, ছেলেমেয়েরা মারা যাবে। সে একটা অদ্ভুত খেলা খেলার চেষ্টা করল। সে কিছু বলতে চাইছে কি? ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। এ কী আমার জেমি সোনা? মা, আমি ঠিক আছি, আমাদের কোনো খারাপ ঘটনা ঘটেনি।

তিনদিন ধরে তাকে বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়েছিল। কারও সাথে কথা বলছে না। ডাঃ ট্রিগার তাকে দেখতে এলেন। মার্গারেট এই ব্যাপারটাও জানতে পারল না।

মধ্যরাত। মার্গারেট তার বিছানাতে শুয়ে আছে। চোখ বন্ধ। ছেলের ঘরে কীসের শব্দ? সে চোখ খুলল। হ্যাঁ, আর একটা শব্দ। ছোট্ট জেমি ফিরে এসেছে।

মার্গারেট বিছানা থেকে উঠে গেল। করিডর দিয়ে হেঁটে তার ছোটো ছেলের বন্ধ ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হ্যাঁ, সে শুনতে পেল জন্তুর বিচিত্র কণ্ঠস্বর।

তার মনের ভেতর ভয়ের বাতাবরণ। দরজাটা খুলল।

তার স্বামী বিছানাতে নেই, মেঝেতে পড়ে আছে। বুকে এবং মুখে আঁচড়ের দাগ। একটা চোখ বন্ধ। আর একটা চোখ কেমন যেন হয়ে গেছে। কিছু বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু তার গলা দিয়ে জন্তুর আর্তনাদ বেরিয়ে আসছে।

মার্গারেট বলল–জেমি, তোমার কী হয়েছে?

***

ডাঃ ট্রিগার বললেন–খবরটা খুবই খারাপ। মিসেস ম্যাকগ্রেগর, আমি ভাবতে পারছি, আপনার স্বামীর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। পঞ্চাশ শতাংশ বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেঁচে থাকলেও উনি একেবারে পঙ্গু হয়ে যাবেন। আমি ওনাকে একটা প্রাইভেট স্যানাটোরিয়ামে নিয়ে যাব। সেখানে হয়তো উপযুক্ত শুশ্রূষার ব্যবস্থা হবে।

না।

মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে ডাঃ ট্রিগার বললেন কেন?

-না, কোনো হাসপাতাল নয়। আমি চাই যে, ওর এখানেই চিকিৎসা হোক।

ডাক্তার কী যেন চিন্তা করে বললেন –ঠিক আছে। একজন নার্সের ব্যবস্থা করতে হবে।

-না, আমার নার্স লাগবে না। আমি নিজে পরিচর্য্যা করতে পারব।

ডাঃ ট্রিগার মাথা নেড়ে বললেন মিসেস ম্যাকগ্রেগর, আপনি জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করবেন না। আপনার স্বামী কিন্তু এখন আর কর্মরত অবস্থায় নেই। তিনি সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গেছেন। যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন, তাকে এইভাবে বেঁচে থাকতে হবে।

মার্গারেট বলল–আমি তার সেবা শুশ্রূষা করব।

অবাক বিস্ময়ে ডাক্তার চলে গেলেন। মার্গারেট ভাবল, জেমি এতদিনে আমার হাতে বন্দী হল।

জেমি ম্যাকগ্রেগর

১১.

জেমি ম্যাকগ্রেগর আর মাত্র এক বছর বেঁচেছিল। এই সময় সীমাটাই মার্গারেটের জীবনে সব থেকে উল্লেখযোগ্য প্রহর। জেমি তখন একেবারে অসহায়, কথা বলতে পারছে না। নড়াচড়া করতে পারছে না। মার্গারেট তার স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করল। সেবিকার মতো। সমস্ত দিন এবং রাত পরিশ্রম করে চলেছে। দিনের বেলা তাকে হুইলচেয়ারে বসিয়ে করিডরের ওপর দিয়ে নিয়ে যায়। মাঝে মধ্যে মার্গারেট সোয়েটার বোনে। তার সাথে কথা বলে। ছোটোখাটো সমস্যা নিয়ে দুজনের মধ্যে আলোচনা হয়। হ্যাঁ, কেটি আস্তে আস্তে বেড়ে উঠছে। রাতের অন্ধকারে জেমির কঙ্কাল দেহটা ঘরের দরজায় এসে আঘাত করে। আহা, ছোট্ট ছেলের মৃতদেহের পাশে শুয়ে থাকে। মার্গারেট তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে।

ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল এখন ক্রুগার ব্রেন্ট সংস্থাটা চালাচ্ছে। মাঝে মধ্যে ডেভিড এই বাড়িতে আসে। মার্গারেট কিছু কাগজে সই করে দেয়। এই অবস্থা দেখে ডেভিড খুবই কষ্ট পায়। বিশেষ করে জেমি, মানুষটা কেমন যেন হয়ে গেছে।

মার্গারেট একদিন তার স্বামীকে বলেছিল, জেমি, ডেভিড কিন্তু সত্যি ভালো ছেলে।

হাতের বোনা থামিয়ে দিয়ে মার্গারেট আবার বলল–তোমার কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু সে তোমার মতো এত চালাক নয়। আর তোমার মতো এত উচ্চাকাঙ্ক্ষী নয়। জেমি,

তোমার মতো এত শক্তি কি তার আছে? তোমার সমস্ত স্বপ্ন সফল হয়েছে। এই কোম্পানিটা একদিন আরও বড়ো হবে।

সে আবার উলের গাছি হাতে তুলে নিয়ে বলল–ছোট্টো কেটি কথা বলতে শিখেছে। সে আজ সকালে মা বলে ডেকেছে।

জেমি বসেছিল, চেয়ারের মধ্যে, একটা চোখে ভাসছে বিষণ্ণতা।

-ছোট্ট মেয়েটা তোমার মতো দেখতে হয়েছে। তোমার মতো মুখ। কালে কালে সে সুন্দরী হয়ে উঠবে।

পরের দিন সকালবেলা মার্গারেটের ঘুম ভেঙে গেল। জেমি ম্যাকগ্রেগর মারা গেছে। সে জেমির হাতে হাত রাখল।

-শান্তিতে থাকো, আমি সব সময় তোমাকে ভালোবেসেছি, জেমি গুডবাই, আমার প্রিয় ভালোবাসা।

এখন এই পৃথিবীতে মার্গারেট একা। স্বামী এবং পুত্র চলে গেছে। সে বেঁচে আছে। আর বেঁচে আছে তার ছোট্ট মেয়ে। মার্গারেট ছোট্ট মেয়েটির ঘরে গেল। কেটির দিকে তাকিয়ে থাকল। [-ক্যাথেরিন, কেটি, গ্রিক শব্দ থেকে এই নামটি এসেছে। এক সময় ওই নামটা দেওয়া হত সন্ন্যাসিনীদের আর রানিদের।]

মার্গারেট ভাবল, কেটি, তুমি বড়ো হয়ে কী হবে?

***

দক্ষিণ আফ্রিকাতে নানা ঘটনা ঘটে চলেছে। জাতিগত বিদ্বেষ দেখা দিয়েছে। এক দিকে বুয়েররা এবং অন্যদিকে ব্রিটিশরা। ১৮৯৯ সালের ১২ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, কেটির সপ্তম জন্মদিন। ব্রিটিশরা বুয়েরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। তিনদিন বাদে অরেঞ্জ ফ্রিস্টেটকে আক্রমণ করা হল। ডেভিড মার্গারেটকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল কেটিকে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে চলে যেতে। কিন্তু মার্গারেট রাজী হল না।

মার্গারেট বলল–আমার স্বামীর আত্মা এখানে আছে।

ডেভিড আরও বোঝাবার চেষ্টা করল –আমি বুয়েরদের পক্ষে যোগ দিচ্ছি। কিন্তু আপনার কী হবে?

মার্গারেট বলল –আমি কোম্পানিটাকে চালাবার চেষ্টা করব।

পরের দিন সকালে ডেভিড চলে গেল।

***

ব্রিটিশরা ভেবেছিল, এই যুদ্ধে সহজে জয়লাভ করবে। তাদের বাধার সম্মুখীন হতে হবে না। তারা ছুটির আনন্দে যুদ্ধ করছিল। শেষ পর্যন্ত হাইট পার্ক ব্যারাকে খারাপ খবর পৌঁছে গেল। খবরগুলো কেমন?

নভেম্বর ২৭, ১৮৯৯ কেপস স্কোয়াড্রন।

রবিবার, ট্রান্সভাল পিটোরিয়া।

বুয়েররা যুদ্ধে জয়লাভ করছে।

ব্রিটিশরা অবাক হয়ে গেছে। এটা বুয়েরদের নিজস্ব ভূমিখণ্ড, তারা দৃঢ় সংকল্প এবং কঠিন প্রতিজ্ঞায় অটল। প্রথম যুদ্ধে ব্রিটিশরা হেরে গেল। হ্যা, সব কিছুর বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়াল। আরও বেশি সৈন্য পাঠানো হল। কিম্বারলেকে অবরোধ করা হল। ভীষণ লড়াইয়ের পর কিছু কিছু জায়গার ওপর তারা নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হল। বুয়েররা কিন্তু তখনও সমানে সমানে লড়াই করে চলেছে।

***

ক্লিপড্রিফট শহর –মার্গারেট যুদ্ধের প্রতিটি খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে। সে জানে, এখন গুজব বাতাসে ভাসছে। কী হবে বুঝতে পারা যাচ্ছে না। গুজবের ওপর নির্ভর করে কি বাঁচা যায়?

একদিন সকালে মার্গারেটের কর্মচারীরা তার অফিসে এসে বলল–ব্রিটিশরা ক্লিপড্রিফটের দিকে এগিয়ে আসছে। তারা আমাদের সকলকে মেরে ফেলবে।

-না, তারা আমাদের গায়ে হাত দেবে কেন?

পাঁচ ঘণ্টা কেটে গেছে। মার্গারেটকে বন্দী করা হল। সে হল যুদ্ধবন্দী।

মার্গারেট এবং কেটিকে পারবেবার্গে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে অনেকগুলো বন্দীশালা খোলা হয়েছে। সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা জুড়ে এমন অনেক শিবির স্থাপিত হয়েছে। বন্দিদের মস্ত বড়ো খোলা মাঠে রেখে দেওয়া হয়। চারপাশে সুরক্ষিত প্রহরীর দল আছে। আছে ইলেকট্রিক তারের পাহারা। বন্দীদের অবস্থা শোচনীয়।

মার্গারেট কেটিকে কোলে তুলল। এবং বলল- চিন্তা করো না, তোমার কোনো কিছু হবে না।

কিন্তু তার এ বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত থাকল না। প্রত্যেকটা দিন আরও বেশি আতঙ্ক এনে দিচ্ছে। তারা দেখল, অনেক মানুষের মৃত্যু হচ্ছে অনাহারে, অনেকে জ্বরের আক্রমণে থরথর করে কাঁপছে। ডাক্তার নেই, শুশ্রূষা নেই। খাবার নেই। একটা ধারাবাহিক দুঃস্বপ্ন। এইভাবে তিন-তিনটে বছর কেটে গেল। অসহায় অবস্থার মধ্যে দিয়ে মার্গারেট এবং কেটি তখন অন্যদের ওপর নির্ভরশীল। তারা খাবারের আশায় হাঁ করে বসে থাকে। জীবনের জন্য হাত পেতে ভিক্ষা করতে হয়। মার্গারেটের জীবন আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে কেটে চলেছে। মার্গারেট দেখল, অনেকের মৃত্যু হচ্ছে চোখের সামনে। হ্যাঁ, কেটিও বুঝতে পেরেছে তার জীবনদীপ নিভে যাবে। সে এখন আর কিছুই করতে পারবে না। ক্ষমতা? ক্ষমতা থাকবে কী করে? তোমার কি স্বাধীনতা আছে? তুমি কি খাদ্য পাচ্ছো? হ্যাঁ, মৃত্যু-মৃত্যুই এখন একমাত্র কাঙ্খিত বিষয়।

একদিন কেটি ভাবল, আমাকে আরও বেশি ক্ষমতা জোগাড় করতে হবে। এমন ক্ষমতা যা দিয়ে আমি বিশ্বের রানি হব।

***

ভীষণ লড়াই চলেছে। নানা জায়গা থেকে খবর আসছে। শেষ পর্যন্ত বুয়েররা ওই ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে পেরে উঠল না। ১৯০২ সাল। অনেক দিনের লড়াই শেষ হয়েছে। বুয়েররা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। বাহান্ন হাজার বুয়ের যোদ্ধা সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছিল। বত্রিশ হাজারের মৃত্যু ঘটেছে। মারা গেছে অনেক স্ত্রী এবং শিশুর দল। যারা বেঁচেছিল, তাদের মনের ভেতর তিক্ততা। অনেককে পাঠানো হয়েছে কনসেনটেশন ক্যাম্পে।

একদিন এই ক্যাম্পের দরজা খুলে দেওয়া হল। মার্গারেট এবং কেটি আবার ক্লিপড্রিফটে ফিরে এল।

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে। শান্ত রবিবার। ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল ফিরে এসেছে। যুদ্ধ তাকে আরও অভিজ্ঞ করে তুলেছে। সে আরও শান্ত এবং গম্ভীর হয়েছে। মার্গারেট তার দিকে তাকাল। হ্যাঁ, ডেভিড অনেক বছর রণক্ষেত্রে কাটিয়েছে। সে জানত না, মার্গারেট এবং কেটি বেঁচে আছে কিনা। তাদের ফিরে আসতে দেখে সে আনন্দিত হয়ে উঠল।

ডেভিড বলল–হ্যাঁ, আমি ভাবতেই পারছি না...

–এসব অতীতের ঘটনা, ডেভিড, আমরা এখন ভবিষ্যতের দিকে তাকাব।

ভবিষ্যৎ কী? ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেড।

***

১৯০০ সাল। ইতিহাসের পাতায় একটি উল্লেখযোগ্য বছর। শান্তির নতুন শতাব্দী শুরু হল। নতুন আশার সঞ্চারণ। হ্যাঁ, অনেক আকর্ষণীয় আবিষ্কার। ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ হাতের মুঠোয় এসে গেছে। এরোপ্লেন এক দেশ থেকে অন্য দেশে উড়ে চলেছে। জলের তলায় চলেছে সাবমেরিন। পৃথিবীর জনসংখ্যা বিস্ফোরণের মতো বেড়ে চলেছে। চারদিকে নতুনত্বের ছোঁয়া। পরবর্তী ছমাসে মার্গারেট এবং ডেভিড সব সুযোগের সদ্ব্যবহার করল।

কেটি এখন আরও বড়ো হয়ে উঠেছে। সে জানে, তার মা ব্যবসা নিয়ে খুবই ব্যস্ত। হা, সে এক বুনো কিশোরী, যা খুশি তাই করতে পারে। একদিন বিকেলবেলা মার্গারেট বাড়ি ফিরেছে। জরুরি দরকার আছে। সে দেখল, তার চতুর্দশী কন্যাটি লুইর ছেলের সাথে লড়াই শুরু করে দিয়েছে।

মার্গারেট বিশ্বাস করতে পারছে না। মার্গারেট চিৎকার করে ডেকে বলল তুই করছিস কী? একদিন তোকে এত বড়ো কোম্পানি চালাতে হবে। আর আজ তুই এই ভাবে সময় নষ্ট করছিস?

.

দ্বিতীয় খণ্ড

কেটি ও ডেভিড

১৯০৬-১৯১৪

১২.

১৯১৪ সালের এক উষ্ণ গ্রীষ্মরাত। কেটি ম্যাকগ্রেগর একলা তার অফিসে বসে কাজ করছেন। ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেডের অফিস। জোহানেসবার্গের হেডকোয়ার্টার। তিনি অটোমোবাইলের শব্দ শুনতে পেলেন। কাগজগুলো নামিয়ে রাখলেন। জানালার দিকে হেঁটে গেলেন। বাইরের দিকে তাকালেন। দুটি পুলিশের গাড়ি এবং একটা ওয়াগন বাড়িটার সামনে এসে থেমেছে। কেটির চোখে মুখে বিস্ময়। দেখা গেল, জনাছয়েক ইউনিফর্ম পরা পুলিশ গাড়ি থেকে নেমে অত্যন্ত দ্রুত বাড়িটার মধ্যে ঢুকে পড়ছেন। তারা বাড়ির প্রবেশ পথের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। জানালার কাঁচে কেটির অবয়বের প্রতিফলন। হ্যাঁ, তিনি যথেষ্ট রূপবতী, বাবার হালকা ধূসর চোখের আদল পেয়েছেন, মায়ের যৌবন উচ্ছল শরীর।

অফিসের দরজাতে হাতের আওয়াজ।

–ভেতরে আসুন।

দরজা খুলে গেল। ইউনিফর্ম পরা দুজন পুলিশ ভেতরে ঢুকলেন। একজনের গায়ে সুপারিটেনডেন্টের পদক আঁটা আছে।

কী হয়েছে? কেটি রাগের স্বরে জানতে চাইলেন।

–এই সময় আপনাকে বিরক্ত করছি বলে দুঃখিত, মিস ম্যাকগ্রেগর। আমি হলাম সুপরিটেনডেন্ট কমিনসকি।

কী সমস্যা সুপারিটেনডেন্ট?

–আমরা একটা রিপোর্ট পেয়েছি জেল পালানো হত্যাকারী এই বাড়িতে একটু আগে ঢুকেছে।

কেটির চোখে মুখে আতঙ্ক- এই বাড়িতে?

-হ্যাঁ, ম্যাডাম, লোকটা সাংঘাতিক এবং সশস্ত্র।

কেটি উদ্বিগ্নচিত্তে বললেন– তাহলে? সুপারিটেনডেন্ট, এখনই তাকে ধরে নিয়ে যান।

-হ্যাঁ, সেটাই তো আমরা করতে চাইছি। মিস ম্যাকগ্রেগর। আপনি কি সন্দেহজনক কোনো কিছু দেখেছেন বা শুনেছেন?

না, আমি তো এখানে একা আছি, অনেক লুকোবার জায়গা আছে। অনুগ্রহ করে ভালোভাবে পরীক্ষা করুন।

-হ্যাঁ, আমরা কাজ শুরু করছি ম্যাডাম।

সূচিপত্র

সুপারিটেনডেন্ট তার অন্য সহকর্মীদের ডাকলেন। বললেন- তোমরা সবাই বাড়িটার নানা জায়গাতে চলে যাও। বেসমেন্ট থেকে শুরু করো। ছাদ অব্দি তন্নতন্ন করে খুঁজবে। কোনো অফিস কি তালাবন্ধ?

আমার মনে হয় দুই একটা ঘর বন্ধ আছে। আমি খুলে দিচ্ছি।

সুপারিটেনডেন্ট কমিনকসি বুঝতে পারলেন, কেটি খুবই ভয় পেয়েছেন। পাওয়াটাই স্বাভাবিক। যখন জানতে পারলেন যে, লোকটা সশস্ত্র, ভয়ের মাত্রা বেড়ে গেল।

কেটি রিপোর্টটা হাতে নিলেন, যেটার ওপর কাজ করছিলেন, কিন্তু মন দিতে পারছেন না। পুলিশ সমস্ত বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে। কেটির সমস্ত শরীরে শিহরণ। ওরা কি খুঁজে পাবে?

তন্নতন্ন করে খোঁজা হচ্ছে। প্রত্যেকটা লুকিয়ে থাকার সম্ভাব্য জায়গা। পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটে গেছে। সুপারিটেনডেন্ট কেটির ঘরে ফিরে এলেন।

এখনও খুঁজে পাইনি ম্যাডাম, কিন্তু ভয় পাবেন না যেন।

-আমি খুবই ভয় পেয়েছি, সুপারিটেনডেন্ট। কী বলছেন? জেল পালানো হত্যাকারী এখানে ঢুকে পড়েছে? অনুগ্রহ করে তাকে খুঁজে বের করুন।

–আমরা চেষ্টা করছি। আমাদের সঙ্গে প্রশিক্ষিত কুকুর আছে।

করিডর থেকে কুকুরের ডাক শোনা গেল। একটু বাদে বিরাট চেহারার একটা কুকুর ঢুকে পড়ল। হ্যাঁ, একটা নয়, দুটো, জার্মান শেফার্ড।

–এরা গোটা বাড়িতে ঘুরে বেড়াবে। দেখা যাক কী হয়?

সুপারিটেনডেন্ট আবার কেটির দিকে তাকালেন।

–এক ঘণ্টার মধ্যে আপনি কখনও ঘর ছেড়ে গেছেন কি?

–হ্যাঁ, আমি ফাইলরুমে গিয়েছিলাম। সেই সময়ের মধ্যে লোকটা কী....

কেটির কণ্ঠস্বরে আতঙ্ক- আবার ভালো করে দেখুন।

সুপারিটেনডেন্ট আবার ইঙ্গিত করলেন-কুকুর দুটো ঝাঁপিয়ে পড়ল। হ্যাঁ, এবার তাদের তল্লাশি শুরু হয়েছে।

কুকুর দুটো ভীষণ ক্ষুধার্ত। তারা একটা বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে চিৎকার করে ডাকতে শুরু করল।

কেটি চিৎকার করে বললেন– তাহলে? লোকটা ওখানে লুকিয়ে আছে?

সুপারিটেনডেন্ট তার বন্দুকটা বের করলেন- এটা খুলে ফেলো।

দুজন পুলিশ ছুটে এসে দরজার ওপর ধাক্কা দিল। দরজাটা খুলে গেল। ভেতরে কেউ নেই। হ্যাঁ, একটা কুকুর পায়ের নখ দিয়ে আঁচড়াতে শুরু করল।

–এই দরজাটা কোথায় গেছে?

–একটা ওয়াশরুমে।

দুজন পুলিশ তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। সেটাকেও ভোলা হল। ভেতরে কেউ নেই।

তার মানে, কুকুরটা কী বোকা বনে গেল।

সুপারিটেনডেন্ট বললেন– এরকম আচরণ কুকুররা কখনওই করবে না।

তখনও কুকুর দুটো মাটি আঁচড়াচ্ছে।

কোনো একটা রহস্যজনক ব্যাপার আছে। কিন্তু লোকটা কোথায়?

দুটো কুকুর কেটির ডেস্কের ড্রয়ারের কাছে চলে এল। তখনও চিৎকার করছে।

কেটি বলল- এটাই বোধহয় উত্তর। লোকটা আমার ড্রয়ারে লুকিয়ে আছে, তাই বলতে চাইছেন?

সুপারিটেনডেন্ট কমিনকসি একটু বিরক্ত হয়ে বললেন– আপনাকে বিবক্ত করার জন্য দুঃখিত, মিস ম্যাকগ্রেগর। তিনি বললেন, এই কুকুর দুটোকে এখান থেকে নিয়ে যাও।

-হ্যাঁ, আমরা যাচ্ছি। কিন্তু...

কেটি আবার বললেন আপনারা যাবেন না?

–মিস ম্যাকগ্রেগর, আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ। আমার লোকেরা এই বাড়ির সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। আমি বলছি, লোকটা এখানে নেই। এটা বোধহয় কোনো বাজে বিপদসংকেত। আমি ক্ষমা চাইছি।

কেটি আমতা আমতা করে বললেন আপনি আমার সন্ধ্যেটা নষ্ট করে দিলেন।

.

কেটি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। শেষ পুলিশের গাড়িটা চলে গেল। যখন তারা চলে গেল, তিনি ডেস্কের ড্রয়ারটা খুললেন। সেখান থেকে রক্তরঞ্জিত একজোড়া ক্যানভাসের জুতো বের করলেন– দুখানা জুতো নিয়ে হাসতে হাসতে একটা দরজার কাছে পৌঁছে গেলেন, সেখানে লেখা আছে- একান্ত ব্যক্তিগত। ভেতরে ঢুকলেন। ফাঁকা, তবে– দেওয়ালের সঙ্গে একটা সিন্দুক আটকানো আছে। এটা হল গুরুত্বপূর্ণ ঘর। এখানে কোম্পানির সমস্ত হিরেগুলো রেখে দেওয়া হয়। জাহাজে করে বাইরে পাঠাবার আগে। অত্যন্ত দ্রুত কেটি নির্দিষ্ট সংখ্যা ঘোরালেন। দরজাটা খুলে গেল। হ্যাঁ,

অনেকগুলো ধাতু নির্মিত সেফ ডিপোজিট বাক্স রয়েছে। ভল্টের মধ্যে। থরে থরে হিরে সাজানো আছে। আর এই ঘরের ভেতর অর্ধ অচেতন হয়ে পড়ে আছে বান্দা।

কেটি তার দিকে তাকিয়ে বললেন- ওরা চলে গেছে।

বান্দা ধীরে ধীরে চোখ খুলল। হাসার চেষ্টা করল। হ্যাঁ, আমি কী করে এখানে এসেছি, তুমি কি তা জানো?

কেটি বান্দাকে উঠে দাঁড়াবার জন্য সাহায্য করলেন। বান্দার সমস্ত শরীরে যন্ত্রণা।

জুতো পরতে পারবেন কি?

কেটি জুতো জোড়া হাতে দিলেন। এবার কেটি বললেন– এবার বাইরে বেরোতে হবে।

বান্দা মাথা নেড়ে বলল- আমি নিজেই যাব, যদি ওরা আমাকে ধরার চেষ্টা করে, তা হলে তুমি দূরে সরে যেও। আমার সমস্যাতে তুমি নিজেকে কেন জড়াবে?

ব্যাপারটা আমি দেখছি।

বান্দা শেষ বারের মতো ওই ভল্টের দিকে তাকাল।

কেটি জানতে চাইলেন কয়েকটা সঙ্গে রাখবেন? বান্দা কেটির দিকে তাকাল তোমার বাবা একবার আমাকে এই প্রস্তাব দিয়েছিল। অনেক দিন আগে।

কেটি বললেন আমি জানি।

না, টাকার আমার দরকার নেই। এই শহরটা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হবে।

–আপনি কী করে জোহানেসবার্গের বাইরে যাবেন?

–আমি একটা উপায় বের করেছি।

–আমার কথা শুনুন, পুলিশ সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। সব জায়গার ওপর তাদের সর্তক নজর আছে। আপনি এভাবে বিপদের মুখোমুখি হবেন না।

বান্দা শান্তভাবে বলল- তুমি অনেক করেছ।

কোনোরকমে জুতো পরে নিল। হ্যাঁ, ভাঙাচোড়া একটা মানুষ। তার শার্ট এবং জ্যাকেটে রক্তের দাগ। মাথায় চুলের ধূসরতা।

কেটি আবার তাকালেন- আহা, যখন কেটি ছোটো ছিল, তখন বান্দা ছিল পরিপূর্ণ যুবক।

বান্দা, ওরা যদি আপনাকে দেখে ফেলে, তাহলে মেরে ফেলবে। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

কেটি রোড ব্লকের কথা জানতেন। জোহানেসবার্গ থেকে বেরোবার সব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ পেট্রল দিচ্ছে। বান্দাকে যে করেই হোক ধরতে হবে, কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে– জীবিত বা মৃত অবস্থায়। রেল স্টেশনেও পুলিশের নজর।

–আমার মনে হয়, তোমার বাবার থেকেও আমি ভালো বুদ্ধি বের করতে পারব।

বান্দার কণ্ঠস্বরে দুর্বলতা। কেটি বুঝতে পারলেন, অনেকটা রক্ত ক্ষরণ হয়েছে।

কথা বলবেন না, শক্তি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করুন। সব কিছু আমার ওপর ছেড়ে দিন।

কেটি নিজের ওপরে অসম্ভব বিশ্বাস স্থাপন করলেন। তিনি জানেন বান্দার জীবন তিনি বাঁচাতে পারবেন।

আমি একটা গাড়ি ডাকতে যাচ্ছি। গাড়িটা সরু গলি দিয়ে বেরিয়ে যাবে। দশ মিনিট সময় দিন। তারপর বাইরে আসবেন। আমি পেছনের দরজায় থাকব। গাড়ির মধ্যে শুয়ে থাকবেন। যাতে কেউ দেখতে না পায়। আপনার গায়ে একটা কম্বল চাপা দেব।

-কেটি, তুমি কি জানো, সব কটা গাড়ি তন্ন তন্ন করে খোঁজা হবে?

–আমরা তো অটোমোবাইলে চড়ব না। কেপটাউন থেকে সকাল আটটায় একটা ট্রেন ছাড়বে। আমি আমার নিজস্ব গাড়িটি তার সঙ্গে জুড়ে দেব।

–সে কী? তুমি তোমার নিজস্ব গাড়ি করে আমাকে নিয়ে যাবে?

–হ্যাঁ, তাই করব।

বান্দা যন্ত্রণার মধ্যেও হাসার চেষ্টা করল তোমরা সত্যি দারুণ কাজ করতে পারো।

***

তিরিশ মিনিট কেটে গেছে। কেটি গাড়ি চালিয়ে রেলরোড ইয়ার্ডের কাছে পৌঁছে গেছেন। বান্দাকে ব্যাকসিটের নীচে ফেলে দেওয়া হয়েছে। গায়ের ওপর কম্বল চাপা দেওয়া। রোড ক্রশ পার হতে কোনো অসুবিধা হয়নি। এবার কেটির গাড়ি ট্রেন ইয়ার্ডের কাছে এসে পড়েছে। হ্যাঁ, কেটি দেখতে পেলেন, কয়েকজন পুলিশ সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। একটা পরিচিত মূর্তি ভেসে উঠল।

সুপারিটেনডেন্ট কমিনসকি?

উনি অবাক হয়ে গেছেন মিস ম্যাকগ্রেগর? আপনি কোথায় চলেছেন?

কেটি অত্যন্ত দ্রুত হেসে বললেন আমি কি এক দুর্বলচিত্তের মেয়ে নাকি সুপারিটেনডেন্ট? সত্যি কথা বলব? আমার অফিসে যে ঘটনাটা ঘটেছে, সেটা আমার বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে দিয়েছে। আমি এই শহর ছেড়ে চলে যেতে চাইছি। খুনিটা ধরা পড়লে ফিরে আসব। ওকে কি পাওয়া গেছে?

না, ম্যাডাম, আমরা চেষ্টা করছি। আমরা সমস্ত জায়গাতে সতর্ক নজর রেখেছি। লোকটা পালাবার চেষ্টা করলে তাকে ধরে ফেলব।

-হ্যাঁ, তাই করুন।

–আপনি কোথায় যাবেন?

–আমার রেলওয়ে কামরাটা ওখানেই আছে। আমি কেপটাউনে যাব।

–আমরা কাউকে দেব কি?

না, ধন্যবাদ সুপারিটেনডেন্ট। দরকার লাগবে না। আমি জানি, আপনি যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন। কিন্তু আমি একাই পারব। আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।

পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। কেটি এবং বান্দা প্রাইভেট কামরার মধ্যে পৌঁছে গেছেন। এর দেয়ালের রং কুচকুচে কালো।

–অন্ধকার রঙের জন্য দুঃখিত। কেটি বললেন। আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাইছি না।

বান্দাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। কেটি বললেন- এখানে শুয়ে থাকার চেষ্টা করুন। কেউ এলে ওয়াশরুমে ঢুকে যাবেন।

বান্দা বলল- ধন্যবাদ।

কেটি গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে বসে থাকলেন। তারপর বললেন–কেপটাউনে গিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। আমি অবশ্য আপনার সঙ্গে থাকব।

বান্দা অবাক তার মানে?

আপনি কি একা একা যাবেন নাকি?

বান্দা মাথা নেড়ে বলল- হা, তুমি দেখছি তোমার বাবার মতো।

***

সকাল হতে আর বেশি দেরি নেই। একটা ইঞ্জিন এসে প্রাইভেট কামরাটাকে মূল গাড়ির সঙ্গে জুড়তে শুরু করে দিয়েছে। এই গাড়িটা এবার কেপটাউনের উদ্দেশ্যে যাত্রা কররে।

সকাল আটটা। কেটি বান্দার দিকে তাকালেন, গল্পটা শুনতে হবে– গতকাল রাত থেকে বান্দার সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়নি।

বান্দা কেটির দিকে তাকাল– কোথা থেকে শুরু করব? কীভাবে? তাও বুঝতে পারছি না। বান্টুদের তাদের পৈত্রিক ভূমিখণ্ড থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে। সেখান থেকে শুরু করলে কেমন হয়? নাকি পল ক্রুগারের কথা বলব, ট্রানভালের প্রেসিডেন্ট। দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেন্টে যিনি ভাষণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- আমরা সমস্ত কালো মানুষদের ওপর আমাদের প্রভুত্ব কয়েম করব। তারা চিরদিন ক্রীতদাস হয়ে বেঁচে থাকবে।

নাকি গল্পটা অন্য কোনোভাবে শুরু হতে পারে? সিসিল রোডসের সেই উচ্চাশা? যার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আফ্রিকা শুধুমাত্র সাদাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

বান্দা শেষ পর্যন্ত বলল– পুলিশ আমার ছেলেকে হত্যা করেছে।

গল্পের মধ্যে অনেক দুঃখজনক উপাদান। বান্দার বড়ো ছেলে একটা রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। পুলিশ সেটা ভেঙে দেবার জন্য চেষ্টা করে। এলোপাথারি গুলি

চালাতে থাকে। দাঙ্গা বেধে যায়। ছেলেটাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরের দিন সকালে তাকে তার কারাকক্ষে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়।

পুলিশ বলছে, এটা আত্মহত্যার ঘটনা। কিন্তু আমি জানি, এটা হল ঠাণ্ডা মাথায় খুন।

কেটি নিঃশ্বাস বন্ধ করে বললেন- হায় ঈশ্বর, ও তো একটা বাচ্চা ছেলে। হ্যাঁ, তারা একসঙ্গে কতদিন খেলেছেন। একসঙ্গে মিশেছেন। ছেলেটাকে দেখতে খুবই সুন্দর ছিল।

কেটি আবার বললেন আমি অত্যন্ত দুঃখিত বান্দা। তারপর কী হয়েছে বলুন?

–তাকে খুন করার পর আমি রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। আমাকে প্রতিশোধ নিতে হবে। কেটি, আমি চুপচাপ বসে থাকতে পারি না। পুলিশ আমাকে শত্রু বলে ঘোষণা করল। তারা একটা ডাকাতির অপরাধে আমাকে গ্রেপ্তার করল, যে ডাকাতি আমি কখনও করিনি। আমাকে কুড়ি বছরের জেল দিল। তারপর আমি তক্কে তক্কে ছিলাম। একটা গার্ডকে গুলি করে মেরে ফেলা হল। তারা আমাকে দোষ দিল। আমি কিন্তু কোনোদিন বন্দুক ব্যবহার করিনি।

–আমি জানি, কেটি বললেন, কিন্তু আপনাকে লুকিয়ে রাখতে হবে, নিরাপদে এবং ভালোভাবে।

–এই ব্যাপারে তোমাকে জড়িয়ে ফেলা হল। আমি খুবই দুঃখিত।

না, আমি তো নিজেই এ ব্যাপারে জড়িয়েছি। আসলে আপনি আমার বড়ো বন্ধু।

বান্দা হাসল- এই প্রথম একজন শ্বেতাঙ্গিনী আমার সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলছে। তোমার বাবা, বান্দা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তুমি কি সত্যি আমাকে কেপটাউনে নিয়ে যাবে?

–আমরা কি কেপটাউনে যাব না?

–হ্যাঁ, যেতে পারি, নাও পারি।

–আমি একজন মহিলা, যখন তখন আমার মনোভাব পরিবর্তন করব।

মধ্যরাত, ট্রেনটা একটা স্টেশনে এসে থেমেছে। কেটি তার নিজস্ব কামরাটাকে কেটে দেবার চেষ্টা করলেন। হ্যাঁ, এটাকে সাইডিং-এ রাখা হল। সকালবেলা কেটির ঘুম ভেঙে গেছে। তিনি বান্দার খাটের দিকে তাকালেন। খাটটা ফাঁকা। বান্দা চলে গেছে। হ্যাঁ, বান্দা বোধহয় আর সমঝোতা করতে চাইছে না। কেটির দুঃখ হল। কিন্তু কেটি জানেন, বান্দা এখন নিরাপদেই আছেন। তার অনেক বন্ধু আছে। কেটি ভাবলেন, ডেভিডের কাছে এই কথা বললে কেমন হয়?

***

ডেভিড চিৎকার করে বলেছে তুমি এত বোকামোর কাজ করলে কেন?

কেটি জোহানেসবার্গে ফিরে এসে সব কথা বললেন।

তুমি নিজের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করলে। এমন কাজ কি করতে আছে? যদি পুলিশ বান্দাকে এখানে খুঁজে পেত, তাহলে তোমাকে নিয়ে তারা ছেলেখেলা করত।

কেটি শান্তভাবে বললেন- হ্যাঁ, তারা বান্দাকে মেরে ফেলত।

ডেভিড হতাশ হয়ে মাথা নেড়ে বললেন- তুমি কি কিছুই বুঝতে পারছ না?

–হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু...

কেটির চোখে আগুন জ্বলছে।

তুমি এখনও ছোট্ট মেয়ে রয়ে গেলে।

কেটি হাত তুলে আঘাত করার চেষ্টা করলেন। ডেভিড সেই হাত ধরে ফেলেছেন কেটি, নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করো।

অনেক দিন আগে, তখন কেটির বয়স মাত্র চারবছর একটা ছেলে তার পেছনে লাগত। যখন ডেভিড আসত ছেলেটা পালিয়ে যেত। কেটি ছেলেটাকে ধরবার চেষ্টা করত।

ডেভিড বলত- কেটি, তোমাকে শিখতে হবে। কী করে রাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। মেয়েরা কখনও মারামারি করে না।

কেটি বলত– আমি কি একটা ছোট্ট মেয়ে নাকি?

এভাবেই সময় কেটে যেত।

কেটি তার রাগ সংবরণ করলেন।

ডেভিড বললেন- তুমি এখন কী করবে?

কেটি চুপচাপ বসে থাকলেন। কী করা যায়? ডেভিডের সাথে বন্ধুত্ব এবং সাহচর্য? ডেভিডের সবকিছুই তার ভালো লাগে। ডেভিড হল এই পৃথিবীতে একমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, যে কেটির সবকিছু বুঝতে পারে। যখন ডেভিড শহরে থাকে, সে কেটির সঙ্গে সময় কাটায়। বিনোদনের মুহূর্ত, জেমি একবার ডেভিডকে তার অভিযানের কথা বলেছিল। এখন সেই গল্প ডেভিড কেটিকে বলে থাকে।

–ওই নৌকোটার কথা বলো?

ডেভিড সব কিছু বলে।

–ওই হাঙরগুলোর কথা বলো, সামুদ্রিক ঝড়?

কেটি মায়ের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না, মার্গারেট এখন ক্রুগার বেন্ট লিমিটেড নিয়ে খুবই ব্যস্ত।

মার্গারেট প্রত্যেক রাতে জেমির সঙ্গে কথা বলেন। হ্যাঁ, ঘুমোতে যাবার আগে হয়তো। বলেন- ডেভিড আমাকে খুবই সাহায্য করছে জেমি, সে সবসময় কেটির চারপাশে থাকে। কেটি জানে না, শেষ পর্যন্ত কী হবে।

তিনি মাকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেন, কোনো ব্যাপারে তিনি মায়ের সাথে একমত হতে পারেন না। না, ড্যানসিং ক্লাসে যেতে কেটির মোটেই ইচ্ছে করে না। মনে হয়, সময়টা যদি রাগবি খেলে কেটে যেত তাহলেই ভালো হত।

রাস্তার ছেলেদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত কেটি স্কুলে যাওয়া শুরু করল। দুষ্টুমিতে রেকর্ড করে বসল। মার্গারেটকে হেডমিসট্রেস ডেকে পাঠালেন। প্রতি মাসে একবার করে। আহা, কেটিকে স্কুলে রেখে দেওয়া হল।

–আমি ওকে বুঝতে পারছি না মিসেস ম্যাকগ্রেগর। হেড মিসট্রেস বলেছিলেন, মেয়েটা বুদ্ধিমতী, কিন্তু এমন দুষ্টুমি করে কেন?

মার্গারেট এই প্রশ্নের উত্তর জানতেন না।

***

ডেভিডের কাছে কেটি শান্ত এবং জব্দ হত। একবার ডেভিড এসে বললেন– তোমাকে আজ বিকেলে একটা জন্মদিনের পার্টিতে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, তাই তো?

-আমি ওসব পার্টিতে যেতে ভালোবাসি না।

ডেভিড কেটির দিকে তাকিয়ে বললেন– আমি জানি কেটি, তুমি ভালোবাসো, আসলে যে মেয়েটার জন্মদিন তার বাবা আমার এক বন্ধু। তুমি না গেলে খারাপ লাগবে।

কেটি তাকিয়ে বলেছিল- তাহলে আমায় যেতেই হবে?

এইভাবে কেটির মনোভাবে অনেক পরিবর্তন হল। দেখা গেল ডেভিডকে সে ভালোভাবেই মেনে চলেছে।

***

যখন কেটির বয়স দশ বছর, একদিন ডেভিডকে বলেছিল– আমি বান্দার সঙ্গে দেখা করব।

ডেভিড অবাক– এটা সম্ভব নয়, কেটি। বান্দা অনেক দূরে থাকে।

–তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে ডেভিড? নাকি আমি একা চলে যাব।

পরের সপ্তাহে ডেভিড কেটিকে নিয়ে বান্দার ফার্মে গিয়েছিল। ভারি সুন্দর জায়গা। শান্ত এবং নিঃশব্দ। সেখানে বান্দা গম ফলায়। মেষ পালন করে এবং উটপাখি পুষেছে। সেখানকার ব্যবস্থা খুবই সুন্দর। ছোটো ছোটো কুটির। শুকনো মাটি দিয়ে তৈরি। জীবনযাত্রার মধ্যে একটা সরলতা আছে।

বান্দা ডেভিডের পাশে ওই গম্ভীর মুখের কেটিকে দেখে বলেছিল- তুমি জেমি ম্যাকগ্রেগরের মেয়ে, তাই তো?

তুমি বোধহয় বান্দা, কেটি শান্তভাবে বলেছিল, তুমি আমার বাবার জীবন বাঁচিয়েছিলে, তাই তোমাকে আমি ধন্যবাদ দিতে এসেছি।

বান্দা হেসে বলেছিল- হ্যাঁ, তোমাকে কে এই গল্প বলেছে? এসো, আমার পরিবারের সকলের সঙ্গে পরিচিত হও।

বান্দার বউ দেখতে খুব সুন্দরী। বান্টু জাতের এক রমণী। তার নাম নাটামা। বান্দার দুটো ছেলে আছে- বড়োটা কেটির থেকে বছর সাতেকের বড়ো, ছোটোটা অতটা বড়ো নয়।

বড়ো ছেলেকে দেখলে বান্দার কথাই মনে পড়ে যায়।

কেটি সমস্ত বিকেলটা দুটো ছেলের সঙ্গে গল্প করে, খেলে কাটিয়ে দিয়েছে। তারা কিচেনে বসে খাওয়া দাওয়া করল। ডেভিড এখানে থাকতে পারছে না। কালো পরিবারের সাথে মিশতে পারছে না। সে বান্দাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। কিন্তু এই সমাজের সাথে মিশবে কী করে?

ডেভিড আবার বান্দার রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। বান্দা নাকি জন। টেঙ্গোর একজন অনুগামী। ওই ভদ্রলোক সামাজিক পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করছেন। খনির যাঁরা মালিক তারা ওই কালোলোককে খারাপ চোখে দেখেন। সরকার কালো লোকদের দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। সরকার বলেছে, সব কালো লোকের ওপর দশ শিলিং করে কর ধার্য করা হবে। যারা শ্রমিক হিসেবে কাজ করে না, তাদেরই এই করের আওতায় আনা হবে। সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকাতে মারাত্মক জাতি দাঙ্গা লেগে গেছে।

সন্ধ্যে হব-হব। ডেভিড বলল- এবার চলো, বাড়ির দিকে যাত্রা করি। কিন্তু অনেকটা পথ ঘোড়ার পিঠে করে যেতে হবে।

–এখন নয়, কেটি বান্দার দিকে তাকিয়ে বলল– ওই হাঙরের গল্প বলো।

মাঝে মধ্যে ডেভিড কেটিকে নিয়ে বান্দার সাথে দেখা করতে যায়। ধীরে ধীরে বান্দার সাথে তাদের বন্ধুত্ব দৃঢ় হয়ে উঠল।

***

দিন কাটছে, কেটির ছেলেমানুষি কিছুতেই কাটছে না। দিনে দিনে সে আরও উদাসীন এবং অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। সে কোনো কাজে অংশ নিচ্ছে না। তার বয়সী মেয়েরা কত শান্ত স্বাভাবিক। সে খনিতে যেতে ভালোবাসে, শিকারে যায়, মাছ ধরে, ক্যাম্পে শুয়ে থাকে–এই জীবনটাকে কেটি খুব ভালোবেসে ফেলেছে।

একদিন কেটি এবং ডেভিড ভাল নদীতে মাছ ধরছিল। কেটি একটা মস্ত বড়ো ক্রাউট ধরে ফেলল। ডেভিড কিছুই ধরতে পারেনি।

ডেভিড বলল- তোমার ছেলে হয়ে জন্মানো উচিত ছিল।

কেটি রেগে গিয়ে বলল- ডেভিড, তা হলে আমি কি তোমাকে বিয়ে করতে পারতাম?

ডেভিড হাসল।

–আমরা বিয়ে করব, তুমি কি জানো ডেভিড?

–আমার ভয় হচ্ছে কেটি, তোমার থেকে আমি বাইশ বছরের বড়ো, তোমার বাবার বয়সী। তুমি একদিন একটা ছোট্ট ছেলের সন্ধান পাবে। দারুণ সুন্দর দেখতে এক যুবক।

–আমার ছোটো ছেলের দরকার নেই। আমি তোমাকে চাই।

–তুমি কি এ ব্যাপারে সত্যি মত ঠিক করেছ? তাহলে আমি বলব, একজন মানুষের হৃদয় কোথায় থাকে বলো তো?

–আমাকে বলো।

পেটের মধ্যে। এসো, ওই ক্রাউট মাছটাকে পরিষ্কার করো। ওটা দিয়ে আজ দুপুরে লাঞ্চ সারা যাবে।

***

কেটির মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, একদিন সে ডেভিড ব্ল্যাকওয়েলকে বিয়ে করবে। কারণ এই পৃথিবীতে ডেভিডের মতো আর কোনো পুরুষের সন্ধান সে কখনও পাবে না।

প্রতি সপ্তাহ মার্গারেট ডেভিডকে একদিন ডিনারে আমন্ত্রণ জানান। নিয়মানুসারে কেটি ডিনারের আসরে প্রধান স্থান নিয়ে থাকে। প্রত্যেক শুক্রবার যখন ডেভিড আসে, কেটিকে ডাইনিং রুমে দেখা যায়। অথচ অন্য দিন সে রাতের খাবারের সময় আশেপাশে

থাকে না। ডেভিড সাধারণত একলা আসে। মাঝে মধ্যে কোনো একজন মহিলাকে নিয়ে আসে, কেটি সঙ্গে সঙ্গে সেই মেয়েটিকে অপছন্দ করতে শুরু করে।

কেটি একদিন ডেভিডকে একলা পেয়ে বলেছিল– আমার সামনে ওই স্বর্ণকেশিনীদের কখনও আনবে না। অথবা কোনো সময় বলেছিল- ওরা কী বিচ্ছিরি পোশাক পরে।

ওই মেয়েরা কি মাদাম অ্যাগনেসের ভাড়া করা মেয়ে?

***

কেটির বয়স তখন চোদ্দো। হেডমিসট্রেস মার্গারেটকে ডেকে বললেন- মিসেস ম্যাকগ্রেগর, আমি একটা অভিজাত স্কুল চালাই। কেটি থাকলে আমার স্কুলের অবস্থা খারাপ হবে।

-ও এখন কী করছে?

–ও অন্য ছেলেমেয়েদের এমন ভাষা শেখাচ্ছে, যা আমরা বাপের জন্মে শিখিনি। মিসেস ম্যাকগ্রেগর, ওসব শব্দ ও কোথা থেকে শিখেছে?

মার্গারেটের মুখ অবাক হয়ে গেছে। কেটি তার রাস্তার বন্ধুদের কাছ থেকে এই ভাষাগুলো শিখছে। হ্যাঁ, মার্গারেট চিন্তা করলেন, এবার ওই খেলার অবসান ঘটাতে হবে।

হেডমিসট্রেস বললেন- আপনি এখনই ওর সঙ্গে কথা বলুন। আমরা শেষ সুযোগ দেব।

-না, আমি একটা অন্য জিনিস চিন্তা করছি। আমি কেটিকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেব।

মার্গারেট ডেভিডকে তার পবিকল্পনার কথা বলেছিলেন।

ডেভিড বলেছিল না, একাজ কখনও করা উচিত নয়।

-আমি থাকতে পারছি না। হেডমিসট্রেস আজকে অভিযোগ করছেন, কালকে অন্য কেউ করবে। আমার মেয়েটার কী হয়েছে? ও তো ছেলেদের জীবনযাপন করতে চাইছে। না, ডেভিড, আমি ওর মনোভাব বুঝতে পারছি না।

–ও কিন্তু খুবই চালাক এবং বুদ্ধিমতী।

না, ওকে স্কুল থেকে আমি ছাড়িয়ে আনব।

কেটি সেদিন বিকেলবেলা বাড়ি ফিরেছে, মার্গারেট রাগে ফেটে পড়লেন।

কেটি রেগে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল- তুমি আমাকে নিয়ে কী করতে চাও?

-হ্যাঁ, আমি তোমার ভালোর জন্যই বলছি।

–আমি এখান থেকে চলে যাই। আমার সব বন্ধুরা এখানে আছে, তুমি আমাকে আমার বন্ধুদের কাছ থেকে আলাদা করতে চাইছ?

–হ্যাঁ, তুমি যদি আমার কথা না শোনো, তাহলে তাই হবে।

তারা রাস্তার ছেলে নয়, তারা ভালো পরিবারের ছেলে।

আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। তুমি একটা বোর্ডিং স্কুলে চলে যাবে। এটাই আমার শেষ সিদ্ধান্ত।

–তাহলে আমি আত্মহত্যা করব, কেটি প্রতিজ্ঞা করেছিল।

–তাই করো। ওপরে অনেকগুলো বেড আছে, যাও, গলায় ব্লেড চালিয়ে দাও। অথবা দেখো, এখানে কোথাও বিষ পাওয়া যায় কিনা।

কেটি কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল- মা, তুমি একাজ কখনও করতে পারো না।

মা মেয়েকে আদর করে বললেন- তোকে আমি কত ভালোবাসি, সেটা জানিস? তুই কদিন বাদে এক কিশোরী কন্যায় রূপান্তরিত হবি। তোর বিয়ে দিতে হবে। এমন মেয়েকে কে বিয়ে করবে?

-এটা সত্যি নয়, কেটি বলেছিল, ডেভিড এ ব্যাপারে কিছুই মনে করে না।

এর মধ্যে ডেভিড এল কোথা থেকে?

–আমরা বিয়ে করতে চলেছি।

মার্গারেট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মিসেস ট্যালিকে বলিস, তোর জিনিসপত্র গুছিয়ে দিতে।

–মার্গারেট ঠিক করলেন কেটিকে চেলটেনহ্যামে পাঠাবেন। ওখানে অনেকগুলো ভালো ইংলিশ বোর্ডিং স্কুল আছে। সেখানে শুধু মেয়েরাই পড়াশোনা করতে পারে। গ্লসটারশায়ারে। এটাই কেটির পক্ষে সবথেকে ভালো স্কুল। এখানে সাংঘাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। নিয়ম শৃঙ্খলার কঠিন অনুশাসন মেনে চলা হয়, মস্ত বড়ড়া বাগানের মধ্যে স্কুলটা অবস্থিত।

এখানকার হেডমিসট্রেস মিসেস কিয়েটন। তার স্বামীর সাথে ডেভিড ব্যবসা করে। কেটিকে ভরতি করতে কোনো অসুবিধা হবে না।

কেটি যখন এই কথা শুনল, তখন সে আগুনের মতো বিস্ফোরিত হয়ে উঠল। আমি ওই স্কুল সম্পর্কে সব কথা শুনেছি। না, আমি ওখানে যাব না। তুমি কী ভেবেছ?

-হ্যাঁ, তোমাকে সহবত শিখতে হবে। মার্গারেট বলেছিলেন।

আমি সহবত শিখব না। আমার মাথা খুব পরিষ্কার।

–শোনো, শুধু মাথা দিয়ে তুমি ভালো কাজ করতে পারবে না। তুমি কি মদ্দা ছেলে হবে নাকি?

না, আমি মেয়ে হতে চাই না, এভাবে মেয়ে হয়ে বেঁচে থেকে কী লাভ? তোমরা কেন আমাকে একা ছেড়ে দিচ্ছে না।

–কেটি, ভবিষ্যতে আর কখনও এই ভাষা ব্যবহার করবে না।

কেটিকে এবার সত্যি যেতে হবে।

ডেভিড লন্ডনে, যাবে ব্যবসার কাজে। একদিন মার্গারেট জিজ্ঞাসা করলেন কেটিকে স্কুলে পৌঁছে দিতে হবে। আমি জানি না, সেখানে ও কেমন থাকবে।

ডেভিড বলল- এ বিষয়ে কোনো চিন্তা করবেন না।

–হ্যাঁ, চিংকার করে কেটি বলতে থাকে, আমাকে এভাবে অন্য জায়গায় ঠেলে দিও না। ওখানে আমি মরে যাব!

***

প্রাইভেট রেলওয়ে গাড়ি। ক্লিপড্রিফট থেকে কেপটাউনের দিকে চলেছে। সেখান থেকে সাউদম্পটন। জাহাজে চড়ে। এই অভিযানটা মোটেই ভালো ছিল না। চার সপ্তাহ সময় লেগেছিল। কেটির সমস্ত অহংকার ধুলোয় মিশে গেল। কিন্তু ডেভিডের সাথে এতক্ষণ থাকতে পারছে, এতেই তার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তার কাছে এটা একটা আগাম মধুচন্দ্রিমা। সে ভাবল, আহা, আমাদের মধ্যে এখনও বিয়ে হয়নি। তাতে কী?

জাহাজে ডেভিড অনেক গল্প বলত। কেটি অবাক হয়ে শুনত। মাঝে মধ্যে ডেভিডের দিকে তাকিয়ে থাকত।

একদিন কেটি প্রশ্ন করল– ডেভিড, তুমি কি আমাকে ভুলে যাবে?

ডেভিড বলল না, তোমাকে আমি ভুলতে পারি? এসো, তোমাকে আর একটা গল্প শোনাব।

কী গল্প?

–এই গল্পগুলো তুমি একদিন বলবে, তুমি সেইসব কোম্পানির গল্প বলবে, যেগুলো আরও বড়ো হয়ে উঠছে। তুমি আমাদের কোম্পানির কথাও জানতে পারবে। তোমার এই কোম্পানিটার অন্তরালে তোমার বাবার অবদান আছে।

-আমি কি আমার বাবার মতো?

–হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রে, তারই মতো সাহসী হয়েছ। তারই মতো স্বাধীনচেতা মনোভাব।

–হ্যাঁ, আমি কি সত্যি সত্যি সাহসী?

তুমি একটা উচ্ছন্নে যাওয়া মেয়ে। যে লোকটা তোমাকে বিয়ে করবে, তার সারা জীবন শেষ হয়ে যাবে।

কেটি মনে হাসল। হায় হতভাগ্য ডেভিড, তোমার জন্য আমার করুণা হচ্ছে।

***

ডাইনিং রুম। এই সমুদ্রযাত্রার শেষ রাত।

ডেভিড জিজ্ঞাসা করল– তোমাকে আমি মোটেই বুঝতে পারি না কেটি।

–সত্যি কি?

–তুমি কেন তোমার মায়ের সাথে এমন ব্যবহার করো?

সত্যি কি?

ডেভিডের মুখ লাল হয়েছে তোমাকে আমি কবে বুঝব?

একদিন আমাকে বুঝতে পারবে।

–তুমি কেন তোমার বয়সী মেয়েদের মতো নও?

–ওই রকম হতে হলে আমি মরে যাব। তুমি কি সত্যি সত্যি অন্য কাউকে ভালোবাসো?

–ঠিক জানি না।

–তুমি অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। কিছুদিন সময় দাও। আমি আর একটু বড়ো হই। আমি খুব তাড়াতাড়ি বড়ো হব। আমি প্রতিজ্ঞা করছি। আমি অন্য কাউকে সহ্য করতে পারব না, ডেভিড!

কেটির আচরণের মধ্যে এমন একটা আবেগ, ডেভিড অবাক হল। ডেভিড কেটির হাতে হাত রেখে বলল– কেটি, যখন আমার বিয়ে হবে, যদি আমার বিয়ে হত। তাহলে তোমার বয়সী আমার মেয়ে থাকত, সেটা কি ভেবে দেখেছ?

কেটি উঠে দাঁড়াল। এমন একটা শব্দের কথা বলল, মনে হল এক্ষুনি বোধহয় বিপর্যয় ঘটে যাবে। সে চিৎকার করে বলল- ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল, তুমি এক্ষুনি আমার চোখের সামনে থেকে নরকের অন্ধকারে চলে যাও।

ডাইনিং রুমে বসে থাকা সকলে অবাক চোখে কেটির দিকে তাকিয়ে ছিল।

***

লন্ডনে তারা তিনদিন ছিল। কেটি প্রত্যেকটা মুহূর্তকে ভালোবেসেছে।

ডেভিড বলল- আমি টিকিট কেটেছি, থিয়েটারের জন্য।

ধন্যবাদ ডেভিড, আমি দেখব।

-হ্যাঁ, এই থিয়েটার তোমার জন্য নয়।

–কেন?

তারপর তারা থিয়েটার দেখতে গেল।

তারপর তারা থিয়েটার দেখতে গেল।

লন্ডন শহরটা কেটির খুব ভালো লেগেছে। মনোমোটর গাড়ি আছে, গ্যারেজ আছে, মহিলারা সুন্দর পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রেসের পোশাক। কত সুন্দর গয়না। আহা, মানুষরা সুপুরুষ। তাদের পোশাকের বাহার দেখার মতো। কেটিরা রিজে ডিনার খেল, স্যাভয়তে সাপার সারল। তারপর ডেভিডকে যেতে হবে। কেটি ভাবল, আমরা এখানে আবার আসব, আমি আর ডেভিড, একসঙ্গে।

***

চেলটেনহ্যাম মিসেস কিয়োটনের অফিস।

ডেভিড বলল- কেটিকে আপনি নিয়েছেন, এ জন্য ধন্যবাদ।

–এখানকার জীবনটা ওর ভালোই লাগবে। আর আমার স্বামীর বন্ধুকে সাহায্য করতে পারলাম, এতে আমি কৃতার্থ।

কেটি জানত না, তাকে প্রতারিত করা হল। হা, ডেভিড আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

কেটি ভীষণ রেগে গেল। সে ডেভিডকে গুডবাই পর্যন্ত বলেনি।

.

১৩.

চেলটেনহ্যাম স্কুলটা অসহনীয়। এখানকার নিয়মনীতি খুবই কড়া। মেয়েদের একই ধরনের ইউনিফর্ম পরতে হয়। একই ধরনের নিকার। দশ ঘণ্টা ধরে স্কুলের ক্লাস চলে। প্রত্যেকটা মুহূর্ত আগে থেকে হিসেব করে বাধা। মিসেস কিয়োটন এ ব্যাপারে খুবই কঠিন। তিনি হাতে একটা লোহার দণ্ড নিয়ে ঘুরে বেড়ান। মেয়েদের শিখতে হয় সহবত এবং শৃঙ্খলা। সাংসারিক কাজের পাশাপাশি আরও অনেক কিছু, যাতে একদিন তারা সুগৃহিনী হয়ে ওঠে।

— কেটি মাকে লিখেছিল– আমি একটা রক্তাক্ত বন্দিশালায় বন্দিনী হয়েছি। মেয়েগুলো ভয়ংকর। তারা বিচ্ছিরি পোশাক পরে। তারা ছেলেদের সম্পর্কে নানা কথা বলে। মাস্টাররাও হয়েছে সাংঘাতিক। আমি এখানে থাকব না, আমি একদিন পালিয়ে যাব।

কেটি কয়েকবার স্কুল থেকে পালাবার চেষ্টা করেছে। অন্তত তিনবার। প্রত্যেকবার সে ধরা পড়েছে। তাকে ধরে আনা হয়েছে। সে এর জন্য অনুতাপ প্রকাশ করেনি।

একবার কেটির নাম ভোলা হল সাপ্তাহিক মিটিং-এ। একজন শিক্ষক বললেন এই মেয়েকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব নয়। তাকে দক্ষিণ আফ্রিকাতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

মিসেস কিয়োটন বলেছিলেন– আপনার কথার সত্যতা আমি উপলব্ধি করতে পারছি। কিন্তু এটাকে আমরা চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখব। যদি আমরা কেটি ম্যাকগ্রেগরকে সুশিক্ষিত করে তুলতে পারি, তাহলে ভবিষ্যতে সে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে।

তার মানে কেটিকে বোর্ডিং স্কুলে থাকতে হল।

***

কেটি ফার্মের ব্যাপারে আগ্রহী। এটা সকলকে অবাক করে দিয়েছে। এই বাগানে অনেক কিছু তৈরি হয়। শুধু সবজি নয়, তার পাশাপাশি মুরগি উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। গোরুর খামার, শুয়োরদের থাকার জায়গা, ঘোড়াদের আস্তাবল। কেটি বেশিরভাগ সময় এখানে কাটায়। যখন মিসেস কিয়োটন এই খবরটা শুনলেন। তিনি খুবই খুশি হয়েছিলেন।

হেডমিস্ট্রেস তার সহকর্মীদের ডেকে বললেন- দেখো, ধৈর্য ধরে কাজ করলে কত কিছু হয়। কেটি শেষ পর্যন্ত জীবনের আসল মানে খুঁজে পেয়েছে। একদিন সে এক মস্ত বড়ো জমিদারকে বিয়ে করবে। তার কাজে সাহায্য করবে।

পরের দিন সকালবেলা এই খামারের মালিক অসকার ডেনকার হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বললেন- আপনার একজন ছাত্রী কেটি ম্যাকগ্রেগর, ওকে আমার ফার্ম থেকে এখনই দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

-কেন? কী হয়েছে? মিসেস কিয়োটন জিজ্ঞাসা করলেন–ও তো খারাপ মেয়ে নয়।

না, কিন্তু সে কীসে আগ্রহী তা জানেন কি? সে জন্তু-জানোয়ারদের সাথে বিচ্ছিরি ব্যবহার করে।

ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে গেছেন তা হলে? আবার কথা বলতে হবে।

***

কেটি এখন অনেক কিছু ভুলে গেছে। সে এটাকে ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছে। তার মুখ সবসময় ভার হয়ে থাকে। কী আশ্চর্য, যাকে সে সবথেকে বেশি ভালোবাসে, তাকেই ঘৃণা করে। সে একটা একটা করে দিন গুনতে থাকে, কতদিন ডেভিডের সঙ্গে দেখা হয়নি। আহা, কবে আমি এই বন্দিশালা থেকে মুক্তি পাব।

চোখ বন্ধ করলে আর একটা বিচ্ছিরি ছবি ভেসে ওঠে কেটির মনের পর্দায় আমি নেই, ডেভিড কি অন্য কোনো মেয়েকে ভালোভাসছে? যদি তাই করে, তা হলে দুজনকে আমি মেরে ফেলব, হ্যাঁ, তার জন্য ফাঁসি হলেও আমি কিছু মনে করব না।

ডেভিডের কাছ থেকে একটা ছোট্ট চিঠি এসেছে ডেভিড লন্ডনে আসছে, কেটির সঙ্গে দেখা করবে। কেটির কল্পনা আরও জ্বলে উঠল। হ্যাঁ, অনেকগুলো লুকোনো খবর আছে ওই চিঠির মধ্যে। লন্ডনে ও কেন আসছে? আমার কাছে কেন? শুধু কি আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য? নাকি সেই খবরটা দেবে, ও অন্য কাউকে ভালোবাসে। আমাকে আর বিয়ে করবে না। ও আমার জীবন থেকে আলাদা হয়ে যাবে?

কেটির কষ্টকল্পনা আকাশ ছুঁয়েছে। ডেভিড এসে গেল। কেটি তার ক্লাসমেটদের গুডবাই বলে বলল আমার প্রেমিক এসেছে, আমি চললাম।

মেয়েরা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে, কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না। শুধু একজন বলেছিল– কেটি মিথ্যে কথা বলছে।

একটুখানি দাঁড়া, তাহলে দেখতে পাবি। লোকটা লম্বা এবং সুন্দর। সে আমাকে ভীষণ ভালোবাসে।

শেষ পর্যন্ত ডেভিড এল। সে দেখল, সমস্ত মেয়েরা তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে, তারা বোধহয় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে এবং মুখ টিপে হাসছে। একটু বাদে ডেভিড সব ব্যাপারটা বুঝতে পারল। তার চিবুক লজ্জায় লাল হয়েছে। সে ওখান থেকে পালিয়ে গেল।

কী আশ্চর্য, ওরা এমন করে আমায় দেখছে, যেন আগে কোনো পুরুষ দেখেনি। ডেভিড বলল, সে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে কেটির দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কি কিছু বলেছ?

-না, আমি কিছু বলিনি। কেন বলব?

তারা বিরাট ডাইনিং রুমে পাশাপাশি বসে খেল। ডেভিড বাড়ির গল্প বলল।

-মা তোমাকে ভালোবাসা জানিয়েছে। তুমি গরমের ছুটিতে যাবে তো?

মা কেমন আছে?

–মা ভালো আছেন। প্রচণ্ড পরিশ্রম করছেন।

–কোম্পনি ভালো যাচ্ছে, ডেভিড?

এই কথা শুনে ডেভিড অবাক হয়ে গেছে- হ্যাঁ, কেন বলো তো?

কেটি মনে মনে ভাবল, একদিন ওই কোম্পানিটা আমার হবে, তুমি আর আমি সব কিছু ভাগ করব।

কেটি বলল- না, আমার জানতে ইচ্ছে করছে।

ডেভিড কেটির দিকে তাকাল– সে কী, তুমি কিছু খাচ্ছো না কেন?

খেতে কোনো কিছু ভালো লাগে না কেটির। সে ওই সুন্দর মুহূর্তটার অপেক্ষাতে আছে। যখন ডেভিড বলবে- এসো কেটি, তুমি এখন পরিপূর্ণ যুবতী। আমি তোমাকে আন্তরিকভাবে চাইছি। আমরা এবার বিয়ে করব।

ডেজার্ট এসেছে, চলে গেছে। কফি এল এবং চলে গেল। না, ডেভিডের মুখ থেকে এই শব্দগুলো বেরোচ্ছে না কেন?

শেষ পর্যন্ত ডেভিড ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল এবার আমায় যেতে হবে। না হলে ট্রেন মিস করব।

কেটি বুঝতে পারল, ওই শব্দগুলো কখনও ডেভিড বলবে না।

কেটিকে দেখে ডেভিড অবাক হয়ে গেছে। কয়েক মাসে কেটির মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। হ্যাঁ, তার উন্মাদনা কমে এসেছে। তার সেই ছটফটে ভাবটাও অনেকটা কমে গেছে।

ডেভিড কেটির হাতে হাত রেখে বলল বলল, তোমার জন্য আমি কী করব?

কেটির চোখে জল। তবুও সে হাসি মুখে বলল- ডেভিড, তুমি আমাকে একটা সাহায্য করবে। আমাকে এই জীবন থেকে মুক্তি দেবে?

কেটি হেঁটে চলে গেল। না, কোনো কথা বলল না!

***

মার্গারেটের মনে হচ্ছে, তিনি বোধহয় কেটির অবর্তমানে থাকতে পারছেন না। সে মেয়েটা অসম্ভব জেদি, অবাধ্য, তা সত্ত্বেও মার্গারেটের জীবনে মেয়েটা ছিল অনেকখানি। মার্গারেট আরও বুঝতে পারলেন, কেটিকে তিনি সত্যি ভালোবাসতেন। একদিন কেটি সত্যিকারের এক ভালো মেয়ে হয়ে উঠবে। মার্গারেটের দৃঢ় বিশ্বাস।

গরমের ছুটিতে কেটি বাড়িতে এল।

মার্গারেট জানতে চাইলেন স্কুল কেমন চলছে?

–আমার ওটা ভালো লাগে না, ওখানে এত বাধা নিষেধ, আমি পছন্দ করি না।

মার্গারেট জানতে চাইলেন ওই স্কুলের অন্য মেয়েরা কেমন?

-কেন? একথা জানতে চাইছ? কেটি শান্তভাবে বলল, ওদের কথা জেনে কী হবে? ওরা ওদের জীবন তো ওখানে কাটাবে। ওরা জীবনের আসল মানেটা খুঁজে পায়নি।

মার্গারেট চিৎকার করে বললেন কেটি, তুই কি সারা জীবন আমাকে জ্বালিয়ে যাবি।

–আমাকে এমনভাবে বকো না তো? দক্ষিণ আফ্রিকাতে এসব ব্যাপার শেখানো হয় না। ওখানে কারা থাকে বলে তো? চিড়িয়াখানার বন্দি পশুরা। তারা কি কোনো দিন হিরের খনি দেখেছে? সোনার খনি?

–কেটি, আবার সেই বড়ো বড়ো কথা?

কেটি বলল- হ্যাঁ, আমি একদিন স্কুল থেকে চলে আসব। তুমি কিন্তু দুঃখ পাবে না?

–সে কীরে?

কেটি বলল- হা, আসবই, দেখো একদিন!

***

এক ঘণ্টা বাদে কেটি বাড়ি ফিরেছে। সে বাইরে গিয়ে মাঠে বখাটে ছেলেদের সঙ্গে রাগবি খেলছিল।

মার্গারেট ভাবলেন, না, যত খরচই করি না কেন, কেটির মন পাল্টানো যাবে না।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা কেটি বলল- ডেভিড কি শহরে আছে?

না, ও অস্ট্রেলিয়ায় গেছে। কাল ফিরে আসবে মনে হচ্ছে।

শুক্রবার আসবে? রাত্রিবেলা?

সম্ভবত, মা মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই ডেভিডকে ভালোবাসিস, তাই না।

কেটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল- হ্যাঁ, ও একজন খুবই ভালো মানুষ।

-হ্যাঁ, মনে হচ্ছে, মার্গারেট বললেন। তিনি হাসলেন, কেটি প্রতিজ্ঞা করেছে ডেভিডকে বিয়ে করবে।

–আমি ওকে ঘৃণা করি না, মা, আমার মনে হচ্ছে, একজন মানুষ হিসেবে ওকে আমি ভালোবাসি।

***

শুক্রবারের ডিনার। ডেভিড এসেছে।

কেটি এগিয়ে গিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাল। হাতে হাত দিয়ে কানে কানে বলল– ডেভিড তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। তুমি না থাকাতে খুব খারাপ লেগেছে। তুমি কি আমার জন্য কষ্ট পেয়েছ?

ডেভিড বলল- হ্যাঁ, পেয়েছি। তারপর ভাবল, হা ঈশ্বর, সত্যি কী পেয়েছি! এই ছোট্ট শিশুকে নিয়ে আমি কী করব? মেয়েটা আর একটু বড়ো হোক, তারপর না হয় ভাবা যাবে।

তখন কেটির বয়স ষোলো বছর। সে পরিপূর্ণ যুবতী হয়ে উঠতে পেরেছে। তার কালো চুল আরও বড়ো হয়েছে। কাঁধ ছাপিয়ে গেছে। তার চেহারার মধ্যে জেগেছে নমনীয়তা। হ্যাঁ, এমন একটা ব্যাপার যা ডেভিড কখনও আগে দেখেনি, সে এক অসাধারণ রূপবতী যুবতী হতে চলেছে। তার মধ্যে আছে বুদ্ধিমত্তার তাৎক্ষণিক বহিপ্রকাশ। আহা, যে কোনো পুরুষের কাছে সে হবে পরম উপাদেয় এবং আদরের সম্পত্তি।

ডিনারের সময় ডেভিড জিজ্ঞাসা করল স্কুলে কেমন লাগছে কেটি?

কেটি বলল- খুবই ভালো লাগছে। আমি অনেক কিছু শিখতে পারছি। ম্যাডামরা অসাধারণ। হ্যাঁ, অনেকের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে।

মার্গারেট কথা না বলে বসেছিলেন।

ডেভিড, তুমি কি আমাকে খনিতে নিয়ে যাবে?

–হ্যাঁ, এভাবেই তুমি তোমার ছুটি কাটাবে?

–হ্যাঁ।

সারাদিন সময় লাগে হিরের খনিতে পৌঁছোতে, তার মানে সারাদিন সে ডেভিডের সঙ্গে থাকতে পারবে।

-মা যদি বলেন, অনুমতি দেন, তাহলে যেও।

–মা, দাও না।

–ঠিক আছে ডার্লিং, ডেভিড, তুমি সঙ্গে থেকো কিন্তু। তুমি থাকলে আমি নিশ্চিন্ত বোধ করি।

মার্গারেট জানেন, এই ব্যাপারে তার কোনো সংশয় নেই।

***

ক্রুগার ব্রেন্টের হিরের খনি, নানা দিকে ছড়িয়ে আছে। এক জায়গাতে বিরাট কাজ হচ্ছে। কয়েকশো শ্রমিক কাজ করে চলেছে। তারা মাটি খুঁড়েই চলেছে, পাথরের গায়ে আঘাত করছে। পরিষ্কার করছে, আবার নতুন উদ্যমে কাজ করছে।

ডেভিড কেটিকে বলল–এটা আমাদের কোম্পনির সবথেকে বড়ো খনি। এখানে অনেক অফিস আছে, তোমাকে সবকিছু দেখাব?

ডেভিড আরও বলতে চেষ্টা করল, প্রত্যেকটা হিরের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। কেটি চোখ বড়ো বড়ো করে সবকিছু শোনার চেষ্টা করল। ভাবল, আহা লোকটার মাথাটা এত পরিষ্কার। ও সব কিছু জানে।

–কিম্বারলিতে অন্যরকমের খনি আছে, সেখানকার হিরেগুলো আকারে বড়ো হয়।

আহা, ডেভিডের মাথায় এত বুদ্ধি গজগজ করছে!

ডেভিড কথা বলেই চলেছে। কেটি মন দিয়ে সবকিছু শোনার চেষ্টা করছে।

পরবর্তী দু ঘণ্টা ধরে তারা খনির নানা জায়গাতে ঘুরে বেড়াল। তারপর লাঞ্চের আসর। কেটির কাছে মনে হল, এই দিনটা স্বর্গীয় মোড়কে মোড়া!

***

কেটি বিকেলবেলা বাড়ি ফিরেছে। মার্গারেট জানতে চাইলেন- কেমন লাগল?

-মা, খনিতে গেলে কী যে আনন্দ হয়! মনে হয়, আমি যেন অন্য কোথাও চলে গেছি।

আধ ঘন্টা বাদে মার্গারেট জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। কেটি মালীর ছেলের সাথে কুস্তি খেলায় মেতে উঠেছে।

পরবর্তী বছর, কেটির চিঠি এল স্কুল থেকে। চিঠির মধ্যে আশার বাণী আছে। তাকে হকি দলের ক্যাপটেন করা হয়েছে। সে ক্লাসের মধ্যে সবার আগে এগিয়ে গেছে। আহা, স্কুলটা খুব একটা খারাপ নয়, কেটি লিখেছে। কিন্তু দুটো একটা মেয়ের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়েছে। সে তার দু-তিনজন বান্ধবীকে নিয়ে গরমের ছুটিতে আসবে। মার্গারেটের মনে আনন্দ। আহা, আবার এই বাড়িতে কিশোরী কণ্ঠের কলতান শোনা যাবে। আমার মেয়েকে কতদিন বাদে কাছে পাব। স্বপ্ন সত্যি হবে। জেমি, আর আমি, আমরা তো অতীত হয়ে গেছি। ম্যাগি ভাবলেন, কেটি হল ভবিষ্যৎ। আহা, আমাদের সামনে একটা সোনালি ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে।

***

কেটি গরমের ছুটি কাটাতে বাড়িতে এল। মনে হল, সে বুঝি এখন একজন পরিপূর্ণা যুবতী হয়ে উঠেছে। ক্লিপড্রিফট শহরের সুন্দরীরা তার সাথে গল্প করতে এসেছিল। কেটি তাদের প্রতি নিস্পৃহ আচরণ দেখিয়েছে। ডেভিড এখন আমেরিকাতে। কেটি তার জন্য অপেক্ষা করছে। ডেভিড বাড়িতে এল। কেটি হতভম্ব হয়ে গেল। সে সাদা পোশাক পরেছে, কালো ভেলভেটের একটা কিছু চাপিয়েছে ওপরে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। যৌবনবতী শরীরটা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

ডেভিড এগিয়ে এসে আলিঙ্গন করল। কী আশ্চর্য, কেটির প্রত্যুত্তর দারুণ। ডেভিড অবাক চোখে তাকাল। হ্যাঁ, বেশ কিছুটা পরিবর্তন। অচেনা অজানা একটা অনুভূতি। চোখের তারার এই আকুতি আগে তো ছিল না।

ডেভিড বুঝতে পারল। কেটির মধ্যে অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। কেন? ডেভিড জানে না, সবকিছু পাল্টে যাবে কিনা।

***

স্কুলে কেটির শেষ বছর। এক সন্ধ্যায় ডেভিড হঠাৎ সেখানে গিয়ে পড়েছিল। সে মাঝে মধ্যে চিঠি দেয়, টেলিফোন করে। এবার আগাম কোনো সংবাদ দিল না।

কেটি এগিয়ে এল। ভীষণ ভালো লাগছে।

–তুমি কিছু বলোনি কেন?

–কেটি, আমি তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাব।

কেটি জিজ্ঞাসা করল কিছু হয়েছে?

-তোমার মায়ের শরীর খারাপ।

কেটি বলল- ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।

***

মায়ের চেহারা দেখে কেটি অবাক হয়ে গেছে। কয়েক মাস আগে দেখা হয়েছিল। মার্গারেটকে দেখে মনে হচ্ছিল, উনি বোধহয় স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিময়ী। কিন্তু এখন

মুখটা ফ্যাকাশে। চোখের তারায় বীভৎস ধূসরতা। সেই উদ্যম কোথায় হারিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, উনি যেন, এক রোগাক্রান্ত রমণী। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছেন।

কেটি তার মায়ের পাশে বসেছিল। বলল- মা, আমি দুঃখিত।

মার্গারেট কেটির হাতে হাত দিলেন। কেটি, আমার যাবার সময় হয়েছে, আমি জানি, তোমার বাবা আমাকে ডাকছে।

তিনি কেটির দিকে তাকালেন। তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছো? নাকি পাচ্ছো না? তারপর বললেন- হ্যাঁ, আমি জানি, তোমার বাবার চারপাশে কেউ ছিল না। কিন্তু এখন? আমার তো তুমি আছো।

তিনদিন বাদে মার্গারেটকে সমাহিত করা হল। কেটির মন শোকে আচ্ছন্ন। সে বাবাকে হারিয়েছে, ভাইও নেই, কিন্তু, এই অতীতের স্মৃতি তার খুব একটা মনে নেই। মায়ের মৃত্যুতে সে সত্যিকারের শোক পেয়েছে। কেটি তখন অষ্টাদশী, এই পৃথিবীতে একেবারে একা। একটা আতঙ্ক এসে গ্রাস করেছে।

ডেভিড সবকিছু শান্তভাবে দেখছে, কবরখানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁদবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। বাড়িতে ফিরে আসার পর কেটি কান্নায় ভেঙে পড়ল। বলল মা, আমাকে এত ভালোবাসত ডেভিড, আমি মাকে ভালোবাসতে পারলাম কই? শুধু তো কষ্ট আর জ্বালা যন্ত্রণা দিয়ে গেলাম।

ডেভিড বলল– কেটি নিজের সম্পর্কে এমন কথা কেন চিন্তা করছ?

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

না, আমি খালি যন্ত্রণাই দিয়েছি, আমি যদি দিনগুলো ভালোভাবে কাটাতাম? ডেভিড, কেন এমন হল?

ডেভিড দাঁড়াল। কেটির কান্না কিছুটা থামল। ডেভিড বলল- তুমি শান্ত হবার চেষ্টা করো। কেটি, জীবনের ভালো মুহূর্তগুলোকে মনে করার চেষ্টা করবে।

-হ্যাঁ, চেষ্টা করব, কিন্তু এখন আমি কোথায় যাব?

পরের দিন সকালে কেটির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হল।

ডেভিড বলল- স্কটল্যান্ডে তোমার পরিবার আছে।

সেখানে আমি যাব না, সেটা পরিবার নয়, তাদের আমি আত্মীয় বলতে পারি। কেটির কণ্ঠস্বরে তিক্ততা ঝরে পড়ছে, বাবা যখন এখানে এসেছিল, ওরা হেসেছিল, কেউ সাহায্য করেনি। একমাত্র মা সাহায্য করেছে, মা এখন বেঁচে নেই। না, আমি ওখানে যাব না।

ডেভিড সেখানে বসে চিন্তা করে বলল– তাহলে? স্কুল শেষ হওয়ার পর কোথায় যাবে? ডেভিড আরও বলে চলল তোমার মা চেয়েছিল, তুমি যেন কোম্পানিটা দেখো।

কেটি কোনো কথা বলল না। সে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে।

***

স্কুলের ক্লাস শেষ হয়ে গেল। তারপর ডেভিড হাজির হল।

***

জোহানেসবার্গ থেকে ক্লিপড্রিফট, ঘোড়ার পিঠে যাত্রা, না, নিজস্ব রেলওয়েতে।

ডেভিড বলল- তুমি কি জানো, এই সবকিছু এখন তোমার? তুমি এখন বিশ্বের সবথেকে ধনী মহিলা। তুমি কী করবে? তুমি অনেক লক্ষ পাউন্ডের এই কোম্পানিটা বিক্রি করতে পারো। ডেভিড বলতে থাকে, অথবা রাখতে পারো। এ ব্যাপারে তোমাকেই চিন্তা করতে হবে।

কেটি বলল- আমি বুঝতে পারছি না। আমার বাবা হিরের সন্ধানে এখানে এসেছিল। ডেভিড, বাবাকে আমি কী বলব? একজন অভিযাত্রী? নাকি অর্থ অপহরণকারী? আর এই কোম্পানি? এর সাথে এমন দুজন গার্ডের নাম যুক্ত আছে, যারা বাবাকে মারতে চেয়েছিল। এটাকে কি আমি বাঁচিয়ে রাখব? আমি বুঝতে পারছি না। না, ক্রুগার ব্রেন্ট, আমাকে সবসময় জ্বালাতন করে, আমি এই কোম্পানিটা বিক্রি করব না।

ডেভিড শান্তভাবে বলল- আমি কি এখানে থাকব?

–হ্যাঁ, আমার তাই ইচ্ছে। আমাকে একটা কাজ করতে হবে। আমি একটা বিজনেস স্কুলে ভর্তি হব।

–বিজনেস স্কুল? ডেভিডের কণ্ঠস্বরে আগ্রহ এবং আতিশয্য।

–এটা ১৯১০, কেটি মনে করাল। জোহানেসবার্গে অনেকগুলো বিজেনস স্কুল আছে, এখানে মেয়েরা ভরতি হওয়ার অনুমতি পায়।

শেষ পর্যন্ত কেটি ঠিক করল, সে এমনই একটা স্কুলে ভরতি হবে।

.

১৪.

এটা একটা সম্পূর্ণ নতুন উন্মাদনা। যখন কেটিকে জোর করে চেনটেনহ্যামে পাঠানো হয়েছিল, জীবনটা একঘেয়ে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখানে প্রত্যেকটা ক্লাসে সে নতুন কিছু শিখতে পারছে, যেটা ভবিষ্যতে তার কাছে সহায়ক হয়ে উঠবে। এই পাঠ্যসূচির মধ্যে একদিকে যেমন হিসাবশাস্ত্র আছে, অন্যদিকে আছে প্রশাসন, আন্তর্জাতিক ব্যবসা এবং ব্যবসা পরিচালনার নানা সূত্র। প্রত্যেক সপ্তাহে ডেভিড ফোন করে জানতে চায় কেটি কেমন আছো?

কেটি বলল- ডেভিড, ব্যাপারটা সত্যি উন্মাদনাজনক।

একদিন সে আর ডেভিড একসঙ্গে কাজ করবে, পাশাপাশি কাজ করতে করতে রাত আসবে, একদিন হঠাৎ ডেভিড তার দিকে তাকিয়ে বলবে– কেটি, ডার্লিং, আমি কী বোকা নির্বোধ। তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে? একমুহূর্ত পরে সে স্বইচ্ছায় ডেভিডের আলিঙ্গনে ধরা দেবে।

কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে। এর মধ্যে নিজেকে তৈরি করতে হবে। কেটি আবার হোমওয়ার্কে মন দিল।

দু-বছর ধরে এই পাঠ্যসূচিটা চলতে থাকবে। কেটি ক্লিপড্রিফটে এল তার কুড়িতম জন্মদিনের আসরে যোগ দিতে। ডেভিড তাকে আনতে স্টেশনে গিয়েছিল। কেটি হাত নাড়তে নাড়তে উড়ন্ত প্রজাপতি হয়ে উড়ে এসে ডেভিডকে জড়িয়ে ধরে বলল- ডেভিড, তোমাকে দেখে কী যে ভালো লাগছে।

ডেভিড একটু রেগে গিয়ে কেটিকে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল- হ্যাঁ, তোমাকে দেখেও ভালো লাগছে আমার।

তার আচরণের মধ্যে এক অদ্ভুত নীরবতা চোখে পড়ল।

কিছু হয়েছে কী?

না, সকলের সামনে এভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরো না।

কেটি ডেভিডের দিকে তাকিয়ে বলল ঠিক আছে, ভবিষ্যতে তোমাকে আর কখনও এভাবে বিরক্ত করব না।

***

তারা গাড়িতে বাড়ি ফিরছে। কেটির দিকে তাকিয়ে আছে ডেভিড, হ্যাঁ, একটা স্ফুটনোম্মুখ গোলাপ বুঝি। শরীরের সর্বত্র সুন্দর স্বর্গীয় আভা। অনেকটা পাল্টে গেছে

কেটি। ডেভিড মনে মনে চিন্তা করল, না, আমি কখনওই ওর অসহায়তার সুযোগ নেব না।

সোমবার সকালবেলা কেটি ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেডের নতুন অফিসে এসে পা রাখল। এখানে একটা নতুন জগৎ গড়ে উঠেছে। এই জগতের আলাদা ভাষা আছে। এখানে অত্যন্ত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়, কতগুলো বিভাগ তৈরি হয়েছে। কোথাও স্থানীয় বিভাগ, কোথাও আবার এজেন্টদের অফিস, কোনো জায়গাতে আবার শুধুমাত্র ব্রাঞ্চ নিয়ে আলোচনা হয়। এই কোম্পানি এখন অনেক জিনিস তৈরি করছে, হাতে গুনে বোধহয় শেষ করা যাবে না। একদিকে যেমন ইস্পাতের কারখানা আছে, অন্যদিকে আছে গবাদি পশুদের আগার। আছে রেললাইন, জাহাজের সম্ভার আরও কত কী। এর পাশাপাশি পুরোনো ব্যবসাও সমানতালে এগিয়ে চলেছে। খনি থেকে হিরে আর সোনা তুলে আনা, জিঙ্ক, প্লাটিনাম আর ম্যাগনেশিয়ার। সমস্ত সময় কাজ চলেছে ঘড়ির কাঁটা ধরে।

ক্ষমতা– কেটি বুঝতে পারল, ক্ষমতার জন্যই আমরা সবাই লালায়িত। কেটি অফিসে গিয়ে বসল। ডেভিডের কথাগুলো সে অবাক হয়ে শুনছে। সে ভেবে আশ্চর্য হচ্ছে, তাদের কোম্পানির এক-একটা সিদ্ধান্তের ফলে সারা পৃথিবীর হাজার হাজার মানুষের জীবনধারায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। বিভিন্ন বিভাগের জেনারেল ম্যানেজাররা নানা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। নানা আলাপ আলোচনা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডেভিড আবার এই পরিকল্পনাগুলোকে পাল্টাতে বাধ্য হয়।

কেটি জানতে চেয়েছিল- তুমি কীভাবে এতগুলো কাজ করো?

কাজ করতে করতে অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে। প্রত্যেকটা ম্যানেজারের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। একজন ম্যানেজার ভাবেন যে, তিনি পৃথিবীর অধীশ্বর। তিনি একাই ক্ষমতা দখল করবেন। এটা কখনওই হতে দেওয়া উচিত নয়। চলো, কোথাও গিয়ে লাঞ্চ খাওয়া যাক।

ডেভিড কেটিকে বিরাট প্রাইভেট ডাইনিং রুমে নিয়ে গেল। কেটির অফিসের পাশেই এটা অবস্থিত। একজন ভদ্রলোক অপেক্ষা করছিল, বেশি বয়স নয়। পাতলা চেহারা, চোখের তারায় ঔৎসুক্যের বাদামী আভা।

ডেভিড বলল– এ হল ব্রাড রজারস। ব্রাড, এই তোমার নতুন বস, কেটি ম্যাকগ্রেগর।

ব্রাড হাত বাড়িয়ে বলল- মিস ম্যাকগ্রেগর, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমি আনন্দিত।

ডেভিড বলল– ও হল আমাদের গোপন অস্ত্র। ও ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেড সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। যদি আমি কখনও চলে যাই। তুমি চিন্তা করো না। কেটি, ব্রড সবকিছু চালাতে পারবে।

যদি আমি চলে যাই–এই চিন্তাটাই কেটির মনের মধ্যে ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু কেটি জানে, ডেভিড কখনও কোম্পানিকে ছেড়ে যেতেই পারবে না। কেটি লাঞ্চের আসরে বসে আর কিছু চিন্তা করল না। লাঞ্চের পর তারা দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করল।

ডেভিড সাবধান করে দিয়ে বলল– আরও রাজনৈতিক সংঘর্ষ দেখা দেবে। শুধু তাই নয়, সরকার একধরনের নতুন ট্যাক্স বসাতে চলেছে।

কেটি জানতে চাইল– এটা কী ধরনের ট্যাক্স?

কালো মানুষ, বাদামী মানুষ এবং ইন্ডিয়ানদের দু-পাউন্ড করে মাথা পিছু দিতে হবে। এটা একমাসের মাইনের থেকে বেশি।

কেটি বান্দার কথা ভাবল, এবার অন্য বিষয়ে আলোচনা হল।

***

নতুন জীবনটাকে কেটি ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছে। প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তের অন্তরালে লক্ষ লক্ষ পাউন্ডের জুয়াখেলা। হ্যাঁ, ব্যবসার ভেতর এ ধরনের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকাই দরকার। মনে যার সাহস আছে, সে-ই শেষ পর্যন্ত ডারবি ম্যাচে জিততে পারে।

ডেভিড কেটিকে বলেছিল- শোনো, ব্যবসা হল একটা খেলা। যে ভালো খেলতে পারে, সে-ই জয়যুক্ত হয়। তোমাকে সবসময় মনে রাখতে হবে, তুমি কঠিন কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে নেমেছ। সামান্য শৈথিল্য দেখালেই সর্বনাশ। আমি তোমাকে এই খেলার সর্বোত্তম খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছি।

হ্যাঁ, তখন থেকেই কেটি এক অনুভবী এবং মনোযোগী ছাত্রী। যে করেই হোক এই খেলাটা তাকে শিখতে হবে।

কেটি একা ওই বিরাট বাড়িটায় বাস করে। সেখানে অনেক চাকরের দল আছে। সে আর ডেভিড শুক্রবার রাতে ডিনারে উপস্থিত হয়। কিন্তু অন্য কোনো রাতে ডেভিড আসতে চায় না। কোনো একটা কারণ দেখিয়ে দেয়। ব্যবসায়িক প্রহরে তারা একসঙ্গে কাজ করে। কিন্তু কখনও ডেভিডকে আগ্রহী বলে মনে হয় না। এই ব্যাপারটা কেটি বুঝতে পারে না।

***

একুশতম জন্মদিন, ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেডের সমস্ত শেয়ার কেটির হাতে তুলে দেওয়া হল। এবার সে আনুষ্ঠানিকভাবে কোম্পানির ওপর তার কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারবে।

কেটি বলেছিল– চলল, এই দিনটাকে স্মরণ করে আজ রাত্রে আমরা ডিনার খাই।

–আমি দুঃখিত, কেটি, অনেক কাজ করতে হবে।

কেটি একা সেই রাতে খেল। বুঝতে পারছে না, ডেভিডের এই শীতল আচরণের অর্থ কী? ডেভিড কি কালা বোবা অন্ধ নাকি? আমার ভালোবাসা কেন বুঝতে পারে না।

কোম্পানি এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটা নতুন জাহাজের লাইন বসাতে চলেছে।

তুমি আর ব্রাড নিউইয়র্কে চলে যাও, ব্যাপারটা শেষ করে এসো। ডেভিড কেটিকে বলেছিল, তোমার একটা ভালো অভিজ্ঞতা হবে।

কেটি চেয়েছিল, ডেভিড যেন তার সফরসঙ্গী হয়। কিন্তু এই কথাটা বলতে কেমন যেন লাগল। কেটি ভাবল, শেষ অব্দি ডেভিডকে ছাড়াই আমি কাজটা করতে পারব। এছাড়া আমি তো কখনও আমেরিকাতে যাইনি। নতুন অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তখন সে উন্মুখ হয়ে উঠেছে।

***

ব্যবসায়িক কাজটা সুন্দরভাবে হয়ে গেল। ডেভিড কেটির হাত ধরে বলেছিল সেখানে গিয়ে দেখবে একটা নতুন জগৎ।

কেটি এবং ব্রাড কোম্পানির বিভিন্ন শাখা অফিসে গেল। ডেট্রয়েট থেকে শিকাগো, পিটসবার্গ থেকে নিউইয়র্ক। কেটি এই বিরাট দেশটা দেখে অবাক হয়ে গেল। এর আগে কেটি ডাকহারবার পর্যন্ত গিয়েছিল। অথবা অন্য কোনো জায়গাতে। তাকে বিখ্যাত শিল্পী চালর্স ডানা গিভসনের বাড়িতে রাতে খাবারের নেমতন্ন করা হল। সেখানে বারোজন উপস্থিত ছিল। কেটি ছাড়া সকলেই একটা ছোট্ট দ্বীপের বাসিন্দা, এই দ্বীপটার নাম হল আইসেলবোরো।

গিভসন কেটিকে বলল- এই অঞ্চলটার একটা সুন্দর ইতিহাস আছে। অনেক বছর আগে বস্টন শহর থেকে মানুষেরা ছোটো ছোটো নৌকোতে চড়ে এই দ্বীপে এসেছিল। এই দ্বীপে আসার পর তারা নিজেদের বাড়িঘর তৈরি করে। এখানে প্রায় ৫০টা পরিবার বাস করে। তুমি কি লাইটহাউসটা দেখেছ?

হ্যাঁ।

–এই লাইটহাউসের একজন পরিচালক আছে, আর আছে তার চালাক কুকুরটা। যখন কোনো নৌকো সেখান দিয়ে যায় কুকুরটা ঘন্টা বাজিয়ে দেয়।

কেটি হেসে বলল- না, তুমি মজা করছ?

না, সবথেকে অবাক কাণ্ড কী বলো তো? কুকুরটা কিন্তু কানে কালা। সে কী করে বলো তো? সে স্পন্দনের অনুভব নেবার চেষ্টা করে।

কেটি আবার হেসে বলল- তাহলে? তোমরা একটা আশ্চর্য দ্বীপের বাসিন্দা, তাই তো?

কাল সকালে তুমি সব জায়গায় ঘুরে দেখো, কেমন?

সকালবেলা কেটি এই দ্বীপের একমাত্র হোটেল থেকে বেরিয়ে এল। সে একটা ঘোড়া ভাড়া করল এবং ঘোড়ার গাড়ি। তারপর নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াল। ভারী ভালো লাগল এই ছোট্ট দ্বীপটাকে!

দ্বীপের একেবারে শেষে একটা কবরক্ষেত্র।

কেটি বলল- এখানে একটু থামবে?

সে গাড়ি থেকে নেমে এসে ওখানে দাঁড়াল।

একটা পাথরের স্মারকচিহ্ন। লেখা আছে– জবপেন ডেলটন, ২৫ জানুয়ারি, ১৭৯৪ সালের ৪৭ বছর বয়সে মারা গেছেন। তার নীচে স্মৃতিলেখা। লেখা আছে, এই পাথরের নীচে এমন একজন শুয়ে আছেন, ঈশ্বর তাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

কেটি অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই শান্ত স্তব্ধ নীরব নিথর প্রকৃতির জগতে। তারপর আবার ঘোড়ার গাড়িতে ফিরে এল।

কেটি জানতে চাইল শীতকালে এখনকার আবহাওয়া কেমন হয়?

ছেলেটি বলল- ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ে। চারদিকে ঝুরঝুরু তুষারপাত। তখন যাতায়াত করা অসম্ভব হয়ে যায়।

ভারী সুন্দর এই প্রকৃতি। একটা ছোট্ট দোতলা বাড়ি দেখতে পাওয়া গেল। সামনে বুনোগোলাপ আর পপির বাগান। কয়েকটা জানালা দরজাও চোখে পড়ল। সবুজ রং করা। কেটি একবার ভেবেছিল, ভেতরে ঢুকবে। জানতে চাইল- এই বাড়ির মালিক কে?

–এই বাড়ির মালিক ছিলেন মিসেস ট্রেবেন। তিনি কয়েক মাস আগে মারা গেছেন।

–এখন এখানে কে থাকে?

আমি যতদূর জানি, বাড়িটা ফাঁকাই আছে।

–এটা কি বিক্রি হবে?

গাইড কেটির দিকে তাকিয়ে বলল- হ্যাঁ, হতে পারে হয়তো, কিন্তু বাইরের কেউ এটা কিনতে পারবে না। দ্বীপবাসীরা এ ব্যাপারটা পছন্দ করে না।

এক ঘন্টা বাদে কেটি ওই এস্টেটের লইয়ারের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। জানতে চাইল, ট্রিবেন হাউসটা বিক্রি আছে কিনা?

লইয়ার হেসে বলেছিলেন- এর উত্তরে আমি হা এবং না– দুটোই বলব।

–তার মানে কী?

–হ্যাঁ, এটা বিক্রি হবে। কেউ কেউ এটা কেনার জন্য আগ্রহ দেখিয়েছে।

কেটি ভাবল- এই দ্বীপের পুরোনো বাসিন্দারা, তাই তো? যদি আমি এটা কিনতে চাই?

ভদ্রলোক বললেন- বাড়িটার দাম কিন্তু অনেক।

কত টাকা?

–পঞ্চাশ হাজার ডলার।

–তাহলে এটা আমার জন্য ব্যবস্থা করুন।

***

এই বাড়ির ভেতরটা ভারি সুন্দর। কেটি অবাক হয়ে গেছে। ভারি সুন্দর একটা হল। চারপাশে কাঁচের দেওয়াল। হলের একদিকে মস্ত বড়ো বলরুম। অন্যদিকে একটা লিভিংরুম। আর আছে ফায়ার প্লেস। একটা লাইব্রেরি দেখা গেল। বিরাট কিচেন, আয়রন স্টোভ এবং পাইন কাঠের টেবিল। বাটলারের ব্যানট্রি এবং লন্ড্রিরুমও আছে। নীচের তলায় ছটা বেডরুম, এখানে পরিচারকরা থাকতে পারে এবং একটি বাথরুম। ওপরের তলায় একটা মস্ত বড়ো বেডরুম। তার ভেতর চারটে ছোটো ছোটো বেডরুম আছে। কেটি যা ভেবেছিল, তার থেকে বাড়িটা অনেক বড়। কেটি ভাবল যখন আমার আর ডেভিডের ছেলেপুলে হবে, তখন সবকটা ঘর লাগবে। কাছেই সমুদ্র। একটা নিজস্ব ডক আছে।

কেটি লইয়ারের দিকে তাকিয়ে বলল– এটা আমাকে নিতেই হবে।

কেটি এই বাড়িটার নাম রাখবে সিডারহিল হাউস। সে ক্লিপড্রিফটে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল। ডেভিডের কাছে সুখবরটা দিতে হবে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে যাওয়া কেটির কাছে বুনো উন্মাদনায় ভরা। ডাকহারবারের ব্যাপারটা শেষ হয়েছে। এমন একটা স্মারক চিহ্ন যেটা সে ডেভিডের হাতে তুলে দেবে। হ্যাঁ, এই বাড়িটাকে সে আরও ভালোবাসবে।

কেটি এবং ব্রাড ক্লিপড্রিফটে ফিরে এল। কেটি অত্যন্ত দ্রুত ডেভিডের ঘরে পৌঁছে গেল। ডেভিড ডেস্কে বসে আছে এবং কাজ করছে। তাকে দেখে কেটির মনে আবার সেই পুরোনো আবেগের স্পন্দন। ডেভিড তাকে অভিবাদন জানিয়ে উঠে দাঁড়াল।

-কেটি, এসো।

কেটি কিছু বলার আগে ডেভিড বলল– আমি তোমাকেই প্রথম জানাচ্ছি। আমি বিয়ে করতে চলেছি।

.

১৫.

ছ-সপ্তাহ আগের ঘটনা। দিনগুলো অত্যন্ত দ্রুত কেটে গেছে। ডেভিড একটা খবর পেয়েছে, এক বিখ্যাত আমেরিকান হিরক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে, টিমওনীল ক্লিপ ড্রিফটে আছে, ডেভিড যেন তাকে ডিনারের আসরে আমন্ত্রণ জানায়। ডেভিড এসব পর্যটকদের সাথে সময় কাটাতে মোটেই ভালোবাসে না। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা একেবারে অন্যরকম। সে তার গ্রাহককে চটাতে চাইল না। সে কেটিকে বলতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা কেমন যেন হয়ে যাবে। আসলে কেটি তখন সেখানে ছিল না। সে উত্তর আমেরিকাতে কোম্পানির একটা প্ল্যান দেখতে গেছে। সঙ্গে ব্রাড রজারস। ডেভিড ঠিক করল, সে ওনীলের হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হবে।

ওনীল বলল আমার মেয়ে সঙ্গে আছে। আমি কি তাকে আনতে পারি?

ডেভিড মোটেই এক বালিকার সাথে সময় কাটাতে চায়নি। সে শান্তভাবে বলেছিল, না, আমি কিছু মনে করব না।

তারা গ্রান্ড হোটেলে দেখা করল। ডাইনিং রুমের মধ্যে। যখন ডেভিড এল, তখন ওনীল এবং তার মেয়ে সেখানে বসে আছে। ওনীল এক ভারী সুন্দর চেহারার আমেরিকান ভদ্রলোক। সবেমাত্র পঞ্চাশ ছুঁয়েছে। তার মেয়ের নাম জোসেফাইন। হ্যাঁ, এত সুন্দরী মেয়ে ডেভিড তার জীবনে কখনও দেখেনি। জোসেফাইনের বয়স সবেমাত্র তিরিশ হয়েছে। আকর্ষণীয় চেহারা। ফুরফুরে সোনালী চুল। নীল স্বচ্ছ দুটি চোখের তারা। তাকে দেখে ডেভিডের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

ডেভিড বলল- আমি দুঃখিত। শেষ কালে একটু কাজ এসে গিয়েছিল।

জোসেফাইন তার দিকে তাকিয়ে আছে। জোসেফাইন শান্তভাবে বলল আমার বাবা আপনার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছে, মিঃ ব্ল্যাকওয়েল। আমি জানি, আপনি খুবই ব্যস্ত মানুষ।

-না-না, তা নয়, ডেভিড আমতা আমতা করে বলতে থাকে।

জোসেফাইন বলল- হ্যাঁ, আপনার আসল নামটাও আমি জানি, ডেভিড, তাই তো?

ডিনার তখনও শেষ হয়নি। ডেভিড চিন্তা করল জোসেফাইন ওনীলকেই কাছে পেতে হবে। মেয়েটি বুদ্ধিমতী, তার মধ্যে কৌতুকবোধ আছে। ডেভিড হঠাৎ তার প্রতি একটা অজানা আকর্ষণ অনুভব করল। ডেভিডের কাছ থেকে সে অনেক কিছু জানতে চাইছে। সন্ধ্যেটা শেষ হয়ে গেল। ডেভিড মেয়েটিকে ভালোবেসে ফেলেছে।

ডেভিড টিম ওনীলকে বলেছিল– আপনারা কোথায় থাকেন?

সান ফ্রানসিসকোতে।

কবে চলে যাচ্ছেন?

আসছে সপ্তাহে।

জোসেফাইন ডেভিডের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বলল- ক্লিপড্রিফটকে কি আমরা একটা সুন্দর শহর বলতে পারি? যদি তাই হয়, তাহলে বাবাকে বলব, আরও কদিন এখানে থেকে যেতে।

–আমি এটাকে আরও সুন্দর করার চেষ্টা করছি। হিরের খনি দেখতে কবে যাবেন?

জোসেফাইন বলল- যখন আপনি বলবেন।

ডেভিডের মনে হল, সে যদি এই দুই আগন্তুককে নিয়ে বেরোতে পারে, তাহলে বোধহয় ভালো হয়। কিন্তু কোম্পানির নিয়মানুসারে কোনো অধস্তন কর্মচারীর হাতেই এই কাজটা দেওয়া হয়। হঠাৎ সে বলল- কালকে সময় হবে কী? আগামীকাল অন্তত ছটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আছে। ডেভিডের হঠাৎ মনে হল, ওইসব মিটিং-এ না গেলেও হয়তো চলবে।

***

সে ওনীলদের নিয়ে মাটির তলায় নেমে গেল। বারোশো ফুট নীচে একটা চাকা লাগানো খাঁচা ধীরে ধীরে নীচে নেমে যাচ্ছে। ছ ফুট চওড়া এবং কুড়ি ফুট লম্বা। চারটে কম্পার্টমেন্ট আছে। সবকিছু দেখে আগন্তুকরা অবাক হয়ে গেছে।

জোসেফাইন হেসে বলল- হিরেগুলোকে কেন ক্যারেটে ওজন করা হয়?

ক্যারেট নামটা এসেছে ক্যারট বীজ থেকে। ডেভিড সবকিছু বুঝিয়ে বলল, আসলে এখানে ওজনটা ঠিক থাকে। এক ক্যারেটের অর্থ হল কুড়ি মিলিগ্রাম।

জোসেফাইন বলল- ডেভিড, আপনি কত কিছু জানেন।

মেয়েটি শুধু হিরের কথাই বলছে কেন? যখন সে কাছে আসছে, একটা অদ্ভুত গন্ধ বেরোচ্ছে তার শরীর থেকে। যতবার ডেভিড জোসেফাইনের দিকে তাকাচ্ছে, তার মনে উন্মাদনা এবং উত্তেজনা।

ডেভিড ওনীলকে বলেছিল– কাল যদি ফাঁকা থাকেন, তা হলে কি আসবেন? আপনি এখানে অর্থ লগ্নী করতে পারেন।

বাবা কিছু বলার আগেই জোসেফাইন বলল- হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই আসব।

***

জোসেফাইন এবং তার বাবার সঙ্গে ডেভিডের রোজই দেখা হচ্ছে। একটু একটু করে ডেভিড জোসেফাইনকে আরও বেশি ভালোবেসে ফেলছে।

ওনীলদের সাথে ডিনারের আসর। টিম ওনীল বললেন–আজ আমি খুব ক্লান্ত, ডেভিড। আমি না গেলে কি আপনি কিছু মনে করবেন?

ডেভিড তার আনন্দ লুকোবার চেষ্টা করছিল।

না স্যার, আমি বুঝতে পারছি।

জোসেফাইন ডেভিডের দিকে তাকিয়ে শয়তানি হাসি হেসে বলল আমি আপনাকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করব।

ডেভিড জোসেফাইনকে নিয়ে একটা রেস্টুরেন্ট গেল। দোকানটা সবেমাত্র খুলেছে। ঘরে অনেকের ভিড়। ডেভিডকে অনেকে চিনতে পেরে টেবিলের ব্যবস্থা করল। আমেরিকান গান বাজছিল।

ডেভিড জানতে চাইল তুমি কি নাচতে চাও?

–হ্যাঁ, আমি নাচতে পছন্দ করি।

এক মুহূর্তের মধ্যে জোসেফাইন ডেভিডের আলিঙ্গনে ধরা পড়েছে। এটা বোধহয় একটা ম্যাজিক। ডেভিড ধীরে ধীরে তাকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরছে। হ্যাঁ, ওই তো, জোসেফাইন জবাব দিতে শুরু করেছে।

-জোসেফাইন, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

জোসেফাইন ডেভিডের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল- প্লিজ ডেভিড, একথা কখনও বলো না।

-কেন?

–আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না।

–কেন? তুমি আমায় ভালোবাসো না?

জোসেফাইনের মুখে হাসি, চোখের তারায় উজ্জ্বলতা।

–আমি তোমাকে পেতে চাইছি ডার্লিং, তা কি আমি তোমায় বলব?

বলো।

–আমি কখনও এই ক্লিপড্রিফটে থাকতে পারব না। তাহলে পাগল হয়ে যাব।

–একবার চেষ্টা করে দেখবে।

–ডেভিড, তুমি আমাকে লোভ দেখিও না। আমি জানি, আমাদের বিবাহিত জীবন, কখনও সুখের হবে না। পরবর্তীকালে আমরা একে অন্যকে ঘৃণা করতে থাকব। তাই মনে হয়, এই সুন্দর সম্পর্কটার ওই পরিণতি হওয়া উচিত নয়। এসো, তোমাকে গুডবাই জানিয়ে চলে যাই।

ডেভিডের মুখের দিকে তাকাল জোসেফাইন। ডেভিড বুঝতে পারল জোসফাইনের সমস্ত শরীরটা মোমের মতো গলছে।

শেষ পর্যন্ত জোসেফাইন জানতে চাইল ডেভিড, তুমি কি সানফ্রানসিসকোতে গিয়ে থাকতে পারবে?

-এটা একটা অসম্ভব চিন্তা, ওখানে আমি কী করব?

এসো, আমরা কাল সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে বাপীর সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করব।

***

টিম ওনীল বলেছিল- জোসেফাইন গতরাতের সংলাপের কথা আমাকে বলেছে। দেখো, তোমাদের দুজনেরই একটা সমস্যা আছে। আমার কাছে একটা সমাধান আছে, যদি সেটা তুমি মানতে চাও।

আমি মানতে চাইছি, স্যার।

ওনীল একটা বাদামী চামড়ার ব্রিফকেস বের করে কতগুলো ব্লুপ্রিন্ট নিয়ে এল। বলল, জমানো খাবার সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?

আমি কিছুই জানি না।

-১৮৬৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের ব্যবসা প্রথম শুরু হয়েছিল। কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আছে। অনেক দূরের পথে পাড়ি দিতে দিতে খাবারটা নষ্ট হয়ে যায়। আমরা শীততাপনিয়ন্ত্রিত রেলের কামরা পেয়েছি। কিন্তু কেউ এমন কোনো যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারেনি, যার সাহায্যে শীততাপনিয়ন্ত্রিত ট্রাক পাওয়া যেতে পারে। ওনীল একটা ব্লপ্রিন্টের দিকে হাত দিয়ে বলল- আমি এর ওপর পেটেন্ট নিয়েছি। এই ব্যাপারটা খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করবে ডেভিড।

ডেভিড ওই ব্লুপ্রিন্টের দিকে তাকিয়ে বলল– মিঃ ওনীল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

না, এটা কোনো ব্যাপার নয়, আমি এমন একজন প্রশিক্ষিত মানুষকে খুঁজছি, যে এ ব্যাপারে মন দিতে পারবে। সে এই ব্যবসাটা চালাতে পারবে। এর মধ্যে একটা সোনালী সুন্দর স্বপ্ন আছে। আমি এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত সকলের সাথে কথা বলেছি। তুমি ভাবতেই পারছ না, এটা একদিন কত বড়ো হবে। তোমার মতো কাউকে আমরা চাই।

জোসেফাইন বলেছিল– এই কোম্পানির হেডকোয়ার্টার হবে সানফ্রানসিসকো।

ডেভিড অনেকক্ষণ নীরব হয়ে বসে রইল- হ্যাঁ, এই খবরটা সে বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপর বলল– এর পেটেন্ট কি আপনি পেয়ে গেছেন?

হা।

আমি ব্লুপ্রিন্টটা একটু দেখব? কাউকে দেখাব?

অবশ্যই দেখাতে পারো।

***

ডেভিড টিম ওনীলের দেওয়া ব্লুপ্রিন্টের ওপর চোখ রাখল। সানফ্রানসিসকোতে ওনীলের যথেষ্ট সুনাম আছে। একসময় উনি বার্কলে কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ছিলেন। সেখানেও তাকে সকলে শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শন করত। এই ব্যবসা সম্পর্কে ডেভিডের অ-আ-ক-খ জ্ঞান নেই। কিন্তু এটা বুঝতে হবে।

–পাঁচদিনের মধ্যে আমি ফিরে আসব ডার্লিং, তুমি এবং তোমার বাবা কি আমার জন্য অপেক্ষা করবে?

হ্যাঁ, আমরা অনন্তকাল তোমার জন্য অপেক্ষা করব। জোসেফাইন কাঁদো-কাঁদো মুখে বলেছে।

ডেভিড ট্রেন ধরে জোহানেসবার্গে গেল। এডওয়ার্ড ব্রডরিকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার সব থেকে বড়ো মাংস প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের মালিক।

ডেভিড ওই প্রিন্টটা ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বলল- স্যার, এ বিষয়ে আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত চাইছি।

-হ্যাঁ, জমানো খাদ্য সম্পর্কে আমি খুব একটা বেশি কিছু জানি না। কিন্তু আমি জানি, কারা এ ব্যাপারে কথা বলতে পারবে। তুমি বিকেলবেলা এসো, আমি কয়েকজন বিখ্যাত এক্সপার্টকে ডেকে পাঠাব।

***

বিকেল চারটে, ডেভিড প্ল্যান্টে ফিরে এসেছে। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে। অনিশ্চয়তার আক্রমণে। সে জানে না, কাকে কীভাবে কথা বলবে। দু-সপ্তাহ আগে সে এই ধরনের কোনো কথা শুনলে হয়তো অবাক হত। ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেড ছাড়তে হবে, সেটা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। এই কোম্পানি তার অস্থিতে রক্তে মজ্জায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এর সঙ্গে তার আত্মার আত্মীয়তা। কিন্তু এখন? এখন সে সানফ্রানসিসকোতে একটা অন্য কোম্পানি চালাতে চলেছে। এটা কি উন্মাদের পরিকল্পনা? কিন্তু এর অন্তরালে একটি কারণ আছে। সে হল ওই জোসেফাইন ওনীল।

দুজন মানুষ ঘরে বসেছিলেন, এডওয়ার্ড ব্রডরিক বললেন– উনি ডাঃ ক্র্যাফোর্ড, আর উনি মিঃ কাউফম্যান।

তারা পারস্পরিক অভিনন্দন বিনিময় করলেন।

ডেভিড জানতে চাইল আপনারা কি এই ব্লুপ্রিন্টটা দেখেছেন?

ডঃ ক্র্যাফোর্ড বললেন- হ্যাঁ, আমরা দেখেছি মিঃ ব্ল্যাকওয়েল, আমরা ভালোভাবে পরীক্ষা করেছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেটেন্ট অফিস এর ওপর পেটেন্ট দিয়েছে। মিঃ ব্লাকওয়েল, যিনি এই পেটেন্ট নিয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই খুব ধনী ব্যক্তি।

ডেভিড মাথা নেড়ে তাকাল।

–এটা একটা মস্ত বড়ো আবিষ্কার। এটা কেউ কেন আগে ভাবেনি, আমরা সেটাই চিন্তা করছি। আমার মনে হয়, এটা আপনি কখনও হাতছাড়া করবেন না।

ডেভিড বুঝতে পারছে না, কীভাবে এই কথাতে তার প্রতিক্রিয়া জানাবে। সে টিম ওনীলের দিকে তাকাবার চেষ্টা করল। শেষবারের মতো ভাবল, জোসেফাইন কি দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে রাজি হবে না? না, ডেভিডকে এখন একটা কঠিন কঠোর সিদ্ধান্ত নিতেই হবে।

ক্লিপড্রিফটে ফিরে আসার পর সে অনেকক্ষণ ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করল। কোম্পানিটা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে হবে, এমন একটা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, যে বিষয়ে তার প্রাথমিক জ্ঞান নেই। সে একজন আমেরিকান, কিন্তু আমেরিকা এখন তার কাছে একটা বিদেশী রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছু নয়। সে পৃথিবীর অন্যতম বড় কোম্পানির একটা অত্যন্ত উঁচু পদে আসীন। এই কাজটাকে সে ভালোবাসে। জেমি এবং মার্গারেট ম্যাকগ্রেগর তার প্রতি ভালো আচরণ করে এসেছে। এখন কেটি। ছোট্টবেলা থেকে কেটিকে সে চোখের সামনে থেকে দেখেছে। আহা, সেই দুষ্ট-দুষ্টু চেহারার ছেলে-ছেলে স্বভাবের মেয়েটি এখন কত পাল্টে গেছে। এখন কেটিকে এক অসামান্য রূপবতী তরুণী বলা যেতে পারে।

কেটির সমস্ত জীবনের ছবিগুলো ফটো অ্যালবামে সাঁটা আছে। সে পাতার দিকে তাকাল– আহা, কেটির বয়স তখন মাত্র চার, আট, দশ, চোদ্দো, একুশ– অসামান্য কিছু অনুভূতি।

ক্লিপড্রিফটের ট্রেন এসে গেছে।

ডেভিড ঠিক করল, সে ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেড ছেড়ে দেবে না।

সে গাড়ি চালিয়ে সোজা গ্রান্ড হোটেলে পৌঁছে ওনীলের ঘরে গেল।

জোসেফাইন দরজা খুলে বলল- ডেভিড?

ডেভিড জোসেফাইনকে জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁটে উষ্ণ চুমুর চিহ্ন এঁকে দিল। বুঝতে পারল, জোসেফাইন উন্মুখ হয়ে তাকে আদর করতে চাইছে।

ডেভিড, তোমাকে না দেখে আমি থাকতে পারিনি। তুমি আর কখনও আমার কাছ থেকে দূরে চলে যেও না।

***

মনের ভেতর নানা অশান্তি। ডেভিড অপেক্ষা করছে, কখন কেটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরবে। সিদ্ধান্তটা সে নিয়েই ফেলেছে। একটা নতুন জীবন শুরু করতে হবে। কখন জোসেফাইনকে বিয়ে করবে তা নিয়ে চিন্তা করছে।

এখন কেটি ফিরে এসেছে, কেটির সামনে দাঁড়িয়ে সে বলল- আমি বিয়ে করতে চলেছি।

এই শব্দগুলো কেটিকে আচ্ছন্ন এবং অবাক করেছে। হঠাৎ সে যেন অজ্ঞান হয়ে যাবে। কোনো রকমে সে ডেস্কটা ধরে উঠে দাঁড়াল আমাকে মরতে হবে, হ্যাঁ, আমাকে শান্তভাবে মরতে দাও।

হঠাৎ সে বলল, মুখে হাসি এনে ডেভিড, ওর কথা বলো।

তার কণ্ঠস্বরে এক অদ্ভুত নীরবতা ও কে?

–ওর নাম জোসেফাইন ওনীল। বাবার সঙ্গে এখানে এসেছিল। আমি জানি, তোমার সাথে ওর বন্ধুত্ব হবে। কেটি, ভয় নেই, মেয়েটি কিন্তু ভীষণ সুন্দরী আর ভালো স্বভাবের।

-হ্যাঁ, ডেভিড, তুমি যাকে ভালোবাসো, সে তো ভালো হবেই।

ডেভিড কিছু বলার চেষ্টা করছিল– কেটি, আমি এই কোম্পানিটা ছেড়ে দেব।

সমস্ত পৃথিবী বুঝি হুড়মুড় করে কেটির পায়ের তলায় ভেঙে পড়েছে–হ্যাঁ, বিয়ে করার জন্য তুমি কোম্পানি ছাড়বে কেন?

না, ঠিক তা নয়, জোসেফাইনের বাবা সানফ্রানসিসকোতে একটা নতুন ব্যবসা শুরু করতে চলেছেন। আমায় সেখানে যেতে হবে।

তার মানে? তুমি এখন থেকে সানফ্রানসিসকোতে থাকবে?

-হ্যাঁ, ব্রাড রজারস আমার কাজটা ভালোভাবে করতে পারবে। কেটি, আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না, নিজের সাথে লড়াই করে কীভাবে এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছি।

-ঠিক আছে, ডেভিড। তুমি কাউকে ভালোবাসলে আমার কী বলার আছে? কখন আমি ওই নববধুটির সাথে দেখা করব।

ডেভিড হাসল– কেটির কাছে এই খবরটা দিতে পেরেছে, এখন অনেকটা হালকা লাগছে। সে বলল- আজ রাতে তুমি কি ফাঁকা আছে?

-হ্যাঁ, আমি অবশ্যই যাব।

কেউ দেখতে পেল না। কেটির দুচোখ দিয়ে তখন অবিরত অশ্রুধারা নির্গত হচ্ছে।

***

তারা চারজন ম্যাকগ্রেগর ম্যানসানে ডিনারের আসরে বসেছে। কেটি যখন জোসেফাইনকে দেখল, তখন অবাক হয়ে গেল। সত্যি জোসেফাইনের মধ্যে একটা আলাদা আভিজাত্য আছে। তার উপস্থিতিটা সমস্ত পরিবেশকে পাল্টে দিয়েছে। তার সামনে কেটি কিছুই নয়। একটা কুৎসিত এবং শয়তানি। হ্যাঁ, ব্যাপারটা আরও খারাপ হল জোসেফাইন এত সুন্দরী? আভিজাত্যের সাথে সৌন্দের্যের সংমিশ্রণ। ডেভিডকে সে খুবই ভালোবাসে।

ডিনার খেতে খেতে টিম ওনীল কেটিকে তার নতুন ব্যবসা সম্পর্কে অনেক কথা বলছিলেন।

কেটি চোখ বড়ো বড়ো করে শোনার ভঙ্গি করছিল। কেটি শেষ পর্যন্ত বলল- ব্যাপারটা খুবই আকর্ষক।

ওনীল বললেন– না, আপনার কোম্পানির মতো অত বড়ো নয়। আমরা খুব ছোটো থেকে শুরু করতে চাইছি। তবে ডেভিড যখন আছে, আমি সুনিশ্চিত, কোম্পানিটা একদিন বড়ো হবেই।

ওর এই কথায় কেটি সম্মতি জানিয়ে বলেছিল–হ্যাঁ, ডেভিডের মতো মানুষ পেয়েছেন, আপনার চিন্তা অনেকটা দূর হয়ে গেছে।

এই সন্ধ্যের স্মৃতিটা কেটি ভুলে থাকার চেষ্টা করবে। মাঝে মধ্যেই সে তাকাচ্ছিল ডেভিড এবং জোসেফাইনের দিকে। বেশ বুঝতে পারছিল, তারা ট্যারা চোখে একে অন্যকে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করছে। মাঝে মধ্যে হাতে হাত এবং ঠোঁটের কোণ থেকে উথলে ওঠা মিষ্টি-দুষ্ট আমন্ত্রণ হাসির চিহ্ন। কেটির মন তখন খুবই খারাপ। হায় ঈশ্বর, আমি কেন আত্মহত্যা করতে পারছি না।

হোটেলে ফেরার পথে জোসেফাইন বলল- ওই মেয়েটি তোমাকে খুব ভালোবাসে, ডেভিড।

ডেভিড হেসে বলেছে কে? কেটিং ও তো এই একটুকরো এক ছোট্ট মেয়ে। ওকে আমি জন্মাতে দেখেছি। একদিন দেখো ও তোমাকেও খুব ভালোবাসবে।

জোসেফাইন হাসি গোপন করে ভাবল- হায়! ছেলেরা কেন এত বোকা হয়!

***

পরের দিন সকালবেলা, ডেভিডের অফিস। টিম ওনীল আর ডেভিড মুখোমুখি বসে আছে।

ডেভিড বলল- মাস দুয়েক সময় লাগবে, আমি ভাবছি যে টাকাটা লাগবে, এটা শুরু করতে, তার কী ব্যবস্থা হবে! বড়ো কোম্পানিগুলোর সাথে কথা বলা যেতে পারে হয়তো। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারটাতে আমার কোনো অধিকার নেই। আমার মনে হয় নিজেরাই লগ্নি করা উচিত। আশি হাজার ডলার পেলে তবে বোধহয় কাজ শুরু হতে পারে। আমার হাতে প্রায় চল্লিশ হাজার ডলার আছে, আরও চল্লিশ হাজার ডলার লাগবে।

টিম ওনীল বললেন আমার হাতে দশ হাজার ডলার আছে। আমার এক ভাইয়ের কাছ থেকে হাজার পাঁচেক ডলার আনতে পারব।

ডেভিড বলল- তাহলেও আমরা পঁচিশ হাজার ডলার জোগাড় করতে পারব না। ব্যাংক থেকে টাকা ধার নিলে কী হয়।

ওনীল বললেন- আমরা এখনই সানফ্রানসিসকোতে চলে যাব। তোমার জন্য সব কিছু সাজিয়ে ফেলব কেমন?

.

জোসেফাইন আর তার বাবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে রওনা হল।

কেটি বলেছিল আমাদের প্রাইভেট রেলওয়ে গাড়িতে করে ওদের পাঠালে কেমন হয়? অন্তত কেপটাউন পর্যন্ত।

-তাহলে ভালোই হবে, কেটি।

জোসেফাইন চলে গেল। ডেভিডের মনে হল, তার হৃদয়ের আদ্ধেকটা কেউ যেন কেড়ে নিয়েছে। কখন সে সানফ্রানসিসকোতে যাবে তাই নিয়ে চিন্তা করতে থাকল।

পরের কয়েক সপ্তাহ দারুণ কর্মব্যস্ততার মধ্যে কেটে গেল। ব্রাড রজারসকে সব বোঝাতে হচ্ছে। আরও কয়েকজন সম্ভাব্য ব্যক্তিদের নামের তালিকা তৈরি হল। ডেভিড আর ব্রাড নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে।

কিন্তু উপযুক্ত লোক কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত এ মাসের দিকে তারা চারজনকে নির্বাচিত করল। তারা ব্রাড রজারসের সঙ্গে কাজ করবে। তারা বাইরে কর্মরত। অতি শীঘ্র তাদের এখানে ডেকে আনা হবে। প্রথম দুজনের ইন্টারভিউ ভালোই হল। কেটি ডেভিড এবং ব্রাডকে বলেছিল, এদের মধ্যে একজনকে নিতে হবে।

পরের দিন সকালবেলা তৃতীয় জনের ইন্টারভিউ শুরু হল। ডেভিড কেটির ঘরে ঢুকে পড়ল। তার মুখ বিবর্ণ।

সে বলল আমার চাকরিটা কি এখনও আছে, নাকি কি আমাকে বিতারিত করা হয়েছে?

কেটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল, কিছু একটা হয়েছে। সে দাঁড়িয়ে উঠে প্রশ্ন করল- কী হয়েছে, ডেভিড?

ডেভিড কোনো কথা বলতে পারছে না। সে শুধু বলল কিছু একটা ঘটেছে।

কেটি ডেস্কের পেছনে পৌঁছে গেল। তারপর জিজ্ঞাসা করল- কী হয়েছে, খুলে বল।

–আমি এইমাত্র টিম ওনীলের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। উনি ব্যবসাটা বিক্রি করে দিয়েছেন।

তার মানে কী?

হ্যাঁ, আমি যা বলছি সব সঠিক। উনি দু-লক্ষ ডলার পেয়েছেন, এমন কী এটা রয়ালটিও পেয়েছেন।

ডেভিডের কণ্ঠস্বরে তিক্ততা।

ওখান থেকে ম্যানেজার নেওয়া হয়েছে। উনি আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এত টাকার ব্যাপার উনি উপেক্ষা করতে পারেননি।

কেটি ডেভিডের দিকে তাকাল- জোসেফাইন? সে কী বলেছে? সে নিশ্চয়ই এ ব্যাপারটাতে রেগে গেছে?

সে একটা চিঠি দিয়েছে। সে বলেছে, আমাকে এখনই সানফ্রানসিসকোতে চলে যেতে। সেখানে গেলেই সে আমাকে বিয়ে করবে।

তাহলে তুমি যাচ্ছো কি?

না, আমি যাচ্ছি না। ডেভিড রাগে ফেটে পড়েছে। আমি ওটাকে একটা মস্ত বড়ো কোম্পানি করতে পারতাম। কিন্তু তারা তাড়াহুড়ো করতে গেল।

-ডেভিড, তুমি তারা বলছ কেন? শুধু ওনীলের কথা বলল।

না, জোসেফাইনের অনুমতিতেই ব্যাপারটা করা হয়েছে।

–ডেভিড, আমি কী বলব বুঝতে পারছি না।

–কিছুই বলার নেই, আমার জীবনের সবথেকে বড়ো ভুলটা করলাম।

কেটি ডেস্কে চলে গেল। সম্ভাব্য প্রার্থীদের তালিকা যে কাগজে লেখা ছিল সেটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল।

***

কয়েকটা সপ্তাহ কেটে গেছে। ডেভিড আবার কাজের মধ্যে ঢুকে গেছে। এই তিক্ততার কথা ভুলে গেছে। জোসেফাইনের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিল। চিঠিগুলো বাজে কাগজের বাক্সে ফেলে দিয়েছে। পড়ে পর্যন্ত দেখেনি। না, ওই মেয়েটিকে মনের জগত থেকে বিদায় দিতে হবে। কেটি ডেভিডের যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারছে। কিন্তু এখন আর আগ্রহ কিংবা কৌতূহল দেখাতে পারছে না।

***

টিম ওনীলের কাছ থেকে চিঠি পাবার পর দেখতে দেখতে ছটা মাস কেটে গেছে। কেটি এবং ডেভিড আবার আগের মতো পাশাপাশি বসে কাজ করছে। নানা জায়গাতে, যাচ্ছে। একা একা সময় কাটাচ্ছে। কেটি সবসময় ডেভিডের ক্ষত উপশম করার চেষ্টা করছে। কেটির কথা মতোই ডেভিড পোশাক পরে, বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যায়। কেটি চেষ্টা করছে ডেভিডের জীবনের পূর্ণতা এনে দিতে। কিন্তু বেশি দূর এগোতে সে চাইছে না। শেষ পর্যন্ত সে তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলল।

ডেভিড এবং সে রিও-ডি-জেনেরোতে গিয়েছিল। একটা নতুন খনির অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে। তারা হোটেল ডিনার শেষ করল, কেটি ঘরে ফিরে এল। সে একটা সুন্দর কিমোনো এবং স্লিপার পরেছে। গল্প শেষ হয়ে গেল।

ডেভিড হাত বাড়িয়ে বলল- আজকের মতো যথেষ্ট। এবার তুমি শুতে যাবে।

কেটি শান্তভাবে জবাব দিল- তুমি কি এখন শোক প্রকাশ করবে?

অবাক হয়ে ডেভিড বলল– কীসের জন্য?

–জোসেফাইন ওনীলের জন্য।

–ও আমার জীবন থেকে চলে গেছে।

–তাহলে সেই ধরনের ব্যবহার করো।

–তুমি কী বলতে চাইছ, আমি বুঝতে পারছি না, কেটি।

কেটি এখন ভীষণ রেগে গেছে। সে ডেভিডের দিকে তাকিয়ে বলল- তুমি এখনও বুঝতে পারছ না, আমি কী বলতে চাইছি? আমাকে চুমু দাও।

-কী বললে?

ডেভিড, আমি তোমার বস, আমি যা বলব, তাই তোমায় করতে হবে। আমাকে চুমু দাও।

সে জোর করে ডেভিডকে চুমু খেল। তাকে জড়িয়ে ধরল। সে বুঝতে পারল, ডেভিড তাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে এবং অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত ডেভিড আস্তে আস্তে কেটিকে চুমু দিল।

-কেটি?

ঠোঁটে ঠোঁট মিশে গেছে, শেষ অব্দি কাঁদতে কাঁদতে কেটি বলল- আমি ভাবতে পারিনি, তুমি এমন ব্যবহার করবে।

***

ছ-সপ্তাহ বাদে তারা বিয়ে করল। ক্লিপড্রিফট শহর এত বড়ো অনুষ্ঠান এর আগে কখনও দেখেনি। এই শহরের সবথেকে বড়ো চার্চে বিয়ের অনুষ্ঠানটা হল। টাউনহলে হল রিসেপশন। শহরের সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। পাহাড় প্রমাণ খাবার রাখা হল। বিয়ারের বোতল খোলা হল। হুইস্কি এবং শ্যামপেনের ছড়াছড়ি। সংগীত বিশারদেরা আনন্দের গান বাজাচ্ছিল। সূর্য যখন এল, এই বিনোদনের আসর শেষ হল। ডেভিড এবং কেটি ফিরে গেল।

কেটি বলল– আমি এক ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হব, তুমি এসো এসো কিন্তু।

.

ভোরের আলো ফুটব-ফুটব করছে। কেটি বিরাট বাড়িতে একলা প্রবেশ করল। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে গিয়ে বেডরুমে ঢুকে পড়ল। সে একটা পেইন্টিং-এর দিকে তাকাল। ফ্রেমের ওপর বোম লাগানো আছে। বোতামে হাত দিল। পেইন্টিংটা একটুখানি সরে গেল। একটা সেফ বেরিয়ে এসেছে। সে সাবধানে ওটা খুলল। হ্যাঁ, এই তো শর্তের কাগজটা রয়েছে। থ্রি স্টার মিট প্যাকিং কোম্পানি, শিকাগো। কেটি ম্যাগগ্রেগর সেটা কিনে নিয়েছে। আহা, টিম ওনীলের কাছ থেকে, সবকিছু। দু-লক্ষ ডলার দিয়ে। কেটি

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। তারপর কাগজগুলো ঠিক জায়গাতে রেখে দিল। ডেভিড এখন আমার, চিরদিন ডেভিড আমার থাকবে। ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেড কোম্পানি, আমরা দুজনে মিলে এই কোম্পানিকে পৃথিবীর সবথেকে সফল সংস্থায় পরিণত করব। জেমি এবং মার্গারেট ম্যাকগ্রেগর হয়তো এটাই চেয়েছিলেন।

ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেড

তৃতীয় পর্ব

ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেড
১৯১৪-১৯৪৫

১৬.

এটা হল সেই লাইব্রেরি, একদা যেখানে ব্রান্ডির গ্লাস হাতে জেমি বসে থাকতেন। এটাই বোধহয় সত্যিকারের মধুচন্দ্রিমা।

কেটি এবং ডেভিড বসে আছে।

কেটি কথা বলার চেষ্টা করছে। মাঝে মধ্যে ডেভিডের চুলে হাত বোলাচ্ছে। হা, পুরুষ শরীরের উষ্ণতা তাকে অবাক করে দিচ্ছে। এখন একে আমি সম্পূর্ণ অধিকার করেছি। সারাজীবন একে পাগলের মতো ভালোবাসব। তারা একে অন্যের দিকে এগিয়ে গেল। চোখে চোখ, কাছে আসতে চাইছে। হ্যাঁ, এই প্রথম ডেভিড অনুভব করল, কেটি অসাধারণ স্তনের অধিকারিনী। কেটির মুখ থেকে শিৎকারের শব্দ। ডেভিডের শরীর পৌঁছে গেছে এখানে সেখানে। শেষ পর্যন্ত সে নরম ত্রিভুজ ত্রিকোণে পৌঁছে গেল। আহা, কালো ভেলভেটের গালচে পাতা। ধীরে ধীরে সেখানে আঙুলের আদর দিল।

কেটি ফিসফিসিয়ে বলছে- আমাকে গ্রহণ করো, ডেভিড।

তারা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরেছে। একজন অন্যজনের পৌরুষের পরিচয় পাচ্ছে। হ্যাঁ, ডেভিড তার শরীরটাকে কেটির ওপর সংস্থাপন করল। পুংদণ্ডটা ভেতরে প্রবেশ করাল। তালে তালে দুটো শরীর একবার ওপরে উঠছে, আবার নীচে নামছে। মনে হচ্ছে বোধহয় সমুদ্রে কোথাও ঝড় উঠেছে। হা, শেষ অব্দি কেটি এই অবস্থাটাকে সহ্য করতে পারল না। মুহূর্তের মধ্যে গহ্বরের অভ্যন্তরে বিপুল বিস্ফোরণ ঘটে গেল। আহা, আমার বোধহয় মৃত্যু হল। কেটি ক্ষণকালের জন্য ভাবল, আমি এক লহমায় স্বর্গের বাসিন্দা হয়ে গেলাম।

***

তারা সমস্ত পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াল। প্যারিস, জুরিখ, সিডনি, নিউইয়র্ক। কোম্পানির ব্যবসার জন্য যেখানেই তারা গেছে, নিজেদের জন্য কিছুটা সময় বের করেছে। সমস্ত রাত ধরে গল্প করেছে। ভালোবেসেছে, শরীর এবং মনকে অধিকার করার চেষ্টা করেছে। ডেভিডের সাহচর্যে কেটির মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রোজ সকালে সে স্বামীর ঘুম ভাঙিয়েছে। নতুন ছলাকলায় নিজেকে প্রকাশ করেছে। তারপর? শুরু হয়েছে ব্যবসায়িক সম্মেলন। সেখানে আরও বেশি সময় দিতে হয়েছে। ব্যবসা সম্পর্কে কেটির একটা স্বাভাবিক আগ্রহ আছে। সাধারণত এটা দেখা যায় না। মেয়েরা ব্যবসার ব্যাপারে উদাসীনতা অবলম্বন করে থাকে। কেটি কিন্তু সব ব্যাপারেই ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি সে মনোভাব পাল্টাতে পারে। নতুন নতুন মেশিন নিয়ে খেলতে ভালোবাসে। ডেভিড তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এই পৃথিবীতে কেটি বিজয়িনী হবার জন্য জন্মেছে। যে জিনিসকে সে করায়ত্ত করতে চায়, তা হল অপরিমাপ্য

ক্ষমতা। শেষ পর্যন্ত আর একটা হনিমুন শেষ হল, ডাকহারবারে সেই সিডারহিল হাউসে।

***

১৯১৪ সালের ২৮শে জুন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথা শোনা যাচ্ছে। কেটি এবং ডেভিড এসেছে সাসেকসে। এখানে একটি কাউন্ট্রি হাউসে তারা দিন কাটাচ্ছে। সপ্তাহ শেষে আনন্দের আসর। হৈ-হৈ শুরু হয়ে গেছে। আহা, এত অবসর, এত আনন্দ।

ডেভিড বলেছিল– এখানে আর কতদিন থাকব?

-হ্যাঁ, কিছুদিন তো কাটাতেই হবে। তারপর বাড়ি যাব। সেখানে না হয় আবার অন্যভাবে আদর করা যাবে।

ডিনারের আসরে একটা খারাপ খবর এল। অস্ট্রিয়ান হাঙ্গেরিয়ান সিংহাসনের উত্তরধিকারী ফ্রান্সিস ফার্দিনান্দ এবং তার স্ত্রী সোফিয়াকে হত্যা করা হয়েছে।

লর্ড ম্যানি, তার কর্তা। বললেন– এক মহিলাকে মেরে ফেলা হল। বালকান প্রদেশে যে কোনো সময় যুদ্ধ বেঁধে যাবে।

এরপর যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা হল।

বিছানাতে শুয়ে কেটি বলেছিল– সত্যি সত্যি ডেভিড, যুদ্ধ হবে কি?

-হ্যাঁ, ঠিক বুঝতে পারছি না। কে একজন আর্চ ডিউকের মৃত্যু হয়েছে তা নিয়ে যুদ্ধ।

***

অনুমানটা মিথ্যে প্রমাণিত হল। সার্বিয়াকে সন্দেহ করা হল। ভাবা হল ফার্দিনান্দকে সার্বিয়ার কোন আততায়ী হত্যা করেছে। অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরি সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। অক্টোবরের মধ্যে পৃথিবীর সবকটা শক্তি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। এটা এক নতুন ধরনের যুদ্ধ। এই প্রথম অতি উন্নত অস্ত্র ব্যবহার করা হল। এরোপ্লেনের পাশাপাশি এয়ার এবং সাবমেরিন ব্যবহৃত হল।

যেদিন জার্মানি যুদ্ধে যোগ দিল, কেটি বলল- হ্যাঁ, একটা দারুণ সুযোগ এসেছে আমাদের হাতে।

ডেভিড জানতে চেয়েছিল– তুমি কী বোঝাতে চাইছ?

বিভিন্ন দেশ যুদ্ধ করছে। তাদের এখন অনেক অস্ত্র লাগবে।

-তারা ওই অস্ত্র আমাদের কাছ থেকে কিনবে কেন? কেটি, অনেক ব্যবসা হয়েছে, মানুষের রক্তের বিনিময়ে আর ব্যবসা করে কী লাভ?

-তুমি বোকার মতো কথা বলো না। আমরা এই ব্যবসা না করলে অন্য কেউ তো করবে?

না, যতদিন আমি এই কোম্পানির সঙ্গে থাকব, আমি বাধা দেব। এই ব্যাপারটা নিয়ে ভবিষ্যতে আলোচনা না করলেই ভালো হবে, কেটি। ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে গেল।

কেটির মনে হল, ডেভিডকে ব্যবসার মধ্যে না জড়ালেই বোধহয় ভালো হত।

বিয়ের পর এই প্রথম সে একলা শুলো। ভাবল, ডেভিড এত বোকা আর আদর্শবাদী হল কী করে?

ডেভিড ভেবেছিল, মেয়েটা এত পাল্টে গেল। ব্যবসাটাকে নির্মম হৃদয়হীন করে দিয়েছে। দিনগুলো কাটছে অস্থিরতার মধ্যে। হ্যাঁ, একটা আবেগ তাড়িত ঘৃণা দেখা দিয়েছে। ডেভিড জানে না, কীভাবে এই সম্পর্কটাকে আবার সেতু দিয়ে বাধা যেতে পারে। কেটিকে আরও গর্বিত মনে হচ্ছে। অহংকারে ফেলতে চাইছে না বুঝি।

***

প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ঘোষণা করেছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো অবস্থাতেই যুদ্ধে যোগ দেবে না। শেষ পর্যন্ত তার সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। মিত্রপক্ষের তরফ থেকে মার্কিন দেশের কাছে অনুরোধ করা হল, এই যুদ্ধে যোগ দিতে। তখন একটা শ্লোগান উঠল- পৃথিবীটাকে গণতন্ত্রের পক্ষে আদর্শ স্থান করা উচিত।

ডেভিড দক্ষিণ আফ্রিকাতে বসে যুদ্ধের নানা খবর পাচ্ছে। বোঝা গেল, এবার যুদ্ধটা বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। শেষ পর্যন্ত তাই হল।

একদিন কথা বলতে বলতে ডেভিড কেটিকে বলল- আমি এক আমেরিকান, আমার এখন যুদ্ধে সাহায্য করা উচিত।

তোমার বয়স ছেচল্লিশ বছর।

–তাতে কী হয়েছে, আমি প্লেন চালাতে পারি। আমার দেশ আমাকে ডাকছে।

কেটি কিছুতেই ডেভিডকে বাধা দিতে পারল না। কয়েক দিন তারা শান্তভাবে কাটাল। এই ঘৃণার কথা ভুলে গেল। আবার একে অন্যকে ভালোবাসল।

ডেভিড এবার ফ্রান্সে চলে যাবে, সে বলল- তুমি এবং ব্রাড রজারস ব্যবসাটা ভালোভাবে চালিও কিন্তু।

-তোমার কিছু হলে কী হবে?

না, আমার কিছুই হবে না, আমি মেডেল গলায় ঝুলিয়ে তোমার কাছে ফিরে আসব। পরের দিন সকালবেলা সে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেল।

***

ডেভিডের অনুপস্থিতি কেটি কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। অনেক দিন ধরে অনেক অপেক্ষা এবং ষড়যন্ত্র করে সে ডেভিডকে অধিকার করেছে। এখন যদি ডেভিড তার জীবন থেকে চলে যায়, তাহলে কী হবে। সব সময় সে একটা অজ্ঞাত আততায়ীর কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। শান্ত রাস্তায় কে যেন হঠাৎ হেসে উঠেছে। একটা শব্দ, একটা গান,

ডেভিডের উপস্থিতি সে সর্বত্র অনুভব করতে পারছে। ডেভিডকে প্রত্যেক দিন সে লম্বা চিঠি দেয়। ডেভিডের কাছ থেকে চিঠি এলে বারবার পড়তে থাকে পড়তে পড়তে কাগজ কুচি কুচি হয়ে যায়। হ্যাঁ, ডেভিড ভালো আছে। জার্মানরা আকাশ যুদ্ধে আধিপত্য দেখিয়েছে, আমেরিকা এখন এই লড়াইতে নেমে পড়বে। ডেভিড মাঝে মধ্যেই চিঠি লিখছে।

তোমার যেন কিছু না হয়, ডার্লিং, তুমি কেন আমাকে ছেড়ে যুদ্ধে গেলে।

নিঃসঙ্গতার অভিশাপ ভোলার জন্য এখন কেটি আরও বেশি করে ব্যবসায় মন দিয়েছে। যুদ্ধের প্রথম দিকে ফ্রান্স এবং জার্মানি ইওরোপের শক্তিশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু মিত্রশক্তির হাতে আরও বেশি সৈন্য আছে, তাদের রসদের অভাব নেই। রাশিয়া বিশ্বের সবথেকে বড় পদাতিক বাহিনীর অধিকর্তা। কিন্তু তাদের অভাব আছে অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রশাসনের।

কেটি ব্রাড রজারসকে বলেছিল ওদের সকলকে সাহায্য করতে হবে, ট্যাঙ্ক দরকার, বন্দুক দরকার, যুদ্ধের যন্ত্রপাতি।

ব্রাড রজারস অসহিষ্ণু হয়ে বলতে চেয়েছিল কেটি, ডেভিড কিন্তু এইভাবে চিন্তা করেনি।

–ডেভিড এখন নেই, ব্রাড, এটা তোমার আমার মধ্যে।

ব্রাড রজারস জানে, কেটি বলতে চেয়েছে, এটা তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত।

ডেভিডের এই মনোভাবটা কেটি বুঝতে পারছে না। মিত্রপক্ষের হাতে আরও অস্ত্র দিতেই হবে। কেটির মনে হল, তাকে দেশের প্রতি এই কর্তব্য করতেই হবে। সে অনেকগুলো বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের সাথে কথা বলার চেষ্টা করল। এক বছরের মধ্যে ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেড কোম্পানি বন্দুক এবং ট্যাঙ্ক তৈরির কাজে লেগে পড়ল। এর পাশাপাশি তারা মারাত্মক বোম তৈরি করতে শুরু হল। কোম্পানি ট্রেন, ট্যাক্সি এবং ইউনিফর্ম ও বন্দুক পাঠাতে শুরু করল। ক্রুগার ব্রেন্ট সারা পৃথিবীর অন্যতম সেরা কোম্পানিতে পরিণত হল।

ব্রাড রজারসের দিকে তাকিয়ে কেটি প্রশ্ন করল– এটা দেখেছ? ডেভিডের ধারণা যে ভুল সেটা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?

দক্ষিণ আফ্রিকাতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ উদ্বেল হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন দলের নেতারা মিত্রপক্ষকে সমর্থনের কথা বলছেন। তারা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিতে চাইছেন। অথচ আফ্রিকানদের বেশির ভাগ গ্রেট ব্রিটেনকে সাহায্য করতে চাইছে না। তারা অতি সহজে অতীত ইতিহাস ভুলতে পারবে না।

ইওরোপে যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ঘুরে গেছে। পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধ একটা স্থিতাবস্থায় এসে গেছে। দু-পক্ষই ট্রেঞ্চ করে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য তৈরি হচ্ছে। ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। সৈন্যদের অবস্থা শোচনীয়। প্রবল বৃষ্টিপাতে রণক্ষেত্রে জল এবং কাদার সমাবেশ। বড়ো বড়ো ইউঁর অনায়াসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ডেভিড যে বাতাস যুদ্ধে অংশ নিয়েছে, সেই খবরটা কেটিকে মুগ্ধ করেছে।

১৯১৭ সালের ৬ এপ্রিল। প্রেসিডেন্ট উইলসন যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। হ্যাঁ, আমেরিকা সত্যি সত্যি যুদ্ধে নেমে পড়েছে।

২৬ জুন ফ্রান্সে আমেরিকার বিমান বাহিনী অবতরণ করল। নতুন নতুন প্লেনের নাম সবাইকার মুখে মুখে ঘুরছে। ১১ নভেম্বর যুদ্ধ শেষ হল। মিত্রশক্তিকে হারানো সম্ভব হল না। পৃথিবী আবার গণতন্ত্রের মহান ধারক হয়ে উঠতে পারল।

ডেভিড এবার বাড়িতে ফিরবে।

কেটি তাকে আনতে গেছে। তারা অনেকক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল। চারপাশের চিৎকারকে উপেক্ষা করল। একটু বাদে কেটি ডেভিডকে জড়িয়ে ধরল, অনেকটা রোগা হয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে, ডেভিড খুব ক্লান্ত। কেটি ভাবল কতদিন আমি ওর সাহচর্য পাইনি। তার মনে অনেক প্রশ্নের ভিড়।

সে বলল– আমি তোমাকে সিডারহিল হাউসে নিয়ে যাব। সেখানেই তুমি ভালোভাবে বিশ্রাম নিতে পারবে।

***

ডেভিড আসবে বলে কেটি এই বাড়িটাকে সুন্দরভাবে সাজিয়েছে। ভালো ভালো সোফা পেতেছে, বাগানে ফুলের সমারোহ। ফায়ার প্লেসের ওপরে একটা সুন্দর ক্যানভাস রেখেছে, সেখানে নানা ফুল।

কেটি ডেভিডকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল। তারা অনেকক্ষণ গল্প করল সুন্দরভাবে।

কেটি বলল- কী ভালো লাগছে।

–ভারী সুন্দর, কেটি। একটু বসো। তোমার সাথে আমার কথা আছে।

কেটির মনে আশঙ্কা, কিছু ভুল হয়েছে কি?

–তুমি পৃথিবীর সর্বত্র যুদ্ধাস্ত্র পাঠাচ্ছ, তাই তো?

কেটি বলল- হ্যাঁ, তুমি কি আমাদের হিসাবের খাতাপত্র দেখেছ? আমাদের লাভ কিন্তু আকাশ ছুঁয়েছে।

–আমি অন্য কথা বলছি। আগেও তো আমরা অনেক লাভ করতাম। আমি তোমায় বলেছিলাম, কখনও যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করব না। এটা নীতির প্রশ্ন।

এই কথা শুনে কেটি অত্যন্ত রাগ করল। সে বলল- ডেভিড, সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে সবকিছু পাল্টাতে হয়, তা না হলে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না।

ডেভিড কেটির দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল– তুমিও কি বদলে গেছো নাকি?

বিছানাতে কেটি শুয়ে আছে, নিজেকে প্রশ্ন করছে, কে পাল্টে গেছে? সে, নাকি ডেভিড? সে কি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, নাকি ডেভিড হয়েছে দুর্বল। সে জানে না, এটা নীতির প্রশ্ন, নাকি নেহাতই লাভ লোকসানের খতিয়ান। হয়তো এর সপক্ষে কোনো

কথাই বলা যাবে না। আমি তৈরি না করলে অন্য কোনো কোম্পানি তৈরি করত। তারা অনেক লাভ করত, ডেভিডের মাথায় কী এতটুকু বুদ্ধি নেই? এতদিন কেটি ভাবত, ডেভিড পৃথিবীর সবথেকে বুদ্ধিমান পুরুষ। এখন সেই ভাবনাটা পাল্টাতে হবে।

সকালবেলা কেটি এবং ডেভিড ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে আছে। তারা বাগানে চলে গেল। ডেভিড বলল ভারি ভালো লাগছে।

কেটি বলল–গতকাল রাতের কথাবার্তা?

–ওটা তো শেষ হয়ে গেছে। তুমি ঠিক কথাই বলেছ। আমি- কেন তোমার ব্যাপারে মত প্রকাশ করব?

কেটি অবাক হয়ে গেছে, এখন সে কোনো কথা বলতে চাইছে না। হ্যাঁ, কোম্পানি তো তার স্বার্থেই এসব কাজ করেছে। তা হলে? কোম্পানি কি আমার বিয়ের থেকে বড়ো? নিজের মনে এই প্রশ্নটা এসেছে, কেটি জানে না, কীভাবে উত্তর দেবে?

.

১৭.

পরবর্তী পাঁচ বছর সারা পৃথিবী অসাধারণ উন্নয়নকে প্রত্যক্ষ করেছে। ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেড আরও উন্নত হয়ে উঠেছে। শুধু হিরে আর সোনা তুলেই তারা কাজ শেষ করছে না–সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন দিকে ব্যবসাকে ছড়িয়ে দিয়েছে। এখন আর শুধুমাত্র

দক্ষিণ আফ্রিকাতেই তার মূল কেন্দ্র নেই। তারা একটা বিরাট প্রকাশনা জগতকে কিনেছে। ইনসিওরেন্স কোম্পানিও কিনে নিয়েছে।

একরাতে কেটি ডেভিডকে ঘুম থেকে তুলে বলল- ডার্লিং, চলো, আমরা এই কোম্পানির হেড কোয়ার্টারটাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাই।

ডেভিড জানতে চাইল তার মানে?

–আজকে পৃথিবীর ব্যবসার কেন্দ্র হয়েছে নিউইয়র্ক। সেখানে আমাদের হেড কোয়ার্টার স্থাপন করতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকাতে কেউ চট করে আসতে চাইছে না। এখন তো আমরা টেলিফোন এবং কেবল ব্যবহার করতে পারব। এক মিনিটের মধ্যে যে কোনো অফিসের সঙ্গে সংযোগ করতে পারব।

–আগে একথাটা কেন ভাবোনি? ডেভিড কথা বলার চেষ্টা করে আবার ঘুমের ঘোরে তলিয়ে গেল।

***

হ্যাঁ, নিউইয়র্ক একটা নতুন জগৎ। আগে যারা নিউইয়র্কে গেছে, তারা অবাক হয়ে যাবে। কেটিও অবাক হয়ে গেল। পৃথিবী কত দ্রুত পাল্টাচ্ছে, নিউইয়র্ক দেখে এলে সেই সত্যটা উপলব্ধি করা যায়।

কেটি এবং ডেভিড নতুন কোম্পানির হেড কোয়ার্টারের জন্য একটা জায়গা নির্বাচন করল। সেটা ওয়াল স্ট্রিটে অবস্থিত। স্থপতিরা কাজ করতে শুরু করলেন। কেটি আর একজন স্থপতিকে ডেকে পাঠাল। ফিফথ এভিনিউতে ষোড়শ শতাব্দীর একটা ফরাসি ম্যানসন স্থাপন করতে হবে।

ডেভিড অভিযোগ জানিয়ে বলেছিল– শহরটাতে এত শব্দ।

কথাটা সত্যি, হ্যাঁ, প্রত্যেক মুহূর্তে শব্দের উতরোল। মনে হচ্ছে এই শহরটা বুঝি স্বর্গের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠবে। হ্যাঁ, নিউইয়র্ক আজ ব্যবসার মক্কা হয়ে উঠেছে। বড়ো বড়ো কোম্পানির হেডকোয়ার্টার এই শহরে অবস্থিত। জাহাজ কোম্পানি থেকে ইনসিওরেন্স, যোগাযোগ এবং পরিবহন। হ্যাঁ, এই শহরের মধ্যে একটা আশ্চর্য জীবন উম্মাদন আছে। কেটি সেটাকে ভালোবাসে, তবে ডেভিড পছন্দ করতে পারে না।

-ডেভিড, এটাই হল ভবিষ্যৎ। এই জায়গাটা দ্রুত বাড়ছে। আমাদেরও তাল দিয়ে চলতে হবে।

-হায় ঈশ্বর, কেটি, তুমি আর কী চাও?

কোনো কথা না বলে কেটি বলেছিল– আমি সব কিছু করায়ত্ত করতে চাই।

ডেভিডের এই প্রশ্নের অন্তরালে কী আছে, কেটি জানত না, এটা একটা মজার খেলা, এই খেলাতে জিততেই হবে। ডেভিড কেন বুঝতে পারছে না। ডেভিড একজন ভালো ব্যবসাদার, কিন্তু তার মধ্যে কোনো কিছু একটার অভাব আছে, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি, জেদ,

যার সাহায্যে মানুষ বড়ো হয়ে ওঠে। সবথেকে বড়ড়া হতে হবে, এমন একটা অদম্য মনোভাব। তার বাবার মধ্যে সেই আত্মবিশ্বাস ছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে কেটি সেটা পেয়েছে। কেটি জানে না, কী ঘটনা ঘটবে, কিন্তু তার জীবনে যে একটা পরিবর্তন আসছে, সেটা সে অনুভব করতে পারে। কোম্পানিটা এখন আরও উন্নত হয়েছে। আরও বেশি টাকা আয় করতে হবে।

একদিন ডেভিডের কাছে সে তার মনের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছিল।

ডেভিড হাসতে হাসতে বলল– তুমি তো খাটতে খাটতে জীবন শেষ করে দেবে।

না, বাবাকে আমি অনুসরণ করব। তার জন্য যদি কোনো অসুবিধা হয়, তাও আমাকে সহ্য করতে হবে।

কেটি অবাক হয়ে গেছে, কাজ করার মধ্যেই মানুষ জীবনের সব থেকে বেশি আনন্দ খুঁজে পায়। প্রত্যেক দিন সকালে তার সামনে অনেক সমস্যা দেখা দেয়, প্রত্যেকটি সমস্যা একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে। এমন একটা ধাঁধা, যা সমাধান করতে হবে। এমন একটা খেলা, যা জিততে হবে। কেটি সেই খেলাতে অংশ নেয়, ভয়ে পালিয়ে যায় না। শেষ পর্যন্ত ওই খেলায় সে জিতে যায়। সে জানে, সে এখন এমন ক্ষমতা করায়ত্ত করেছে, যা লক্ষ মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে।

তাকে প্রায় রাজা এবং রানিদের সাথে নৈশভোজে মিলিত হতে হয়। বিভিন্ন দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতিরা পর্যন্ত তার কাছে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়ে দেন। সকলেই তার সাহায্য প্রার্থী। তার ভালোবাসা পেতে ইচ্ছুক। নতুন ক্রুগার ব্রেন্ট কোম্পানি মানে হাজার

লোকের চাকরির বন্দোবস্ত। কোম্পানিটা সজীব, দৈত্যের মতো বেড়ে চলেছে। অনেক লোকের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছে। এর জন্য কিছুটা পরিশ্রম তো করতেই হবে। এই দৈত্যকে কখনও স্থানচ্যুত করা যাবে না। কেটি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। এর মধ্যে একটা ছন্দ আছে। একটা স্পন্দন। এই খেলাটায় শেষ পর্যন্ত জিততেই হবে—

***

হঠাৎ কেটির শরীর খারাপ হল। পরবর্তী বছরের মার্চ মাসে। জন হার্টলে নামে একজন ডাক্তারের চেম্বারে ডেভিড তাকে নিয়ে গেল। জন তাকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে বললেন- বিশেষ কোনো চিন্তা করবেন না, কিছুদিন বাদে আমি আপনাকে রিপোর্টটা বলে দেব।

***

বুধবার সকালবেলা কেটি ডাক্তারকে ফোন করল।

ডাক্তার বললেন মিসেস ব্ল্যাকওয়েল, আপনি মা হতে চলেছেন।

কেটির জীবনের অন্যতম উত্তেজক মুহূর্ত, ডেভিড আসা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে পারেনি। ডেভিড এই খবরটা শুনে খুবই আনন্দিত। সে কেটিকে জড়িয়ে ধরে বলল একটা মেয়ে হবে। তোমার মতো দেখতে।

হ্যাঁ, কেটির এটাই দরকার, এখন তাকে আরও বেশিক্ষণ বাড়িতে থাকতে হবে। সে এখন এক সত্যিকারের স্ত্রী হয়ে উঠবে।

কেটি ভাবল– এটা একটা ছেলে হবে। একদিন সে ক্রুগার ব্রেন্ট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হবে।

***

ধীরে ধীরে বাচ্চাটার জন্মের সময় এগিয়ে আসছে। কেটি আর বেশিক্ষণ অফিসে কাজ করতে পারছে না। তা সত্ত্বেও প্রত্যেকদিন অফিসে যায়।

ডেভিড বলল- এখন ব্যবসার কথা ভুলে যাও।

কিন্তু ব্যবসাটা যে কেটির অবসর বিনোদনের জায়গা, ডেভিড কেন তা বুঝতে পারছে না।

ডিসেম্বরে শিশুটার জন্ম হবে। কেটি ডেভিডকে বলেছিল– আমি পঁচিশে ডিসেম্বরের আগেই ছেলেটাকে পৃথিবীতে আনব। সে হবে বড়োদিনের উপহার।

হ্যাঁ, এটা একটা সুন্দর বড়োদিন হবে। কেটি ভাবল। সে এমন একজন মানুষকে ভালোবেসেছিল, যাকে বিয়ে করে এখন সেই ভালোবাসা তাকে জীবনের পরম কাঙ্খিত উপহার দিচ্ছে। এর থেকে বড়ো প্রাপ্তি আর কী হতে পারে?

***

তার সমস্ত শরীরটা বড়ো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কেটি অফিসে যেতে পারছে না। ডেভিড আর ব্রাড রজারস তাকে বাড়ি থাকার কথা বলছে। কিন্তু কেটি জবাব দিচ্ছে, আমার মাথা কিন্তু কাজ করছে।

দেখতে দেখতে আরও কয়েক মাস কেটে গেল। ডেভিড দক্ষিণ আফ্রিকাতে গেছে হিরের খনি পরিদর্শন করতে। পরবর্তী সপ্তাহে সে নিউইয়র্কে ফিরে আসবে।

***

কেটি রজারসের বিষাদঘন মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল কিছু হয়েছে কি? কোনো ক্ষতি?

না, কেটি, আমি এই মাত্র একটা খবর পেয়েছি, একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, পিনিয়েল খনিতে বিস্ফোরণ ঘটেছে।

কেটির মনে আশঙ্কা কী হয়েছে? খারাপ কোনো খবর? কেউ কি মারা গেছে?

ব্রাড কোনোরকমে বলল– দু-জনের মৃত্যু হয়েছে, ডেভিড তাদের মধ্যে একজন।

শেষের শব্দগুলো কেটি যেন শুনতে পাচ্ছে না। এক মুহূর্তে মনে হল, সারা পৃথিবীটা যেন অন্ধকার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সে অবচেতনার অন্ধকারে ডুবে গেল।

***

একঘণ্টা বাদে ছেলেটার জন্ম হল। দুমাস আগে। কেটি তার ছেলের নাম রেখেছে। অ্যান্থনি জেমস ব্ল্যাকওয়েল, ডেভিডের বাবার নামে। সে নবজাতক শিশুটির দিকে তাকিয়ে বলল- আমি তোমাকে ভালোবাসব আমার জন্য, আমি তোমাকে ভালোবাসব তোমার বাবার জন্য।

***

একমাস বাদে কেটি তার ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে ফিফথ এভিনিউ ম্যানসনে উঠে এসেছে। অনেক চাকর ঝি সঙ্গে এসেছে। ইতালি থেকে বিখ্যাত শিল্পীরা এসে বাড়িটাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিয়েছে। যোড়শ শতাব্দীর ইতালিয় ওয়ালনাটের ফার্নিচার রয়েছে। কারুকাজ করা সবকিছু। লাইব্রেরিতে অসাধারণ বই, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফায়ার প্লেস। বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি। তার পাশে ডেভিডের স্মারক চিহ্ন। আর্ট গ্যালারিতে কেটির বিখ্যাত শিল্পীদের ছবি। হ্যাঁ, বাথরুমও তৈরি করেছে। ডাইনিং রুম এবং নার্সারি। অনেকগুলো বেডরুম আছে। এই বিরাট বাড়িটার মধ্যে। বাগানের ভেতর রডিনের তৈরি ভাস্কর্য। বিশ্বের বিখ্যাত শিল্পীদের ছবিও ঝুলছে চারপাশে। এটা সত্যিকারের রাজার প্রাসাদ। একজন রাজা তো এসে গেছে পৃথিবীর বুকে, তাকে ঠিক মতো বড়ো করে তুলতে হবে।

১৯২৮, টনির বয়স চার। কেটি তাকে নার্সারি স্কুলে পাঠাল। ছোট্ট ছেলেটি শান্ত, মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মায়ের মতোই মুখখানা পেয়েছে। কেটি তাকে মন দিয়ে গান শেখাচ্ছে, দশ বছর বয়সে ছেলেটা নাচের স্কুলে ভরতি হল। কখনও কখনও মা

আর ছেলে সিডারহিল হাউসে চলে যায়, কেটি একটা সুন্দর প্রমোদ তরণী কিনেছে। ৮০ ফুট লম্বা একটা নৌকো। তার নাম দিয়েছে কর্সিয়ার। টনি মাঝে মধ্যেই উপকূলের ধারে ঘুরে বেড়ায়। টনির ভীষণ ভালো লাগে এই সমুদ্রযাত্রা।

তারপর? কোম্পনির সম্পর্কে কিছু খবর দেওয়া দরকার। জেমি ম্যাকগ্রেগর যে কোম্পনি স্থাপন করেছিলেন, সেটা এখনও ভীষণভাবে জীবন্ত। এই কোম্পানিই কেটির প্রথম এবং শেষ প্রেমিক। সে একদিনও কোম্পানি ছাড়া কিছু চিন্তা করতে পারে না। কেটি মনে মনে শপথ নিল, এই কোম্পানিকে আমি চিরদিন ভালোবাসব। একদিন এর দায়িত্ব আমি আমার ছেলের হাতে তুলে দেব।

***

কেটির জীবনে একটাই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, তার প্রিয় দক্ষিণ আফ্রিকা। সেখানকার জাতিগত সমস্যা অকাশ ছুঁয়েছে। তাকে মাঝে মধ্যেই এই সমস্যার আগুন আঁচ পোহাতে হয়। দুদিকে দুটো রাজনৈতিক সংগঠন, তাদের মধ্যে দারুণ বৈরীতার সম্পর্ক। সবজায়গা থেকে কালো মানুষদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারা ভোট দেবার অধিকার থেকে নিজেদের বঞ্চিত করতে বাধ্য হয়েছে। বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে অত্যাচারিত হতে হচ্ছে। নতুন আইন তাদের ওপর আঘাত করেছে। যেসব জায়গাতে কোনো খনিজ পদার্থ নেই, নেই কোনো শিল্পকারখানা, সেখানে কালো এবং ইন্ডিয়ানদের জোর করে পাঠানো হচ্ছে।

কেটি চেয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন সরকারী আধিকারিদের সঙ্গে একটা উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের ব্যবস্থা করতে। সেই বৈঠকে কেটি বলেছিল, আপনারা টাইম বোমা নিয়ে খেলা করছেন। আপনারা কেন আশি লক্ষ মানুষকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন?

একজন বলেছিলেন– এটা ক্রীতদাস প্রথা নয়, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। আমরা আমাদের স্বার্থে নয়, তাদের স্বার্থেই এই আইন প্রণয়ন করতে চলেছি।

–আপনি কী পরিষ্কার করে বলে দেবেন?

প্রত্যেক জাতিকে কিছু না কিছু দিতে হবে। যদি কালোরা সাদাদের সমান হয়ে উঠতে চায়, তাহলে তারা তাদের স্বতন্ত্রতা হারাবে। আমরা তাদের স্থানীয় সত্তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি।

ব্যাপারটার মধ্যে কোনো সারবত্তা নেই। কেটি বলেছিল, দক্ষিণ আফ্রিকা কী শেষ পর্যন্ত একটা নরকে পরিরত হবে?

–আপনার অনুমান ঠিক নয়। কালোরা কেন এই দেশে এসেছে, নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। তাদের ওপর কিছু ট্যাক্স বসানো হয়েছে। কিন্তু তা তো দিতেই হবে। পৃথিবীর আর কোথাও সাদাদের পাশাপাশি কালোরা কী মাথা উঁচু করে থাকতে পারে?

এইভাবে আলোচনা এগিয়ে গেল। কেটি বুঝতে পারল, এই আলোচনা করে কোনো লাভ নেই। আবার নিজের দেশের জন্য চিন্তিত হয়ে উঠল সে।

বান্দার কথা তার বারবার মনে পড়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার খবরের কাগজে তাকে এক জঘন্য হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই গল্পগুলোর ভেতর কোনো সত্যি নেই, কেটি জানে, বান্দা নিজেকে শ্রমিক হিসেবে লুকিয়ে রেখেছে। কখনও সে ড্রাইভারের ছদ্মবেশ ধরে, সে গেরিলা আর্মি তৈরি করেছে। পুলিশের ওয়ান্টেড তালিকায় তার নাম আছে। কেপটাউন পত্রিকাতে বান্দা সম্পর্কে একটা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বলা হয়েছে, সে নাকি কালো মানুষদের নয়নের মনি। সে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে চলে যায়, ছাত্রদের সামনে জ্বালাময়ী ভাষায় ভাষণ দেয়। পুলিশ তাকে ধরতে পারছে না। বান্দা চট করে পালিয়ে যায়। বান্দার নাকি ব্যক্তিগত বডিগার্ড আছে। সে বিভিন্ন বাড়িতে রাত কাটায়। কেটি বুঝতে পারছে, মৃত্যুই হবে বান্দার এই অভিযানের একমাত্র ফলশ্রুতি।

কেটিকে যে করেই হোক বান্দার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। সে তার এক পুরোনো কৃষ্ণকায় ফোরম্যানকে ডেকে পাঠাল। এই লোকটিকে সে খুব বিশ্বাস করে।

সে বলল- উইলিয়াম, তুমি কি বান্দাকে বের করতে পারবে?

যদি বান্দা ইচ্ছে করে, তবেই সে ধরা দেবে।

–চেষ্টা করো, আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

–চেষ্টা করে দেখছি।

পরের দিন সকালবেলা ফোরম্যান বলল- আপনি কি আজ সন্ধ্যেবেলা ফাঁকা আছেন? আপনাকে একটা গাড়ি তুলে নিয়ে যাবে।

***

কেটিকে জোহানেসবার্গের সত্তর মাইল দূরে নিয়ে যাওয়া হল। ড্রাইভার গাড়িটাকে একটা ছোট্ট বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়েছে। কেটি ভেতরে ঢুকল। বান্দা ভেতরে ছিল। একই রকম দেখতে লাগছে তাকে। হ্যাঁ, তার বয়স এখন নিশ্চয়ই ষাট বছর, কেটি ভাবল, অনেক দিন ধরে সে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তার চেহারার মধ্যে উত্তেজনার চিহ্ন নেই।

সে কেটিকে জড়িয়ে ধরে বলল তুমি তো আরও সুন্দরী হয়ে উঠেছ।

কেটি হাসল- হ্যাঁ, আমার বয়স হচ্ছে। কয়েক বছরের মধ্যেই চল্লিশে পা দেব।

বয়সগুলো তোমার পাশ দিয়ে পিছলে পালিয়ে গেছে, কেটি।

তারা কিচেন গেল। বান্দা কফি তৈরি করছে।

কেটি বলল- এসব ঘটনা কী ঘটছে বান্দা? তুমি এখনও কেন রাজনীতির মধ্যে নিজেকে জড়াচ্ছ?

–ভবিষ্যৎ আরও খারাপ, বান্দা শান্তভাবে বলল, সরকার কেন আমাদের হাতে সামান্য স্বাধীনতা তুলে দিচ্ছে না। সাদা মানুষরা আমাদের সবকিছু ধ্বংস করছে। তারা সেতুটা

ভেঙে দিয়েছে। একদিন তারা দেখবে, কিছুতেই আর আমাদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারছে না। আমরা এখন নতুন নেতা পেয়ে গেছি কেটি। একের পর এক নতুনের জন্ম হচ্ছে। সাদারা আর আমাদের দমিয়ে রাখতে পারবে না। এতদিন তারা আমাদের সঙ্গে ছাগল কুকুরের মতো ব্যবহার করেছে।

কেটি আশ্বস্ত করে বলল- সবাই কিন্তু নয়। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে এমন অনেকে আছে, যারা তোমাদের সংগ্রামে সাহায্য করে। দেখো, একদিন অবস্থাটা পাল্টে যাবে।

সময় হল বালির ঘড়ি, দ্রুত ফসকে যায়।

বান্দা, তোমার ছেলে আর. বউয়ের খবর কী?

আমার বউ আর ছেলে দুটোই আছে, পুলিশ এখন আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

–আমি কি তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারি? এভাবে চুপচাপ বসে থাকতে খারাপ লাগছে। তোমার কি টাকার দরকার?

-হা, টাকার তো দরকার আছে।

–আমি ব্যবস্থা করছি।

পরের দিন সকালে কেটি নিউইয়র্কে ফিরে এল।

***

টনির এখন একটু বয়স বেড়েছে। সে এখন কেটির সঙ্গে এখানে সেখানে যেতে পারছে। স্কুলের যখন ছুটি থাকে, তখন কেটি তাকে সঙ্গে নিয়ে নানান জায়গায় যায়। টনি মিউজিয়াম দেখতে খুবই ভালোবাসে। বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বাড়িতে টনি দেওয়ালের গায়ে সেইসব ছবি আঁকার চেষ্টা করে। সে কিন্তু অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী।

জীবনের এত রঙ্গরস টনি উপলব্ধি করে। তার চরিত্রের মধ্যে একটা স্বভাবসুলভ লজ্জা আছে। কেটি তার ছেলেকে নিয়ে খুবই গর্বিত। সবসময় ক্লাসে সে প্রথম হয়। মাঝে মাঝেই মায়ের কাছে তার খুশির খবর শুনিয়ে যায়।

১৯৩৬- টনির বারোতম জন্মদিন। কেটি মধ্যপ্রাচ্য থেকে সবেমাত্র ব্যবসায়িক পরিভ্রমণ করে এসেছে। টনি কোথায়? টনিকে অনেকদিন দেখিনি। টনিকে জড়িয়ে ধরে আদর করল। বলল- শুভ জন্মদিন।

-হ্যাঁ মা, এই দিনটা আমার খুব ভালো লাগে।

টনি, তুমি কেমন আছো?

–আমার তো শরীর ভালো আছে।

–না, আস্তে আস্তে কথা বলছ কেন?

পরের কয়েক সপ্তাহে টনির শরীর আরও খারাপ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত কেটি ডঃ হার্টলের সঙ্গে কথা বলল।

ডঃ হার্টলে বললেন- এই ছেলেটার মধ্যে খারাপ কিছু নেই। কিন্তু ওর মনের ওপর চাপ পড়েছে, কী?

–আমার ছেলের? আপনি এ প্রশ্ন করছেন কেন?

–উনি খুব অনুভবী ছেলে। মনে হচ্ছে ও বোধহয় এমন একটা চাপে আছে, যা সহ্য করতে পারছে না।

জন, আপনি ভুল বলছেন, টনি স্কুলে সবসময় প্রথম হয়, গত পরীক্ষায় ও তিনটে পুরস্কার পেয়েছে। স্কুলে ও সবার সেরা অ্যাথলেট। সবার সেরা স্কলার এবং আর্টসের সেরা ছাত্র।

ডাক্তার বললেন- টনি কেন এভাবে তোতলাচ্ছে বলুন তো?

–এই ব্যাপারটা আমিই দেখব।

না, এ ব্যাপারে আপনি কোনো কথা বলবেন না। কেটি এটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।

কেটি অবাক হয়ে বলল- টনির যদি কোনো মানসিক কষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে আমি সেই যন্ত্রণা দূর করব।

সমস্যা বাড়তে থাকল। ডাঃ হাটলে চার্টের দিকে তাকিয়ে বললেন- টনির এখন বারো বছর বয়স, এখন ওকে কোনো একটা প্রাইভেট স্কুলে পাঠালে ভালো হয়।

কেটি অবাক হয়ে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

হ্যাঁ, সেখানে গেলে ও নিজস্ব জগৎ খুঁজে পাবে। সুইজারল্যান্ডে এমন কয়েকটা ভালো স্কুল আছে।

সুইজারল্যান্ড? এত দূর? কেটি নিজেকে প্রশ্ন করল।

কেটি বলল- ঠিক আছে, আমি দেখছি।

সেই সন্ধ্যায় কেটি তার বোর্ড মিটিং-এ গেল না। তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরল। টনি বসে কাজ করছে।

তোতলাতে থাকে সে। কথা ঠিক মতো বলতে পারছে না।

কেটি সরাসরি তাকে বলল- টনি তোমাকে সুইজারল্যান্ডে পাঠালে কেমন হয়?

টনির চোখে বিস্ময় এবং আশার আলো। সে বলল- মা, আমি কি সত্যি যাব?

***

ছ-সপ্তাহ কেটে গেছে। টনিকে একটা জাহাজে তুলে দেওয়া হয়েছে। সে এখন লেক জেনেভার কাছে একটা স্কুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। কেটি নিউইয়র্কের বন্দরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। আঃ, কতদিন আমি টনিকে দেখতে পাব না। তারপর সে লিমুজিনে করে অফিসে ফিরে গেল।

***

ব্রাড রজারসের সঙ্গে কাজ করতে ভালোই লাগে। ব্রাডের বয়স ছেচল্লিশ। কেটির থেকে বছর দুয়েকের বড়ো। অনেকদিন ধরে তারা পাশাপাশি বসে কাজ করছে। ক্রুগার ব্রেন্টের প্রতি ব্রাডের ভালোবাসা কেটিকে অবাক করে দিয়েছে। ব্রাড বিয়ে করেনি, আকর্ষণীয়া মেয়েদের সাথে নিয়মিত ঘুরে বেড়ায়। ধীরে ধীরে কেটি বুঝতে পারল, ব্রাড তাকে ভালোবাসতে শুরু করেছে। মাঝে মধ্যে এমন কিছু কথা বলে, যার অন্তরালে আর একটা অর্থ থাকে। কিন্তু কেটি ব্রাডের সাথে সম্পর্কটাকে নেহাত ব্যবসায়িক পর্যায়ে রাখার চেষ্টা করছে। একবারই সে এই গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, সেটা আজ ধূসর অতীত হয়ে গেছে।

ব্রাড রাতে দেরী করে ফেরে, কিন্তু সকালে যখন আসে, তখন খুবই ক্লান্ত থাকে। মনে হয়, তার মন অন্য কোথাও পড়ে আছে। এইভাবে একমাস কেটে গেল। ব্রাডের চরিত্রে কোনো একটা অসুবিধা দেখা দিয়েছে। কেটি ঠিক করল, কিছু একটা করতে হবে। সে বুঝতে পারল, ডেভিড এক সময় এক মেয়ের পাল্লায় পড়ে কোম্পানি ছাড়তে চেয়েছিল। এই ব্যাপারটা যেন ব্রাডের ক্ষেত্রে না হয়।

কেটি প্যারিসে যাবে বলে মনস্থ করল। একলাই যাবে। শেষ মুহূর্তে সে ব্রাডকে তার সঙ্গে যেতে বলল। সন্ধ্যেবেলা তারা একটা হোটেলে ডিনার খেল। ডিনার খাবার পর কেটি বলল- ব্রাড যেন তার সঙ্গে পঞ্চম জর্জ সুইটে যোগাযোগ করে।

যখন ব্রাড এল কেটি তাকে নিয়ে কথা বলতে শুরু করল।

কেটি শান্তভাবে বলল– ব্রাড, আমাদের একা থাকতে হবে।

-কেটি, কেন?

কেটি এগিয়ে এল, ব্রাডের হাতে হাত রাখল।

ব্রাড চিৎকার করে বলল- আমি তো অনেক দিন ধরেই তোমাকে ভালবেসেছি। কিন্তু আমি ভালোবাসা দেখাতে পারিনি।

–আমিও তাই ব্রাড, কিন্তু বলতে পারিনি।

তারা বেডরুমে চলে গেল।

কেটিকে এক যৌন আবেদনি রমণী বলা যেতে পারে। কিন্তু অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকাতে তার যৌন উদ্দীপনা অনেকটা স্তিমিত হয়ে গেছে। সে ব্রাডকে অন্য কারণে কাছে ডেকেছে। এর মধ্যে শারীরিক আকুতি নেই।

কেটির ওপর ব্রাড তার শরীরটাকে চাপিয়ে দিয়েছে। কেটি দুপা ফাঁক করে দিল। কেটি বুঝতে পারল, একটা কিছু তার ভেতর প্রবেশ করছে। ব্যাপারটা তার কাছে সুখ বা দুঃখের কিছুই হয়নি।

–কেটি, তোমাকে আমি অনেকদিন ধরে ভালোবেসেছি।

সে কেটির শরীরের ওপর চাপ দিল– অনন্তকাল ধরে আসা-যাওয়ার খেলা শুরু হল। চোখ বন্ধ করে কেটি ভাবল, এইভাবে ব্রাডকে আমি আটকে দিলাম। এটা কি ঠিক হল?

হ্যাঁ, এটাই বোধহয় ঠিক।

এখন স্পন্দনটা আরও দ্রুত হয়েছে। কেটি তার কোমর দোলাচ্ছে। ওই শরীরটাকে ঠেলে ওপরে রাখার চেষ্টা করছে। না, মনে মনে সে ভাবছে, আর একটা নতুন কোম্পানি চালু করতে হবে। এই কোম্পানির যদি কোনো অসুবিধা হয়, তাহলে?

ব্রাড মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করছে। আনন্দ এবং আর্তনাদ। কেটি তার শরীরটাকে আরও দ্রুত দোলাচ্ছে। ব্রাডকে পুলকের চরম শিখরে নিয়ে যাচ্ছে।

সে ভাবছে ওদের সব কথা বলতে হবে। ওদের সঙ্গে ব্যবসাটা ভালোভাবে করতে হবে।

ব্রাড হাঁপাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ব্রাড বলল- কেটি, তোমার কি ভালো লেগেছে?

কেটি হয়তো একটা মিথ্যে কথা বলল- ব্রাড মনে হচ্ছে, আমি বুঝি এতক্ষণ স্বর্গে ছিলাম।

সমস্ত রাত্রি কেটি ব্রাডকে জড়িয়ে ধরে শুয়েছিল। চোখ বন্ধ করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা চিন্তা করছিল।

কেটি ও ব্রাড ঘুমিয়ে পড়ল, সকালে তাদের ঘুম ভাঙল।

কেটি বলল- ব্রাড, তোমার সেই প্রেমিকার খবর কী?

ব্রাড হেসে বলল- সে কী, তুমি এত হিংসুটে হলে কবে থেকে? ওর কথা ভুলে যাও। প্রতিজ্ঞা করছি, ওর কাছে কখনও যাব না।

***

ব্রাডের সাথে কেটি আর কখনও শয্যাতে যায়নি। ব্রাড হয়তো বুঝতে পেরেছে। কেটি কোনো কারণে তাকে এড়িয়ে চলেছে। এই ব্যাপারে ব্রাড প্রশ্ন করাতে কোটি জবাব দিয়েছে ব্রাড, তুমি কী জানো, আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি। কিন্তু তোমার সাথে এই সম্পর্ক স্থাপিত হলে আমরা পাশাপাশি বসে আর কাজ করতে পারব না। তুমি কী চাও আমাদের কোম্পানিটা নষ্ট হয়ে যাক। কোম্পানির স্বার্থে আমাদের এটুকু স্বার্থ ত্যাগ করতেই হবে।

শেষ পর্যন্ত ব্রাড কেটির কথা শুনতে বাধ্য হল।

কোম্পানিটা ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। কেটি বেশ কয়েকটা দাঁতব্য সংস্থা স্থাপন করেছে। বিভিন্ন কলেজ, চার্চ এবং স্কুলে অকাতরে অর্থ দান করছে। তার শিল্পসংগ্রহ এখন আরও

সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। নবজাগরণের পরবর্তী যুগের অনেক ছবি সে যত্নে কিনেছে। বিখ্যাত শিল্পীদের ছবি কেনা তার শখে দাঁড়িয়ে গেছে।

ব্ল্যাকওয়েলদের এই সংগ্রহশালা সারা বিশ্বে নাম করেছে। অনেকেই এই সংগ্রহশালা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেটি কোনো আলোকচিত্রীকে সেখানে ঢোকার অনুমতি দেয় না। সাংবাদিকদের সাথে এই নিয়ে আলোচনা করতে তার প্রবল অনীহা। হ্যাঁ, সংবাদপত্রকে এড়িয়ে চলতে সে ভালোবাসে। ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের অন্তরঙ্গ জীবন সম্পর্কে সংবাদপত্রের কৌতূহল আকাশ ছুঁয়েছে। ব্ল্যাকওয়েল পরিবার সম্পর্কে কোনো পরিচারক আলোচনা করতে পারে না, এমন কী কোনো কর্মীও এ ব্যাপারে কথা বলতে পারে না। তবুও গুজবকে বন্ধ করা যায় না। আগাম অনুমানে তারা চলতে থাকে। কেটি বিশ্বের সবথেকে ধনী মহিলাতে পরিণত হয়েছে। তাই তার সম্পর্কে অসংখ্য প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোনো প্রশ্নের সঠিক জবাব পাওয়া যাচ্ছে না।

***

কেটি স্কুলের হেডমিসট্রেসকে ফোন করল টনি কেমন আছে?

–মিসেস ব্লকওয়েল, আপনার ছেলে পড়াশুনাতে ভীষণ ভালো।

–আমি তা বলছি না। কেটি কী যেন বলতে চাইল। সে কি এখনও তোতলায়?

–ম্যাডাম, সে তো এখন আর তোতলাচ্ছে না। সুন্দরভাবে কথা বলছে।

কেটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল না, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল- হ্যাঁ, ব্যাপারটা কিছুদিনের জন্য হয়েছিল। আঃ, ডাক্তাররা এমন ভয় পাইয়ে দেয়।

চার সপ্তাহ বাদে টনি ফিরে এল। কেটি এয়ারপোর্টে গেছে তাকে আনতে। টনিকে দেখতে খুব ভালো লাগছে।

কেটি বলল- হ্যালো, কেমন আছো তুমি?

টনি আবার আমতা আমতা করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বলে আ-মি-ভা-লো-আ-ছি। মা-মা!

***

টনির ছুটি, টনি নতুন নতুন ছবি দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে। এই বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীরা তার মনকে সম্মোহিত করেছে। এটা হল টনির জাদুর জগত। সে নানা রং কিনেছে, ইজেল কিনেছে, এক মনে ছবি আঁকছে। ছবিগুলো হয়তো খুব একটা ভালো হচ্ছে না। তবু এই চেষ্টাটাকে ভালোবাসতেই হবে।

কেটি বলল- একদিন এই সব ছবি তোমার হবে, ডার্লিং।

তেরো বছরের ছেলের মনে একটা আনন্দ, মা হয়তো ঠিক বুঝতে পারছে না। কিন্তু এগুলো নিয়ে সে কী করবে? নিজের পায়ে নিজেকে দাঁড়াতে হবে। কিছু একটা করতে হবে। এমন কিছু যা তাকে উত্তেজনা দেবে। মার সম্পর্কে ভাবতে গেলে সে কেমন

অবাক হয়ে যায়। টনি তার মা সম্পর্কে খুবই গর্বিত। মাকে বিশ্বের সবথেকে আকর্ষণীয়া মহিলা বলে মনে হয়। কিন্তু মা সামনে এলে সে কেমন যেন হয়ে যায়।

কেটি তার ছেলেকে খুবই ভালোবাসে। কিন্তু ছেলের এই অসুবিধাটা কবে যাবে? প্রতি কথায় সে দুবার তিনবার চিন্তা করে। একদিন মাকে সে প্রশ্ন করল- মা, তুমি কীভাবে সারা পৃথিবীটাকে পরিচালনা করছ?

কেটি হেসে বলল- না-, এসব প্রশ্ন কেন করছিস?

আমার স্কুলের ছেলেরা জানতে চাইছে। সত্যি তুমি এক বিরাট ব্যক্তি।

–আমি কেউ? আমি যে তোর মা রে?

টনি আর কোনো কথা বলল না। সে জানে, মাকে কীভাবে তুষ্ট করতে হয়।

ব্যাপারটা মায়ের কাছে বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু মা এই ব্যাপারে মজল না। বলল টনি, তোমার এখন বয়স খুবই কম। বড়ো হলে সবকিছু বুঝতে পারবে।

নতুন একটা জগত শুরু হল। টনি চেয়েছে শিল্পী হতে। শিল্পের মধ্যেই জীবনের আসল সত্তা লুকিয়ে আছে। সে বাইরে যাবে, প্যারিসে– প্যারিসে না গেলে তার আত্মা শান্তি পাবে না।

সময়টা ভালোয় ভালোয় কেটে গেল। পামবিচে কেটি বাড়ি কিনেছে। আর একটা সাউথক্যারোলিনাতে। কেনটাকিতে ফার্ম কিনল। টনি এবং সে, ওইখানে গেল। তারা

নিউপোর্টে গিয়ে আমেরিকার কাপরেস দেখল। তারপর নিউইয়র্কে ফিরে এল। বিখ্যাত হোটেলে লাঞ্চ খেল। প্লাজাতে বিকেলে চা খেল। রোববারের ডিনার সারল আর একটা বিখ্যাত হোটেলে। কেটি ঘোড়ার দৌড় দেখতে খুবই ভালোবাসে। এবার সে একটা একটা করে অনেকগুলো দামি ঘোড়া কিনে ফেলল। তার আস্তাবলের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কেটির ঘোড়া তখন ছুটছে, টনি স্কুল থেকে বাড়িতে এসেছে। কেটি টনিকে নিয়ে ট্র্যাকে গেল। বাক্সে বসে থাকল, হ্যাঁ, মা আনন্দে হৈ-হৈ করছে। কেটি বুঝতে পারছে, টনি অবাক বিস্ময়ে ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে আছে।

দেখো-দেখো, টনি, আমার ঘোড়াটা জিতবে, জেতাটাই জীবনের আসল ব্যাপার?

ডাকহারবারে তারা মাঝে মধ্যে চলে যায়, সেখানে গিয়ে শান্ত নিরুদ্বিগ্ন সময় কাটায়। কখনও বা ডাকহারবার শহরে গিয়ে আইসক্রিম খায়। মাঝে মাঝে রাতে ঘুমোত যাবার আগে কেটি তার ফেলে আসা দিনযাপনের গল্প বলে। মাদাম অ্যাগনেস, সবকিছু, বান্দার গল্প শোনা হয়ে গেছে।

টনি একদিন ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেড তোমার হবে। তুমি এটাকে ভালোভাবে চালিও কিন্তু।

টনি আমতা আমতা করে বলল- মা, এসব ব্যবসা আমি বুঝি না। আমি বড়ো হয়ে শিল্পী হব।

কেটি রাগে বিস্ফোরিত হয়ে বলল- বোকা ছেলে কোথাকার। তুই কি জানিস, ব্যবসা করলে হাতে কত ক্ষমতা আসে। তুই পৃথিবীকে গড়বি কী করে? তুই কি ভাবছিস

ক্রুগার ব্রেন্ট সংস্থাটা বন্ধ হয়ে যাবে? এটা একটা টাকা রোজগার করার কারখানা, এটাকে চালাতেই হবে।

টনি এসব কথা বুঝতে পারল না। সে অবাক হয়ে ফ্যালফ্যালিয়ে তাকিয়ে থাকল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল না, আমাকে বড়ো হয়ে একজন শিল্পী হতেই হবে।

***

টনির বয়স পনেরো, কেটি ঠিক করল, গরমের ছুটিতে তাকে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাতে যাবে। তখনও পর্যন্ত টনি সেখানে যায়নি।

কেটি বলল- টনি, আমি একটা সুন্দর জায়গায় তোকে নিয়ে যাব।

–হ্যাঁ, ডাকহারবার যাব না?

পরবর্তী গরমকালে, কেটি বলল- এ মাসে আমি তোকে জোহানেসবার্গে নিয়ে যাব।

কেটি জোহানেসবার্গে সব খবর পাঠিয়ে দিল। হাঁ, টনি সম্পর্কে সব খবরও পৌঁছে গেছে। কী কী দেখা হবে, তার একটা আগাম তালিকা করা হয়েছে।

কেটি তার ছেলে সম্পর্কে দৈনন্দিন রিপোর্ট পেয়েছে। তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সোনার খনিতে সে হিরের খনিতে দুদিন সময় কাটিয়েছে। ক্রুগার ব্রেন্টের কারখানাগুলো দেখেছে। কেনিয়াতে সাফারিতে গেছে।

শেষ অব্দি তার ছুটি ফুরিয়ে আসছে। টেলিফোন করল কেটি জোহানেসবার্গের ম্যানেজারকে।

উনি, এখন কেমন আছে?

মিসেস ব্ল্যাকওয়েল, এই সকালে সে আরও কিছুদিন থাকার জন্য বায়না করেছিল।

কেটির মনে আনন্দ ঠিক আছে।

টনির ছুটি শেষ হয়ে গেল। সে ইংল্যান্ডের সাউদম্পটনে চলে গেল। সেখানে গিয়ে প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজের একটা প্লেনে চড়ে বসল। তার গন্তব্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

কেটি তার দরকারি মিটিং ছেড়ে দিয়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছে। একটু বাদেই হয়তো ছেলের সঙ্গে দেখা হবে।

প্লেনটা সেখানে এসে পৌঁছোল। দক্ষিণ আফ্রিকার কথা বলতে গিয়ে ছেলে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কোথায় কোথায় সে গিয়েছিল সব কথা বলল। এমন কী সে যে নামিব মরুভূমিতে গিয়েছিল, সে কথাও বলল। সেখানে তার ঠাকুরদাদা একদিন হিরে চুরি করেছিল, সেকথাও জানাতে ভুল করল না।

টনি, সে কিন্তু চুরি করেনি, সে অনেক পরিশ্রম করে হিরেগুলো সংগ্রহ করেছিল।

টনি বলল- না, সেখানে রক্ষীদল আছে, ভীষণ কুকুর আছে। তা হলে? ওরা আমাকে কোনো স্যাম্পেল দেয়নি কেন?

কেটি হেসে বলল– এই স্যাম্পেল নিয়ে তোমার কী হবে? একদিন তুমি এসব হিরের খনির মালিক হবে।

-ওরা আমার কথা শোনেনি।

কেটি বলল- ঠিক আছে, আবার যখন যাবে, তখন আমি ভালো করে বলে দেব।

সেখানে গিয়ে প্রকৃতির রং-রূপ দেখে টনি অবাক হয়ে গেছে। মনের সুখে সবকিছু ক্যানভাসে আঁকার চেষ্টা করছে। হা, শখ হিসেবে এটা হয়তো ভালো। কিন্তু এটাকে কি জীবিকা করা যায়?

টনি কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, একদিন তাকে মস্ত বড় শিল্পী হতেই হবে।

***

সেপ্টেম্বর, ইউরোপে যুদ্ধ লেগেছে।

কেটি শেষ পর্যন্ত বলল- আমি চাইছি, তুমি একটা ভালো জায়গাতে ভরতি হও। দু-বছরের মধ্যে তুমি ভালোভাবে আঁকার বিষয়টা শিখতে পারবে।

কেটি জানত টনি হয়তো তার মত পরিবর্তন করবে। কিন্তু সত্যি কি তা হবে?

কেটি ব্ল্যাকওয়েলের কাছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ একটা আর্শীবাদ স্বরূপ বিরাজ করছে। পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ বাধলে আরও অনেক অস্ত্রের দরকার পড়বে। জুগার ব্রেস্ট তখন অস্ত্র সরবরাহ করতে থাকবে।

কেটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়তো শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারবে না। প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট বলেছেন, এই দেশ মহান গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক। ১৯৪১ সালের ১১ মার্চ কংগ্রেসে একটা বিল পাশ করা হল। মিত্রপক্ষের জাহাজ আটলান্টিক মহাসাগর পার হচ্ছে। জার্মানরা সেখানে প্রতিরোধের সৃষ্টি করেছে। জার্মান সাবমেরিন একটির পর একটি জাহাজকে আঘাত করছে।

জার্মান বোধহয় বিশ্বকে কাঁপিয়ে দেবে। এডলফ হিটলারের নাম সকলের মুখে মুখে ফিরছে।

কেটি বুঝতে পারছে না, কাকে সাহায্য করা উচিত। সব পক্ষই তার কাছ থেকে যুদ্ধের উপকরণ চাইছে। সে দুটো উল্লেখযোগ্য টেলিফোন করল- সুইজারল্যান্ডে। শেষ পর্যন্ত জুরিখে অবতরণ করল। কর্নেল ব্রিকম্যানের জন্য একটা খবর আছে। ব্রিম্যান জুগার ব্রেন্ট-এর বার্লিন শাখার ম্যানেজার। যখন এই ফ্যাক্টরিটা নাজি সরকার দখল করে, তখন ব্রিঙ্কম্যানকে তারা কর্নেলের পদ দেয়। তাকেই এই পদে রাখা হয়েছে।

তিনি এসে কেটির সাথে হোটেলে দেখা করলেন। পাতলা চেহারার মানুষ, লাল চুলের অধিকারী, মাথায় চুলের পরিমাণ কম।

মিসেস ব্ল্যাকওয়েল, আপনার সঙ্গে দেখা করে আমি নিজেকে গর্বিত বলে বোধ করছি। আমার সরকারের তরফ থেকে একটা সুখবর আছে। আমরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করব, সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাক্টরির দায়িত্ব ভার আপনাকে দেওয়া হবে। কিছুদিন বাদে জার্মানি বিশ্বের সব থেকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হবে। তখন আপনার মতো লোকের সহযোগিতা আমরা প্রার্থনা করব।

যদি জার্মানি এই যুদ্ধে হেরে যায়?

কর্নেল ব্রিঙ্কম্যানের ঠোঁটে একটা পাতলা হাসি– আমরা দুজনেই জানি, সেটা কখনওই সম্ভব নয়। মিসেস ব্ল্যাকওয়েল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাই ইউরোপের এই ঝামেলা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। আমার মনে হয় মার্কিনরা কখনও এই যুদ্ধে যোগ দেবে না।

কর্নেল, কেটি ঝুঁকে পড়ে বলল, আমি শুনেছি অনেক ইহুদিকে নাকি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পুরে দেওয়া হয়েছে। তাদের হত্যা করা হচ্ছে। এটা কি ঠিক?

-না, এটা ব্রিটিশদের অপপ্রচার। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি। এই ধরনের ব্যাপার কখনওই ঘটেনি। ইহুদিদের ক্যাম্পে রাখা হচ্ছে, একথা ঠিক, কিন্তু অফিসারদের বলা আছে, তাদের প্রতি যেন ভালো ব্যবহার করা হয়।

কেটি জানে না, এই কথার আসল অর্থ কী, সে অর্থটা বের করার চেষ্টা করবে।

পরের দিন কেটি এক বিখ্যাত জার্মান ব্যবসায়ীর সাথে একটা বৈঠকে বসল। ভদ্রলোকের নাম অটো গুয়েলার। বছর পঞ্চাশ বয়স। দেখতে খুবই ব্যক্তিত্ব ব্যঞ্জক। মুখের ভেতর আত্মহমিকার ছাপ আছে। চোখের তারায় কিন্তু বিষণ্ণতার চিহ্ন। তারা একটা ছোট্ট কাফেতে গিয়ে বসল।

কেটি শান্তভাবে বলল- আপনি নাকি ইহুদিদের সাহায্য করছেন, যাতে তারা কোনো একটা নিরপেক্ষ দেশে পৌঁছোতে পারে। এজন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এটা কী সত্যি!

মিসেস ব্ল্যাকওয়েল, এটা সত্যি নয়, এটা করা হলে তৃতীয় রাইকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

–আমি শুনেছি, এই কাজ করতে আপনার টাকার দরকার।

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন- না, এটাও একটা বাজে খবর।

তার চোখের ভেতর একটা অনিশ্চিত অন্ধকার। তিনি কাফের চারিদিকে তাকালেন। হ্যাঁ, এই জাতীয় মানুষেরা প্রতিটি মুহূর্তে ভয় পান।

আমি কিন্তু আপনাকে সাহায্য করতে পারি, আমার সংস্থা ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেড। অনেক নিরপেক্ষ দেশে আমাদের অফিস আছে। যেসব দেশগুলো মিত্রপক্ষের অধীন সেখানেও আমাদের অফিস আছে। যদি কেউ সেখানে উদ্বাস্তু হয়ে যেতে চায়, তাহলে, আমরা সেখানে তাদের চাকরির ব্যবস্থা করব।

শুয়েলার বসে বসে তেতো কফিতে মুখ দিলেন। শেষ পর্যন্ত বললেন– এসব ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। এখন রাজনীতির ব্যাপারটা এত নোংরা হয়ে গেছে... যদি আপনি সত্যি সাহায্য করতে চান, তাহলে আমার এক কাকাকে সাহায্য করুন। উনি ইংল্যান্ডে থাকেন। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। প্রতি মাসে পঞ্চাশ হাজার ডলার খরচ হয়।

–আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা করছি।

–আপনি এমন ব্যবস্থা করুন, যাতে টাকাটা লন্ডনে জমা পড়ে এবং সুইসব্যাঙ্কে চলে আসে। তাহলেই আমার কাকা খুব খুশি হবেন।

আট সপ্তাহ কেটে গেছে, কিছু ইহুদি উদ্বাস্তু শেষ পর্যন্ত মিত্র দেশে প্রবেশের ছাড়পত্র পেল। ক্রুগার ব্রেন্টের বিভিন্ন কোম্পানিতে তারা চাকরি পেয়েছে।

দুবছর বাদে টনি স্কুল ছেড়ে দিল। সে সোজা কেটির অফিসে গিয়ে আমতা আমতা করে বলতে থাকে –আমি চেষ্টা করছি, মা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি আমার মন ঠিক করলাম। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমি প্যারিসে যাব।

প্রত্যেকটি কথা সে বলছে একটু থেমে থেমে। তার মানে, রোগটা এখনও একেবারে সারেনি।

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে টনি আবার বলতে শুরু করে মা, আমি জানি, তুমি আমার কথা শুনে খু-খুব হতাশ হয়েছ। কিন্তু আমাকে আমার জীবনটা নিজের মতো কাটাতে দাও। আমি এখন শিকাগোর একটা আর্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি হব।

কেটির মনে নানা চিন্তা। টনি কেন এইভাবে সময় এবং অর্থ নষ্ট করছে।

কেটি বলল–তুমি কবে যেতে চাইছ?

-পনেরো তারিখ থেকে ক্লাস শুরু হবে।

–আজ কত তারিখ?

–আজ ডিসেম্বরের ছ তারিখ।

***

১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর, রোববার, পার্ল হারবারের ওপর জাপান আক্রমণ করল। পরের দিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করল। সেদিন বিকেলবেলা টনিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিন কর্পে যোগ দিতে হয়। তাকে ভার্জিনিয়াতে পাঠানো হল। সেখানকার অফিসারস ট্রেনিং স্কুল থেকে সে গ্র্যাজুয়েট হল। সেখান থেকে চলে গেল দক্ষিণ প্যাসিফিক অঞ্চলে।

কেটি বুঝতে পারল, এবার তার জীবনটা আরও অনিশ্চয়তার মধ্যে কেটে যাবে। সারা দিন ধরে কাজের চাপ। প্রতি মুহূর্তে চিন্তা, উদ্বেলতা এবং আকুলতা, কেটি ভাবছে, এই

হয়তো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একটা খারাপ খবর আসবে। টনি আহত হয়েছে কিংবা মারা গেছে। হয়তো বা...!

জাপানি বোম্বারগুলো গুয়ামের আমেরিকার বেসের ওপর আঘাত করছে। জাপান ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সিঙ্গাপুর দখল করল। তারা নিউ ব্রিটেন, নিউ আয়ারল্যান্ড এবং অ্যাডমিরালটির ওপর বোমা বর্ষণ করল। জেনারেল ডগলার ম্যাকারথারকে ফিলি পাইনস থেকে চলে আসতে হচ্ছে। অক্ষশক্তি আস্তে আস্তে বিশ্বজুড়ে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে চলেছে। সর্বত্র অনিশ্চয়তার ঘন অন্ধকার।

কেটির কেবলই মনে হচ্ছে, টনিকে যুদ্ধবন্দি হিসেবে আটক করা হয়েছে। তাকে অত্যাচারের সামনে দাঁড়াতে হচ্ছে। না, এত শক্তি এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে প্রার্থনা ছাড়া কিছুই করতে পারবে না। টনির কাছ থেকে যখন চিঠি আসে, কেটির মন আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, তার মানে কয়েক সপ্তাহ আগে টনি বেঁচে ছিল। টনি লিখেছে– এখানে আমরা ঘন অন্ধকারের মধ্যে থাকতে বাধ্য হচ্ছি। রাশিয়ানরা এখন কী করছে? জাপানি সৈন্যরা অত্যন্ত নির্মম এবং হৃদয়হীন। কিন্তু তাদের শ্রদ্ধা করা উচিত। তারা মরতে ভয় পায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খবর কী? তোমার ফ্যাক্টরির লোকেরা কি আরও বেশি টাকা চাইছে?

আরও কত খবর কেটি পায় ওই চিঠিগুলো থেকে।

***

১৯৪২ সালের আগস্ট। মিত্রশক্তি আরও জোর লড়াইতে নেমে পড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিনারগুলো সলোমান দ্বীপপুঞ্জে নেমেছে। তারা জাপানকে হটিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

ইওরোপে মিত্রশক্তি জয়ের পথে এগিয়ে চলেছে। ১৯৪৪ সালের ৬ জুন মিত্রশক্তি পশ্চিম ইওরোপের অনেকটা অংশ দখল করল। নরম্যান্ডি সৈকতে পৌঁছে গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং কানাডার সৈন্যরা। ১৯৪৫ সালের ৭মে জার্মানি বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল।

১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট জাপানের ওপর আণবিক বোমা ফেলা হল। কুড়ি হাজার কম ক্ষমতা সম্পন্ন বোমা বিস্ফোরিত হল হিরোসিমাতে। তিনদিন বাদে আর একটা আণবিক বোমা ফাটল নাগাসাকি শহরে। ১৪ আগস্ট, জাপানিরা শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করল। এই ভাবেই বিরাট যুদ্ধটা শেষ হয়ে গেল।

***

তিনমাস বাদে টনি বাড়ি ফিরে এল। সে এবং কেটি ডাকহারবারে বেশ কিছুটা সময় কাটাল। টেরেসে বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকল।

এই যুদ্ধ তাকে একেবারে পরিবর্তিত করে দিয়েছে। তার চরিত্রের মধ্যে একটা আভিজাত্য এবং গাম্ভীর্য এসেছে। হ্যাঁ, ছোট্ট গোঁফের আভা দেখা যাচ্ছে। চেহারাটা ভারী সুন্দর। চোখের তারায় একটা নতুন আত্মবিশ্বাস। কেটি জানে, এই অভিজ্ঞতা তাকে আরও প্রাজ্ঞ করে তুলেছে। এখন সে হয়তো কোম্পানিতে যোগ দেবে।

-তুমি এখন কী করতে চাইছ? কেটি জিজ্ঞাসা করল।

টনি হেসে বলল –আগেই তো আমি বলেছি মা, যুদ্ধ শেষ হলে আমি প্যারিসে যাব।

.

চতুর্থ খণ্ড

টনি

১৯৪৬-১৯৫০

১৮.

এর আগে টনি প্যারিসে এসেছিল কিন্তু এবারকার পরিবেশটা একেবারে আলাদা। জার্মানরা এখনও তাদের স্মৃতি চিহ্ন রেখে গেছে। হ্যাঁ, ধ্বংসের ইতিহাস। মানুষজনকে কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। নাজিরা সব কিছু লুট করেছে। কিন্তু প্যারিসের অবস্থা কেমন? জীবন এখানে কেমনভাবে কেটে চলেছে। ইচ্ছে করলে টনি কেটির প্যান্টহাউসে থাকতে পারত, কিন্তু সে ওখানে থাকবে না। সে একটা পুরোনো বাড়ি ভাড়া নিল। সেখান থেকে তার স্কুল খুব একটা দুরে নয়। এই অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে একটা লিভিং রুম আছে, আছে ছোটো বেডরুম এবং একটা কিচেন। কোনো রেফ্রিজারেটর নেই। বেডরুমে আর কিচেনের মাঝে একটা বাথরুম আছে। মোটামুটি চলে যেতে পারে।

বাড়িউলি বলেছিলেন–একটু কষ্ট হবে, কিন্তু চলে যেতে পারে।

শনিবার সমস্ত দিনটা টনি বাজারে কাটাল। সোমবার এবং মঙ্গলবার সে গেল পুরোনো দোকানে, পার্কের পাশে। বুধবার ফার্নিচার কিনে আনল। একটা সোফাসেট, দুটো চেয়ার, একটা পুরোনো ওয়াড্রাব, কিছু আলো, কিচেনের টেবিল ইত্যাদি। মা দেখলে হয়তো অবাক হয়ে যাবে, টনি ভাবল, এই সুন্দর অ্যাপার্টমেন্টটাকে সে আরও সুন্দর করে তুলতে পারত। কিন্তু তাতে কী বা হবে?

এবার তাকে একটা ভালো আর্টস্কুলের সন্ধান করতে হবে। সমস্ত ফ্রান্সের ভেতর সুব থেকে নামকরা স্কুল হল একোলে। এখানে যারা ভর্তি হয়, তাদের শিল্পবোধ খুবই উচ্চ ধরনের। টনি সেখানে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করল। সে ভাবল, ওরা নিশ্চয়ই আমাকে নেবে না। সে তার আঁকা তিনটে ছবি জমা দিল। চার সপ্তাহ অপেক্ষা করল। চার সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর বলা হল, আগামী সোমবার তাকে দেখা করতে হবে।

একোলে স্কুলটা একটা বিরাট পাথরের বাড়িতে অবস্থিত। বারোটা ক্লাসরুমে ছাত্র গিজগিজ করছে। টনি সেই স্কুলের প্রধানের কাছে গেল। ভদ্রলোকের নাম মাট্রিগ্রেস্যান্ড। চোখে মুখে কেমন বিরক্তির ছাপ। নাকটা নেই বললেই চলে। এত পাতলা ঠোঁট টনি কখনও দেখেনি।

ভদ্রলোক বললেন তোমার আঁকার মধ্যে কেমন একটা অপেশাদারের গন্ধ আছে। তবে সম্ভাবনা আছে। আমাদের কমিটি তোমাকে নির্বাচন করেছে। তুমি কি বুঝতে পারছ?

-ঠিক বুঝতে পারছি না, স্যার।

-হ্যাঁ, সময় হলে বুঝতে পারবে। তুমি ক্যানটালের সঙ্গে যোগাযোগ করো। আগামী . পাঁচ বছর তুমি তারই অধীনে থাকবে। তবে যদি ততদিন টিকতে পারো।

হ্যাঁ, আমি পাঁচ বছর থাকব, টনি প্রতিজ্ঞা করল।

ক্যানটাল অত্যন্ত খর্বাকৃতি মানুষ। মাথায় চকচক করেছে টাক। ঘন বাদামী দুটি চোখ। নাকটা চ্যাপটা, ঠোঁটটা বাঁকানো।

তিনি টনিকে বললেন–আমেরিকানরা উদাসীন হয়ে থাকে। তারা তো বর্বর স্বভাবের। তুমি কেন এখানে এসেছ?

-কিছু শিখতে, স্যার।

ক্যানটাল হাসলেন।

ওই ক্লাসে পঁচিশ জন ছাত্র ছিল। বেশির ভাগই ফরাসি। ইজেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। বসার আসনও ইচ্ছে মতো। টনি জানলার ধারে গিয়ে বসল। জায়গাটা তার মোটেই ভালো লাগছে না। দেখা গেল বিভিন্ন গ্রিক স্ট্যাচু সাজানো আছে।

ক্যানটাল জিজ্ঞাসা করলেন এবার তুমি শুরু করতে পারো।

টনি বলল আমি তো রং আনিনি, স্যার।

-না, রং লাগবে না। তুমি প্রথম বছর খালি ছবি আঁকার চেষ্টা করবে, পেনসিল দিয়ে।

ভদ্রলোক একটা গ্রিক স্ট্যাচুর দিকে তাকিয়ে বললেন- ওই স্ট্যাচুটা তোমাকে আঁকতে হবে। ওপর থেকে দেখে মনে হচ্ছে খুবই সহজ, কিন্তু যতই ভেতরে ঢুকবে, ততই অবাক হয়ে যাবে। এক বছর শেষ হবার আগেই অর্ধেক ছাত্র পালিয়ে যায়।

তিনি আবার বললেন তোমাকে মানুষের শরীর সংস্থান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। দ্বিতীয় বছরে তুমি জীবন্ত মডেলের ছবি আঁকার সুযোগ পাবে। তখন তৈলচিত্র আঁকবে। তৃতীয় বছরে তুমি আমার পাশে বসে কাজ করবে। আমি যে সৃজনশীলতা পালন করি, সেটাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করবে। চতুর্থ এবং পঞ্চম বছরে তোমার নিজস্ব শিল্পীসত্তা গড়ে উঠবে। তুমি তখন একটা কণ্ঠস্বর পাবে। তোমাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হবে না।

এবার ক্লাস শুরু হল। ভদ্রলোক চারদিকে ঘুরছেন। প্রত্যেকটা ইজেলের সামনে কিছুক্ষণ থামছেন। হয় সমালোচনা করছেন, নয় কোনো কথা বলছেন।

তিনি টনির কাছে এলেন। বললেন না, এটা এমন হবে না। তুমি হাতের বাইরের দিকটা করতে পারোনি। পেশিগুলো ভালোভাবে দেখতে হবে। হাড়ের সংস্থান, লিগাবেন সবকিছু দেখাতে হবে। তোমায় জানতে হবে, কীভাবে শরীরের ভেতর রক্ত সংবাহিত হয়। তুমি কি তা জানো?

-না। কিন্তু আমি শিখে ফেলব।

***

যখন টনির ক্লাস থাকে না, সে অ্যাপার্টমেন্টে বসে বসে ছবি আঁকে। সারাদিন ধরে ছবি আঁকতে ভালোবাসে। ছবি তাকে একধরনের স্বাধীনতা দিয়েছে। এই স্বাধীনতার স্বাদ সে কখনও পায়নি। তার জীবনের সব থেকে বড় কাজ হল ইজেলের সামনে বসে পেইন্ট আর ব্রাশ দিয়ে ছবি আঁকা। তখন নিজেকে ঈশ্বর বলে মনে হয়। সারা পৃথিবীকে সে এখন তৈরি করতে পারবে- এর থেকে বড়ো আনন্দ আর কী হতে পারে? সে গাছ আঁকছে, প্রস্ফুটিত ফুল, মানুষের শরীর, জগৎ, এটা একটা দারুণ অভিজ্ঞতা। সে এই জন্যই জন্মেছে। যখন সে ছবি আঁকে না, তখন প্যারিসের রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায়। প্রাণবন্ত যৌবনবতী শহর তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

এখন এই শহরকে সে তার নিজস্ব শহর বলতে পারে। এখানে তার শিল্পসত্তার বিকাশ ঘটে গেছে। দুটো প্যারিস আছে, সাইন নদী তাকে ভাগ করে দিয়েছে। দুটো আলাদা জগত। সাইন নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলে অর্থবান মানুষদের বসবাস। জীবনে তারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বাঁদিকে থাকে ওই ছাত্রের দল, শিল্পী এবং সংগ্রামী জনতা। তাদের চোখে অনেক স্বপ্ন। কিন্তু তারা জানে না, শেষ পর্যন্ত এ স্বপ্ন সফল হবে কিনা। প্যারিসে আরও অনেক কিছু আছে, যা দেখে টনি অবাক হয়ে গেছে। তবে টনির কাছে কোনো কিছুই বিদেশ বলে মনে হয় না। অনেক সময় সে বুলেভার্দে বসে বসে ছবি আঁকে।

টনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা পড়ে। বন্ধুদের সাথে ভাব হয়ে গেছে। অনেকেই তার সহজ সরল জীবনযাত্রাকে তারিফ করে।

টনি একটু একটু ফরাসি ভাষা শিখে গেছে। তাই কথা বলতে এখন খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না। যারা দরিদ্র এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছাত্র, তারা কাফে ফ্লোরাতে ভিড় করে। আর যাদের হাতে একটু পয়সা, তারা অন্য কোথাও চলে যায়।

১৯৪৬–প্যারিসের শিল্পজগতে বিপ্লব ঘটে গেছে। টনি একদিন পাবলো পিকাসোকে দেখতে পেল। একদিন তার এক বন্ধু মার্ক সাগলকে দেখতে পেয়েছিল। বছর পঞ্চাশেক বয়স। ভদ্রলোক এখনও অসাধারণ ছবি আঁকেন। তিনি কাফের একটা কোণের টেবিলে বসেছিলেন। একদল লোকের সাথে কথা বলছিলেন।

টনির বন্ধু ফিসফিসিয়ে বলেছিল তাকে দেখতে পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হয়েছে। উনি প্যারিসে খুব একটা আসেন না। উনি ভেনাসে থাকেন। ভূমধ্যসাগরের পাশে।

ম্যাক্স আওনেসকেও দেখা গেল। একটা কাফেতে। আলবার্তোর সাথে দেখা হয়ে গেল। টনি ক্রমশ অবাক হয়ে যাচ্ছে। একদিন হানা বেলমেডের সাথে টনি দেখা করল। ইতিমধ্যে উনি যৌন উত্তেজক ছবি এঁকে নাম করেছেন। বিশেষ করে কিশোরী কন্যাদের উন্মুক্ত বুকের ছবি। টনির সাথে গ্রাকের দেখা হল। এই মুহূর্তটা সে কখনও ভুলতে পারবে না। টনি কথা বলতে পারেনি।

বিভিন্ন আর্ট গ্যালারিতে সে নিয়মিত যাচ্ছে। এক একটা ছবির প্রদর্শনী দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে, ভাবছে, আমি কবে এঁদের মতো ছবি আঁকতে পারব?

***

কেটি টনির অ্যাপার্টমেন্ট দেখে অবাক হয়ে গেছে। সে কোনো কথা বলেনি। কিন্তু ভাবল–আমার ছেলে এই ভাবে থাকে কী করে? মুখে বলল –টনি, আমি একটা ব্রেফিজারেটর দেখতে পাচ্ছি না কেন? তুমি খাবার কোথায় রাখো?

আমতা আমতা করে টনি বলল –কেন, আমি তাকে রেখে দিই।

কেটি জানলার কাছে গিয়ে সেটা খুলে দিল। তারপর বলল –টনি, এভাবে কি থাকা যায়?

টনি হাসবার চেষ্টা করছে।

কেটি বলল তোমার ছবি আঁকার কথা বলল।

-এখনও তেমন কিছু বলার হয়নি। সবেমাত্র শুরু হয়েছে।

–ওই ক্যানটাল লোকটাকে তুমি কি পছন্দ করো?

–হা মা, উনি অসাধারণ প্রতিভা। উনি আমাকে খুবই ভালোবাসেন।

কেটি বলতে পারল না যে, টনিকে তার কোম্পানিতে যোগ দিতে হবে।

***

ক্যানটালকে এক বিদঘুটে স্বভাবের মানুষ বলা যায়। টনি তাকে খুবই শ্রদ্ধা করে।

স্কুলের টার্ম শেষ হয়ে আসছে। আটজনকে দ্বিতীয় বছরে প্রবেশের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। টনি তাদের মধ্যে একজন। এই আনন্দঘন মুহূর্তটাকে উদযাপিত করতে টনি এবং অন্য ছাত্ররা মমার্ত্রের একটি নাইটক্লাবে গেল। সারা রাত ধরে তারা প্রচণ্ড মদ খেল। হৈ-হৈ করল। সেখানে কয়েকজন ইংরেজ যুবতীর সঙ্গে আলাপ হল। তারা প্যারিস দেখতে এসেছে।

***

স্কুল আবার শুরু হল। টনি এবার জীবন্ত মডেলের সামনে বসে কাজ করবে। এর পাশাপাশি তাকে তৈলচিত্রও শিখতে হবে। হা, কিন্ডারগার্টেন থেকে সে ছুটি পেয়েছে। মানুষের শরীর সংস্থান সম্পর্কে অনেক জ্ঞান সে ইতিমধ্যে অর্জন করেছে। এখন ব্যবহারিক শিখনের পালা। এখন একহাতে সে ব্রাশ নিয়ে বসে থাকে। তার সামনে এক জীবন্ত মডেল। টনি এবার নতুন কিছু সৃষ্টি করবে। তার আঁকা ছবি দেখে সান ক্যানটাল পর্যন্ত খুশি হয়েছেন।

উনি বললেন তোমাকে অনুভব করতে হবে। অনুভূতি ছাড়া কেউ শিল্পী হতে পারে না।

***

ক্লাসে প্রায় বারোজন মডেল বসে আছে। যে মডেলকে ক্যানটাল প্রায়ই ব্যবহার করেন, সে হল কালটস, এক অল্প বয়সী ছেলে, মেডিকেল স্কুলে পড়াশুনা করে। এরই পাশাপাশি আর এক মডেলের কথা বলা উচিত। সে হল আনেটে। খর্বাকৃতি, কিন্তু অসম্ভব স্তনবতী মহিলা। তার মাথায় লাল চুল আছে। শরীরের একটা আলাদা আকর্ষণ।

আর এক মেয়ের কথাও আলাদাভাবে বলা উচিত। তার নাম ডোমিনিক ম্যাসন। মাথায় সোনালি চুলের বন্যা। চোখ মুখ খুবই উজ্জ্বল। দুটি চোখের তারায় সবুজাভ আভা। ডোমিনিক বেশ কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পীর মডেল হয়েছে। সকলেই তাকে ভালোবাসে। ক্লাস শেষ হয়ে যাবার পর সকলেই তার কাছে গিয়ে গল্প করে, সে ঘুরতে যাবে কিনা জানতে চায়।

সে বলে আমি কখনও আনন্দের সাথে ব্যবসাকে এক করতে চাই না। তবে খুব একটা খারাপ হবে না। আমার কাছ থেকে তোমরা কী নেবে বলো?

এভাবেই কথাবার্তা চলতে থাকে। কিন্তু ডোমিনিক স্কুলের কোনো ছাত্রের সাথে বাইরে কোথাও যায় না। এ ব্যাপারে তার নিয়মজ্ঞান বড় কড়া।

সন্ধের অবকাশ। ছাত্ররা বাড়ি যাবে, ডোমিনিকের সামনে বসে টনি তুলির শেষ টান দিচ্ছিল। টনি হঠাৎ দেখল ডোমিনিক পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তার শরীর থেকে একটা দারুণ গন্ধ উঠে আসছে।

ডোমিনিক বলল আমার নাকটা বড্ড লম্বা হয়ে গেছে।

টনির মুখে লাল আভা–হ্যাঁ, আমি এটা পালটে দিচ্ছি।

-না-না, তুমি খুব ভালো এঁকেছ। এটা আমার লম্বা নাকের ছবি।

টনির মুখে হাসি–না, আমার ভয় হচ্ছে, আমি হয়তো ঠিক মতো আঁকতে পারিনি।

ফরাসি দেশের কেউ হলে বলতো, তোমার নাকটা তত খুবই সুন্দর, সোনা।

-আমি তোমার নাকটা ভালোবাসি, কিন্তু আমি ফরাসি নই।

–হ্যাঁ, তুমি তো আমার সাথে কখনও কথা বলতে চেষ্টা করো না। কেন বলো তো?

টনি অবাক–না, সকলেই তোমার সঙ্গে কথা বলে। আমি তোমার কাছে পৌঁছোব কেমন করে?

ডোমিনিক বলল –তাই নাকি? আচ্ছা, শুভরাত্রি।

মেয়েটি চলে গেল।

টনি দেখল, এরপর ডোমিনিক প্রায় অবাক চোখে তার ছবির দিকে তাকিয়ে আছে।

একদিন সন্ধেবেলা ডোমিনিক বলল–তোমার আঁকার হাত খুবই ভালো। মনে হচ্ছে, তুমি একজন নামকরা শিল্পী হবে।

-তোমাকে ধন্যবাদ, ভোমিনিক। তোমার আশা পূরণ হলেই ভালো হয়।

–তুমি কি সত্যি সত্যি ছবি আঁকতে চাও?

–হ্যাঁ, সারা জীবন ধরে।

–যে একজন নামী শিল্পী হবে, সে কি আমাকে ডিনার খাওয়াবে?

টনির চোখে মুখে এক অদ্ভুত প্রত্যাশার আলো।

-আমি কিন্তু বেশি খাই না, শরীরটা ঠিক রাখতে হয়।

টনি হেসে বলল–হ্যাঁ, আমি খুব খুশি হব।

তারা একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্টে বসল। তারা শুধু ছবি নিয়ে আলোচনা করল। ডোমিনিকের জ্ঞান দেখে টনি অবাক হয়ে গেছে। কত বিশিষ্ট শিল্পীদের সামনে সে মডেল হয়ে বসেছে।

ডোমিনিক বলল–আমি বলছি, তুমি কিন্তু একদিন এঁদের মতোই নামজাদা হবে।

টনি খুব অবাক হয়ে গেছে। সে বলল আমাকে অনেকটা পথ যেতে হবে।

রেস্টুরেন্টের বাইরে বেরিয়ে এসে ডোমিনিক বলল আমাকে তোমার অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যাবে?

-না, সেখানে দেখার মতো কিছুই নেই।

শেষ পর্যন্ত তারা অ্যাপার্টমেন্টে এল। ডোমিনিক চারদিকে তাকিয়ে দেখল। এটা একটা ছোট্ট থাকার জায়গা। সে মাথা নাড়ল–হ্যাঁ, তোমার দেখাশুনা কে করে?

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

কাজের মেয়ে সপ্তাহে একদিন আসে।

–ওকে ছুটি দিয়ে দাও। জায়গাটা খুবই নোংরা। তোমার কোনো মেয়ে বন্ধু নেই?

–না।

ডোমিনিক অবাক হয়ে বলল তুমি কেমন পুরুষ?

–আমি জানি না।

-ঠিক আছে। আমায় কিছু সাবান এনে দাও তো, আর জল দাও। আমি জায়গাটা পরিষ্কার করে দিচ্ছি।

ডোমিনিক কাজে হাত দিল। সবকিছু পরিষ্কার করল। যখন কাজ শেষ হয়ে গেছে সে বলল এখনকার মতো চলে যাবে, আমাকে এখন চান করতে হবে।

সে ছোট্ট বাথরুমে গেল। চানের চেষ্টা করল। তারপর চিৎকার করে বলল–তুমি এই টাবের ভেতর ঢোকো কেমন করে?

–আমি আমার পা দুটো নামাই।

মেয়েটি হেসে বলল আমি দেখতে চাই।

পনেরো মিনিট কেটে গেছে। বাথরুম থেকে ডোমিনিক বেরিয়ে এসেছে। তার কোমরে একটুকরো ভোয়ালে জড়ানো। তার লাল চুল উঁচু করে বাঁধা আছে। অসাধারণ সুন্দরী সে। পূর্ণ বিকশিত দুটি স্তন। এতটুকু স্থানচ্যুত হয়নি। সরু কোমর, লম্বা ঈপ্সিত দুটি পা। টনি অবাক হয়ে গেছে। এর আগে কখনও টনি ডোমিনিককে মেয়ে হিসেবে কল্পনা করেনি। এতদিন সে ছিল নেহাতই একটা মডেল, যার ছবি ক্যানভাসে আঁকতে হয়। এখন সে অবাক হয়ে গেল। হ্যাঁ, ছোট্ট একটা তোয়ালে সবকিছু পালটে দিয়েছে। হঠাৎ তার শরীরে রক্ত চলাচলের গতি বেড়ে গেল।

ডোমিনিক বলল তুমি কি আমায় ভালোবাসবে? তুমি কি জানো কীভাবে ভালোবাসতে হয়?

-হ্যাঁ, আমি জানি।

ডোমিনিক তোয়ালেটা সরিয়ে দিয়ে বলল আমাকে দেখাও তোমার কারুকাজ।

***

ডোমিনিকের মতো কোনো মেয়ের সংস্পর্শে কোনোদিন আসতে হবে, টনি তা ভাবতেও পারেনি। ডোমিনিক দুহাত তুলে সব কিছু দেয়, বিনিময়ে কিছুই প্রত্যাশা করে না। সে এখন প্রত্যেক দিন সন্ধেবেলা টনির জন্য রান্না করা খাবার নিয়ে আসে। মাঝে মধ্যে টনির ফ্ল্যাটে এসে একসঙ্গে ডিনার খায়।

ডোমিনিকের অন্তরঙ্গ ব্যবহারে টনি আপ্লুত হয়ে গেছে।

মাঝে মধ্যে কখনও সে বলে, তুমি কি টাকা জমাচ্ছো? হ্যাঁ, এভাবে জীবন কাটানোই ভালো।

তারা সকাল সন্ধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। একদিন মিউজিয়ামে গেল। একদিন এমন এক জায়গায় যেখানে সচরাচর টুরিস্টরা যেতে চায় না। টনি ক্রমশ অবাক হয়ে যাচ্ছে। এই শহরের গল্পকথা সে জানত না।

ডোমিনিককে কাছে পেয়ে টনির জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে একটা সহজাত কৌতুকবোধ আছে। টনির মনের আকাশে যখন দুঃখের মেঘের সঞ্চারণ, তখন ডোমিনিক এসে তাকে হাসির জগতে নিয়ে যায়। প্যারিস সম্পর্কে সব কিছু তার নখদর্পণে। সে মাঝে মধ্যে টনিকে নিয়ে পার্টিতে যায়। সেখানে বিখ্যাত মানুষদের সঙ্গে আলাপ হয়। আলাপ হল কবি এবং সাহিত্যিকদের সঙ্গে।

ডোমিনিক সবসময় তাকে উৎসাহ দেয়। সে বলে একদিন তুমি এঁদের সকলের থেকে ভালো আঁকবে, আমি বলছি।

টনির মন যখন খারাপ হয়ে যায়, সে ছবি আঁকতে বসে। মাঝে মধ্যে রাতের অন্ধকারে টনি ছবি আঁকে। ডোমিনিক ইচ্ছে করেই মড়েল সেজে বসে থাকে। সারাদিন কাজ করার পর ডোমিনিক এত শক্তি পায় কোথা থেকে? টনি ভাবে, এই প্রথম সে কাউকে ভালো বেসে ফেলেছে। ভালোবাসা, নাকি অন্য কিছু? টনি জানে না, এই ভালোবাসার পরিণতি কী হবে? কেটি ডোমিনিককে বলবে, সে পৃথিবীর একমাত্র বিত্তশালী মহিলার

পুত্র। না, এভাবে বলা উচিত নয়। ডোমিনিকের জন্মদিন। শেষ পর্যন্ত উনি একটা ভারী সুন্দর রাশিয়ান কোট কিনল।

ডোমিনিক বলল –এত ভালো জিনিস, আমি আমার জীবনে কখনও দেখিনি। কোটটা পরে সে নাচতে শুরু করে দিল। একবার নিজের শরীরটাকে স্পন্দিত করে বলল- কোথা থেকে এনেছ টনি? তুমি টাকা কোথায় পেলে?

টনি বলল –এটা চুরি করে আনা হয়েছে। আমি রডিন মিউজিয়ামে এটা পেয়েছি। একটা লোক এটা বেচার জন্য ছটফট করছে। বেশি খরচ হয়নি।

ডোমিনিক অবাক হয়ে তাকাল। তারপর হেসে উঠল- আরে, এটা পরলে আমাদের। দুজনকে তো জেলে বন্দি হতে হবে।

তারপর সে হাত তুলে টনির কাছে চলে এল। বলল –টনি, তুমি একটা বোকা হাঁদা গবেট।

মিথ্যে কথা বলাটাই ভালো। টনি ভেবেছে।

এক রাতে ডোমিনিক বলল–টনি যেন তার সাথে বেড়াতে যায়।

তারা সমস্ত রাত ধরে প্যারিসের পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াল। ডোমিনিক একটা মস্ত বড়ো অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছে। সে বলেছিল টনি, তুমি এই ছোট্ট কামরায় থেকো না।

আমার সঙ্গে থাকো। তোমাকে কিছু দিতে হবে না। আমি তোমার জামাকাপড়ের দায়িত্ব নেব। তোমার রান্না করে দেব। আর।

-না, ডোমিনিক, তোমাকে ধন্যবাদ।

–কিন্তু কেন?

টনি কী করে জবাব দেবে? সে যদি তার বড়োলোকি স্বভাবটা দেখায়, তাহলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। হয়তো প্রথমে করলে হত, কিন্তু এখন তা হওয়া সম্ভব নয়। তা হলে ডোমিনিক তাকে আর এইভাবে ভালোবাসতে পারবে না।

সে বলল তুমি তো আমাকে অনেক দিয়েছ, আর আমি কিছু নেব না।

-তাহলে আমি আমার অ্যাপার্টমেন্টটা ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে আসছি। তুমি কি আমায় থাকতে দেবে না?

পরের দিন সে চলে এল।

এটা একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা। তাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা আরও গভীরতর হয়েছে। তারা সপ্তাহের শেষে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে যায়। ছোটো ছোটো হোস্টেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। টনি সেখানেই তার ইজেল নিয়ে বসে পড়ে। দূর আকাশের ছবি আঁকে। খিদে পেলে ডোমিনিক পিকনিক পার্টির ব্যবস্থা করে। তারা কোনো একটা কুঞ্জবনে বসে

বসে খাবার খায়। তারপর? দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ভালোবাসার মুহূর্ত টনি তার জীবনে এত আনন্দ কখনও পায়নি।

তার কাজ অত্যন্ত দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

একদিন সকালে তার কাজ দেখে ক্যানটাল অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বললেন ভারী

সুন্দর এঁকেছ, তোমার আঁকা শরীরটা দেখে মনে হচ্ছে, তুমি বোধ হয় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ পাবে।

টনি ডোমিনিকের কাছে খবরটা বলে দিল।

-আমি নিশ্বাসকে তুলে আনতে পেরেছি। কেন বলো তো? আমি মডেলকে রোজ রাতে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকি, তাই তো।

ডোমিনিক হেসে উঠল উত্তেজনায়। তারপর শান্ত স্বরে বলল–টনি, আরও কয়েক বছর তোমাকে হয়তো স্কুলে থাকতে হবে। তুমি এখনই তৈরি হচ্ছে, আমাদের স্কুলের সকলে তা দেখতে পাচ্ছে। এমনকি ক্যানটালের নজরে পর্যন্ত পড়েছ।

টনির মনে চিন্তা, না, এখনও অনেক কিছু আমাকে শিখতে হবে। এখন আমি অন্য সবার ভিড়ে হারিয়ে যাব। আমার নিজস্ব শিল্পীসত্তা এখনও জেগে ওঠেনি। টনির সবসময় মনে হয়েছে, জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করাটাই বড়ো ব্যাপার।

কোনো কোনো সময় টনি একটা ছবি আঁকা শেষ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সে মনে মনে ভাবে, আমার মধ্যে কল্পনা শক্তি আছে। হ্যাঁ, আমার মধ্যে প্রতিভা আছে। আবার কখনও মনে হয়, না, এখনও কিছুই শিখতে পারিনি আমি।

ডোমিনিক ক্রমাগত তাকে উৎসাহ দিয়ে চলেছে। টনি আস্তে আস্তে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই সে চব্বিশখানা নিজস্ব ছবি আঁকা শেষ করল। তার মধ্যে একদিকে যেমন ল্যান্ডস্কেপ আছে, অন্যদিকে আছে মানুষের প্রতিচ্ছবি। একটা ছবিতে ডোমিনিক নগ্নিকা হয়ে গাছের তলায় শুয়ে আছে। সূর্যের আলো তার শরীরকে আলোকিত করেছে।

এমনই অসাধারণ কিছু রূপকল্পতা।

ডোমিনিক এই ছবিটা দেখে বলল –আঃ, তোমার একটা প্রদর্শনী করা উচিত।

–তুমি কী পাগল হলে ডোমিনিক। আমি এখনও তৈরি হইনি।

–না, তুমি তৈরি হয়েছ।

টনি পরের দিন সন্ধেবেলা ওই অ্যাপার্টমেন্টে এল, একটু দেরি হয়েছে হয়তো। ডোমিনিক একা নেই। একটা পাতলা চেহারার লোক সেখানে বসে আছে। তার নাম অ্যান্টন জর্জ। তার চোখের তারা অদ্ভুত। সে বোধহয় কথা বলছে। ভদ্রলোক হলেন জর্জ গ্যালারির। অধিকর্তা। এই গ্যালারিটা উঠতি শিল্পীদের পক্ষে আদর্শ। সেখানে টনির ছবির প্রদর্শন হবে।

টনি জানতে চেয়েছিল–কী হচ্ছে?

ভদ্রলোক জবাব দিলেন –আপনার হাতের কাজ দারুণ। পিঠ চাপড়ে তিনি বললেন, আমি এই ছবিগুলো আমার গ্যালারিতে রাখতে চাইছি।

টনি ডোমিনিকের দিকে তাকাল। ডোমিনিক মুচকি মুচকি হাসছে।

-আমি জানি না, কী করব?

–হ্যাঁ, আপনার উত্তর আমি জেনে গেছি। ভদ্রলোক জবাব দিলেন।

সমস্ত রাত টনি এবং ডোমিনিক জেগে ছিল। উত্তেজনায় টগবগ করে তারা ফুটছে।

-মনে হচ্ছে সমালোচকরা আমাকে কেটে ফেলবে।

–তুমি ভুল করছ টনি।

সমস্ত রাত ধরে তারা আসন্ন প্রদর্শনীর বিষয়ে আলোচনা করল। টনি এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না যে, প্যারিসের বুকে তার একক প্রদর্শনী হতে চলেছে।

টনি বলল –ডোমিনিক, আমার মনে হচ্ছে, আমি এখনও তৈরি নই। সমালোচকরা আমাকে খেয়ে ফেলবে।

-তুমি ভুল করছ, এখনই তোমাকে সকলের সামনে হাজির হতে হবে। এটা একটা ছোটো গ্যালারি। স্থানীয় লোকেরা এখানে আসে, তারা তোমার ছবির বিচার করবে। তারা কোনোভাবেই তোমাকে আঘাত করবে না। ওই ভদ্রলোক অত্যন্ত সমঝদার মানুষ। তিনি তোমার মধ্যে সম্ভাবনা না দেখলে কখনোই এই প্রস্তাবে রাজী হতেন না। তিনি স্বীকার করেছেন, একদিন তুমি মস্ত বড়ড়া শিল্পী হবে।

টনি জানে না, হয়তো আমাকে একদিন শিল্পকর্ম বিক্রি করতে হবে।

***

এবার কেবিলটা এসে গেছে, শনিবার প্যারিসে আসছি, ডিনারে আমার সঙ্গে যোগ দিও। ভালোবাসা। মা।

টনির প্রথম চিন্তা হল, তার স্টুডিওতে এসে প্রবেশ করছে। হ্যাঁ, মা এখনও যথেষ্ট আকর্ষণীয়া। মধ্য পঞ্চাশ। চুলের কোথাও এতটুকু অযত্ন নেই। ভারী সুন্দর শরীর, হ্যাঁ, এখনও উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। টনি একবার মাকে প্রশ্ন করেছিল–মা, তুমি কেন আবার বিয়ে করছ না?

মা উত্তর দিয়েছিলেন জীবনে টনি এবং তার বাবা ছাড়া আর কোনো পুরুষের কথা তিনি ভাবতেই পারবেন না।

এখন প্যারিসে তার ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে দাঁড়িয়ে সে মাকে বলল –মা, তোমাকে দেখে ভালোই লাগছে।

–টনি, তোমাকে দেখে এত উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছে কেন? এসো, তুমি লিঙ্কনের ছেলেবেলার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছো। তুমি বোধহয় ভালো কাজের মেয়ে পেয়েছ? জায়গাটা একেবারে পালটে গেছে।

কেটি ইজেলের কাছে পৌঁছে গেলেন।

টনি একটা ছবির কাজ করছে। অনেকক্ষণ সে দিকে তাকিয়ে থাকলেন। হ্যাঁ, কেটি তার অহংকার চেপে রাখতে পারছেন না।

উনি বললেন–ছবি আরও দেখাও।

পরবর্তী দু ঘন্টা ধরে শুধু ছবিই দেখা হল। কেটি সব ছবির বিষয়ে খুঁটিনাটি জানতে চাইলেন। কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটা দারুণ উত্তেজনা। হ্যাঁ, টনি কত বড় শিল্পী হবে, তিনি তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন।

কেটি বললেন আমি একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করব। কজন ডিলারের সাথে কথা বলতে হবে।

-মা, ধন্যবাদ। আসছে শুক্রবার আমার ছবির একটা প্রদর্শনী হবে। একটা গ্যালারি আমাকে সাহায্য করছে।

কেটি হাত তুলে সামনে এগিয়ে এসে বললেন একটা দারুণ খবর। কোন গ্যালারি?

-জর্জ গ্যালারি।

–না, আমি বিশ্বাস করছি না।।

–গ্যালারি ছোটো। কিন্তু এই দিয়েই তো আমাকে শুরু করতে হবে।

গাছের তলায় ডোমিনিকের ছবি। মা অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন। তার চাউনিতে বিরক্তি ঝরে পড়ছে। না, এই ছবিটা কিন্তু ঠিক হয়নি। তবে মুখে তিনি কোন বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। তিনি জানেন কীভাবে মনের ভাবকে গোপন রাখতে হয়।

ডোমিনিক হাসি মুখে এগিয়ে এল।

–মিসেস ব্ল্যাকওয়েল, আপনি কেমন আছেন?

কেটি বললেন আমার ছেলে তোমার যে ছবিটা এঁকেছে, সেটা অসাধারণ।

বাকিটুকু আর বলা হল না।

–টনি কি আপনাকে বলেছে, ওর একটা প্রদর্শনী হবে?

–হ্যাঁ, খবরটা খুবই ভালো।

–মা, তুমি থাকবে তো?

–আমার একটা বোর্ডমিটিং আছে। পরশুদিন জোহানেসবার্গে। সেখানে আমাকে যেতেই হবে। তবে আগে জানলে আমি হয়তো অন্য কিছু করতাম। দেখা যাক, কী হয়?

–ঠিক আছে, টনি বলল, আমি বুঝতে পেরেছি। উনি একটু ইতস্তত করছে। ডোমিনিককে দেখে মার মনে কী হতে পারে? কিন্তু কেটি এখন শুধু ছবিগুলোর কথাই ভাবছেন।

–ঠিক লোক তোমার ছবি দেখতে আসবে তো?

–কারা সঠিক লোক বলে মনে করেন মিসেস ব্ল্যাকওয়েল।

কেটি ডোমিনিকের দিকে তাকিয়ে বললেন–যাদের কথায় শিল্পজগত ওঠা বসা করে। যেমন ধরো আন্দ্রের মতো একজন মহান সমালোচক।

আন্দ্রেকে শিল্পজগতের সেরা সমালোচক বলা হয়। তিনি হলেন এমন এক গর্জনশীল সিংহ, যিনি শিল্পমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর কলমের কয়েকটা শব্দ শিল্পীর জীবনধারা পালটে দিতে পারে। তাকে প্রত্যেকটা ছবি উদ্বোধনের জন্য ডাকা হয়। তিনি শুধু বড়ো বড়ো ছবিগুলোই উদ্বোধন করতে যান। গ্যালারির মালিক এবং শিল্পীরা তার উপস্থিতিতে শিহরিত হয়ে ওঠে। কখন কীভাবে তার সমালোচনা প্রকাশিত হবে, তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে থাকে। প্যারিসে সকলের কাছে তার নাম পৌঁছে গেছে। আন্দ্রেকে আবার অনেকে ঠিকমতো শ্রদ্ধা করতে পারে না। পাশাপাশি তিনি শ্রদ্ধা এবং নিন্দা একই সঙ্গে অর্জন করেছেন।

টনি ডোমিনিকের দিকে তাকিয়ে বলল এই ছোটো গ্যালারিতে উনি আসবেন কেন?

–ও টনি, ওনাকে আসতেই হবে। উনি রাতারাতি তোমাকে বিশ্ববিখ্যাত করে দেবেন।

অথবা, আমাকে ভেঙে ফেলবেন।

–নিজের ওপর বিশ্বাস নেই কেন?

ডোমিনিক বলল –ও ভীষণ আত্মবিশ্বাসী, কিন্তু আমরা কী করে ওনাকে এখানে হাজির করব?

-দেখতে হবে ওনার সাথে কার যোগাযোগ আছে।

ডোমিনিকের মুখে হাজার আলো তাহলে তো সাংঘাতিক হবে। সে টনির দিকে ফিরে বলল, যদি উনি আসেন, তাহলে কী হবে বলো তো?

-হ্যাঁ, সকলের কাছে আমার নাম পৌঁছে যাবে।

–আমি ওনার শিল্পসত্তার কথা বলছি। টনি আমি জানি, উনি কী ভালোবাসেন। উনি তোমার ছবির প্রশংসা করবেন।

কেটি বললেন –তুমি কি চাইছ, উনি আসবে টনি? তাহলে আমি দেখব।

-হ্যাঁ, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল, আপনি চেষ্টা করুন। ডোমিনিক বলল।

টনি বলল আমি তো বুঝতেই পারছি না। চেষ্টা করা যাক।

কেটি আবার ছবির দিকে তাকালেন, অনেকক্ষণ, তারপর টনির দিকে তাকালেন। তারপর বললেন –আমি কাল প্যারিস ছেড়ে চলে যাব। তুমি কি আমার সাথে রাতে ডিনার খাবে?

টনি বলল, হ্যাঁ, আজ আমরা ফাঁকা আছি।

কেটি ডোমিনিকের দিকে তাকিয়ে বললেন ম্যাক্সিমে ডিনার খাবে তো?

টনি বলল –ডোমিনিক আর আমি একটা ছোট্ট কাফের কথা জানি। সেটা কিন্তু বেশি দূরে নয়।

তারা প্যালেস ভিটোরিতে গেল। এখানকার খাবার খুবই ভালো। ওয়াইন চমৎকার। দুজন কথা বলার চেষ্টা করছিল। টনি জানে, এই দুজনই আমার জীবনে সব থেকে বড়ো সম্পদ। এদের সাথেই আমি আমার জীবনের সেরা রাতগুলো কাটিয়েছি। একজন আমার মা, আর অন্য মেয়েটিকে আমি বিয়ে করতে চলেছি।

পরের দিন সকালে কেটি এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করলেন আমি অনেককে ফোন করেছি। কিন্তু আন্দ্রের ব্যাপারে কেউ ঠিক কিছু বলতে পারছে না। যাই হোক, তোমাকে নিয়ে আমি গর্ব করতে পারি। তোমার ছবিগুলো দারুণ হয়েছে।

***

জর্জ গ্যালারিটা খুব একটা বড়ো নয়। এখানে টনির আঁকা ছত্রিশটা ছবি টাঙানো হয়েছে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। এককোণে চিজ রাখা হয়েছে, বিস্কুট এবং ওয়াইনের বোতল। অ্যান্টন দাঁড়িয়ে আছেন। টনি, ডোমিনিক আর এক সহকারিণীকে দেখা গেল। এখন প্রস্তুতি চলছে।

অ্যান্টন তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন সাতটার সময় উদ্বোধন, এখন থেকেই লোকের আসা শুরু হওয়া উচিত।

টনি একটু উত্তেজিত। কিন্তু সে নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু আমার উত্তেজনা কেন থাকবে?

যদি কেউ না আসে, সে ভাবল। একজনও না আসে, তাহলে কী হবে?

ডোমিনিক হাসল- তাহলে এইসব চিজ আর ওয়াইন আমরা ভাগ করে খেয়ে নেব।

নোকজনের আগমন শুরু হয়ে গেছে। প্রথমে অল্প অল্প। তারপর অনেকে। গ্যালারির মালিক নিজে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রত্যেককে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছেন। কিন্তু ওদের দেখে মনে হচ্ছে না, ওরা ছবি কিনবে। টনি ভাবল। সে তার ছবিগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করেছে –আর্টিস্ট এবং ছাত্রদেরও, দেখা গেল। এবার বোধহয় একটা প্রতিযোগিতা শুরু হবে। না, আমি একটা ছবি বিক্রি করব না, টনি ঠিক করল।

জর্জ হলের দিকে তাকিয়ে বললেন এই লোকগুলোর সাথে কথা বলা উচিত?

টনি ডোমিনিককে প্রশ্ন করল –এরা কে? এরা কি আমার ছবির সমালোচক।

-না, টনি, এরা তোমার সাথে কথা বলতে চাইছে। তুমি এগিয়ে যাও।

টনি সকলের সঙ্গে কথা বলল। ছবি সম্পর্কে খুঁটিনাটি প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করল।

তখনও লোক আসছে। টনি বুঝতে পারছে না, এরা কেন আসছে? বিনা পয়সায় মদ এবং চিজ খাবে বলে? নাকি এরা সত্যিই শিল্পের সমঝদার। এখনও পর্যন্ত তার একটা ছবিও বিক্রি হয়নি। কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত মদের বোতল খালি হচ্ছে। চিজ উড়ে যাচ্ছে।

জর্জ বললেন –ধৈর্য ধরতে হবে। ওরা উৎসাহী। প্রথম দিনই ছবি কেউ কেনে না। তোমার ছবি দেখবে, আবার আসবে, বাড়ি গিয়ে ভাববে, তারপর কিনবে।

-আমি কি সত্যি সত্যি এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছি, টনি ডোমিনিককে বলল।

-একটা বিক্রি হয়েছে, জর্জ আনন্দে চিৎকার করলেন। নরম্যান্ডি লাভস্কেপ, পাঁচশো ফ্রাঙ্কে।

যতদিন টনি বেঁচে থাকবে, এই মুহূর্তটাকে হয়তো ভুলতে পারবে না। কেউ একজন তার ছবি কিনেছে। কেউ একজন তার ছবি কিনে দাম দিয়েছে। আহা, অনেকের কথাই তার মনে পড়ে গেল। দ্য ভিঞ্চি এবং মাইকেল এঞ্জেলো। রেমব্রান্ট। সে এখন শিক্ষানবীশ ছাত্র নয়। সে একজন পেশাদার শিল্পী। কেউ তার ছবির জন্য পয়সা দিয়েছে।

ডোমিনিক ছুটে এল। ডমিনিকের চোখে উজ্জ্বল আলো। কণ্ঠে উত্তেজনা আর একটা বিক্রি হয়েছে।

-কোনটা?

–পুষ্পহার।

এখন লোক ভর্তি, লোকের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ থমথমে নীরবতা।

উনি এলেন আন্দ্রে। মধ্য পঞ্চাশ, সাধারণ ফরাসি মানুষদের থেকে আর একটু লম্বা। দৃঢ় কঠিন সংবদ্ধ মুখ। সাদা চুল। ভারী সুন্দর পোশাক পরেছেন। মাথায় হ্যাট। তার পেছনে অনুগত অনুরাগীর দল। সকলে তাকে জায়গা করে দিল।

ডোমিনিক টনির হাতে মুচকে বলল –উনি এসেছেন, উনি এসে গেছেন।

উনি এসে দাঁড়ালেন।

গ্যালারির মালিক বললেন–কী খাবেন স্যার? আমি তো বিশ্বাস করতে পারছি না, আপনি এসেছেন। কী দেব? একটু রেড ওয়াইন?

আরও ভালো মদ কেন রাখা হল না, গ্যালারির মালিক নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করছেন।

উনি বললেন না, আমি শুধু চোখের খিদে মেটাতে এসেছি। আর্টিস্ট কোথায়? তার সঙ্গে কথা বলব।

-এই হল টনি ব্ল্যাকওয়েল।

টনি তার হারানো কণ্ঠস্বর ফিরে পেয়েছে –আপনি এসেছেন বলে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

আন্দ্রে একটির পর একটি ছবির দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছেন। প্রত্যেকটা ছবির দিকে অনেকক্ষণ তাকাচ্ছেন। পরবর্তীটা দেখছেন। টনি তার মুখের ভাষা পড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তিনি রাগছেন না, হাসছেন না। একটা ছবির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। ডোমিনিকের নগ্নিকা ছবি। তারপর এগিয়ে গেলেন। পুরো ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। টনির সমস্ত শরীর দিয়ে ঘাম ঝরতে শুরু করেছে।

আন্দ্রের ছবি দেখা শেষ হল। তিনি বললেন–এখানে আসাতে আমি খুব খুশি হয়েছি।

তারপর উনি চলে গেলেন। সব কটা ছবি বিক্রি হয়ে গেল। এক নতুন শিল্পীর জন্ম হচ্ছে। জন্ম মুহূর্তটিকে সকলে স্মরণযোগ্য করতে চাইছেন।

মঁসিয়ে জর্জ বললেন না, আমি এমনটি কখনও দেখিনি। আন্দ্রে এই প্রথম আমার গ্যালারিতে এসেছেন। কাল সমস্ত প্যারিসে আমার ছোট্ট গ্যালারির নাম ছড়িয়ে পড়বে।

সেই রাতে টনি এবং ডোমিনিক নিজেদের মতো করে আনন্দ করছিল। ডোমিনিক টনিকে জড়িয়ে ধরে শুয়েছিল। সে বলল আমি এর আগে অনেক শিল্পীর সঙ্গে শুয়েছি।

কিন্তু এমন কোনো শিল্পী নয় যে, তোমার মতো বিখ্যাত হতে চলেছে। কাল সমস্ত প্যারিসের সর্বত্র তোমার নাম ছড়িয়ে পড়বে।

ডোমিনিকের অনুমান সঠিক বলে প্রমাণিত হল।

***

পরের দিন সকালবেলা, টনি এবং ডোমিনিক পোশাক পরে নীচে নেমে গেল। ইয়সকের খবরের কাগজ এসেছে। টনি পাতাটা খুলে দেখল। হ্যাঁ, আন্ত্রের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। লেখা হয়েছে আমেরিকার তরুণ চিত্রকর অ্যান্থনি ব্ল্যাকওয়েলের ছবির প্রদর্শনী চলেছে জর্জ গ্যালারিতে। এটা একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা। আমি এর আগে অপটু কাজের অনেক প্রদর্শন দেখতে গিয়েছি। কিন্তু সেগুলো ভুলে গিয়েছি। গতকাল রাত পর্যন্ত আমার মনে ছিল ...টনির সমস্ত মুখে লজ্জা।

ডোমিনিক, বলল –তুমি কাগজটা আমাকে দাও।

টনি আবার পড়তে শুরু করে আমি ভেবেছিলাম এটা বোধ হয় এক ধরনের রসিকতা। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে, এই ধরনের বাজে ছবিগুলোকে কেন টাঙিয়ে লোক হাসানো হয়। আমি কোথাও প্রতিভার সামান্যতম বিচ্ছুরণ দেখলাম না। আহা, মনে হয়, শিল্পীকে টাঙিয়ে রাখলেই বোধহয় ভালো হত। মি. ব্ল্যাকওয়েলকে আমি একটাই উপদেশ দেব, তিনি যেন তার আসল কাজে ফিরে যান।

ডোমিনিক চিৎকার করে বলল আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। এধরনের বাজে সমালোচনা?

টনির মনে হল, তার সমস্ত শরীরে বুঝি কঁপুনি ধরেছে। সে বলল আমি বিশ্বাস করি না। এত কষ্ট? আমি কী বোকা।

-তুমি কোথায় যাচ্ছো, টনি?

–আমি জানি না।

টনি ভোরের আকাশের দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলল। সে জানে না, তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্যারিসের সমস্ত লোক এই সমালোচনা পড়বে। সকলে তার দিকে তাকিয়ে উপহাস করবে। কিন্তু? আমি কি নিজেকে প্রতারিত করলাম? তার মানে? শিল্পী হিসেবে আমার সামনে এখন কোনো ভবিষ্যৎ নেই? শেষ পর্যন্ত আন্দ্রে হয়তো আমাকে একটা মস্ত বড়ো ভুলের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। না, টনি ভাবল, আমি আর কখনও শিল্পী হবার স্বপ্ন দেখব না। এই বারটা এই মাত্র খুলেছে, টনি সেখানে ঢুকে গেল। তাকে এখন আকণ্ঠ মদ গিলে মাতাল হতে হবে।

***

টনি শেষ পর্যন্ত তার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসেছে। পরের দিন সকাল পাঁচটা।

ডোমিনিক সমস্ত রাত তার জন্য অপেক্ষা করেছে–তুমি কোথায় ছিলে টনি? তোমার মা কতবার ফোন করেছেন জানো? উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

-মা কি লেখাটা পড়েছেন?

–হ্যাঁ, আমি পড়ে শুনিয়েছি।

টেলিফোন বেজে উঠল। ডোমিনিক টনির দিকে তাকিয়ে বলল–মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। ছেলে এই মাত্র ফিরেছে। সে রিসিভারটা টনির হাতে তুলে দিল।

-হ্যালো, মা?

কেটির কণ্ঠস্বরে হতাশা –টনি, আমি জানি না, এ ব্যাপারটা তুমি কেমনভাবে নিয়েছ?

–মা, এটা কোনো ব্যবসা নয়। এটা এক সমালোচকের মন্তব্য। তাঁর মন্তব্য হচ্ছে, আমাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত।

–ডার্লিং, তুমি কি দুঃখ পেয়েছ?

কেটি আর কথা বলতে পারলেন না।

-মা, আমি চেষ্টা করেছিলাম, আমি পারলাম না। আমি হয়তো চলে যাব। তিনি আমাকে একটা মস্ত বড়ো বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

–টনি, আমি কিছু বলতে চাইছি।

-হ্যাঁ, আজ থেকে দশ বছর পরে এই ঘটনাটা ঘটলে কী হত বলো তো? আমাকে এখুনি প্যারিস থেকে চলে যেতে হবে।

–আমার জন্য অপেক্ষা করো। আমি কাল জোহানেসবার্গ ছেড়ে যাচ্ছি। আমরা একসঙ্গে নিউইয়র্কে ফিরে যাব। কেমন?

–ঠিক আছে। টনি বলল। সে রিসভারটা রেখে ডোমিনিকের দিকে তাকাল–ডোমিনিক, আমি দুঃখিত, তুমি এক ভুল মানুষকে বেছে ছিলে।

ডোমিনিক কোনো কথা বলল না। সে দেখতে পেল, টনির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

***

পরের দিন বিকেলবেলা, ক্রুগার ব্রেন্টের অফিস। কেটি ব্ল্যাকওয়েল একটা চেক লিখছিলেন। উল্টোদিকের চেয়ারে বসে থাকা একজন মানুষ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। আপনার ছেলের মধ্যে অসাধারণ প্রতিভা ছিল। তাকে এভাবে হত্যা করা হল। ব্যাপারটা ভাবতে আমার খারাপ লাগছে।

কেটি ঠাণ্ডা ভাবে তাকিয়ে বললেন–আন্দ্রে, এই ধরনের হাজার হাজার শিল্পী সারা পৃথিবীতে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার ছেলে একজন তোক বাড়িয়ে কী করবে।

উনি চেকটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে ছিলেন–আপনার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এবার আমাকে আমার কাজ করতে দিন। জুগার ব্রেন্ট লিমিটেড জোহানসবার্গে অনেকগুলো শিল্প সংগ্রহশালা খুলবে। এর পাশাপাশি লন্ডন এবং নিউইয়র্কে আমরা এই সংগ্রহশালাগুলো খুলব। আপনি ভালো ছবি নির্বাচন করবেন, কেমন? হ্যাঁ, আপনাকে ভালো কমিশন দেওয়া হবে।

আন্দ্রে চলে গেছেন। কেটি ডেস্কে গিয়ে বসলেন। মনের ভেতর ভীষণ বিষণ্ণতা। ছেলেকে তিনি ভালোবাসেন। যদি এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের কথা ছেলে কোনোদিন জানতে পারে, তাহলে কী হবে? কিন্তু টনি এইভাবে এক শিল্পী হবে, এটা তিনি সহ্য করবেন কী করে? হ্যাঁ, টনির জন্য একটু কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু কোম্পানিকে তো বাঁচাতে হবে।

কেটি উঠলেন, ক্লান্তি এসে গ্রাস করেছে সমস্ত শরীর। এখন টনিকে বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে।

হ্যাঁ, এবার টনি অন্য ভূমিকাতে অবতীর্ণ হবে।

.

১৯.

পরবর্তী দু বছর ধরে টনি ব্ল্যাকওয়েল ব্যবসার মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখল। প্রথমে এই বিশাল ব্যবসাটা কী, সে বুঝতে পারেনি। ক্রুগার ব্রেন্টের সাম্রাজ্য এখন আরও বিস্তৃত

হয়েছে। অনেকগুলো কাগজের মিল কিনেছে। একটা ব্যক্তিগত বিমান সংস্থা। ব্যাঙ্ক এবং অনেকগুলো হাসপাতাল। টনি সব কিছু শান্তভাবে শিখছে। সে বিভিন্ন ক্লাব এবং সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। সে জানে, এগুলো তাকে কত সাহায্য করবে।

টনি সকাল থেকে রাত অব্দি পরিশ্রম করে। গাড়ি চালায়, আগেকার স্মৃতিকে ভুলে যাবার চেষ্টা করে। মাঝে মধ্যে ডোমিনিককে চিঠি লেখে। চিঠিগুলো ফেরত আসে ওই অবস্থায়। অ্যানকে ফোন করেছিল। অ্যান্টন বলেছেন, ডোমিনিক আর সেখানকার মডেল নয়। সে কোথায় হারিয়ে গেছে।

টনি এখন ভালো ভাবেই কাজ করছে। হা, এর মধ্যে তার কোনো আবেগ নেই। ভালোবাসা নেই। হয়তো এক সাংঘাতিক শূন্যতা। টনি সম্পর্কে নিয়মিত রিপোর্ট আসছে কেটির হাতে। কেটি ছেলের কাজে খুবই খুশি।

কেটি একদিন ব্রাড রজারসকে বললেন ব্যবসার প্রতি ছেলের আগ্রহ দেখে আমি অবাক হচ্ছি।

হ্যাঁ, কেটির কাছে এখন চরম নিশ্চিন্তির সময়। শেষ পর্যন্ত ব্যবসাটা ধ্বংস হবে না, এ ব্যাপারে উনি সুনিশ্চিত।

***

১৯৪০ সাল, দক্ষিণ আফ্রিকাতে জাতীয়তাবাদী দল ক্ষমতায় এসেছে। এখন অভিভাষণের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করা হয়েছে। সরকার নতুন নতুন নিয়মনীতি প্রবর্তন করছে। দেশে

গণতন্ত্রের শাসন আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। এরই পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। পুলিশ দাঙ্গাকারীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করছে। কেটি মাঝে মধ্যে খবরের কাগজের পাতায় এইসব প্রতিবেদন পড়ে থাকেন। বান্দার নাম সবসময় লেখা থাকে। বান্দা এখনও অন্তরালে থেকে কাজ চালাচ্ছেন। অনেক বয়স হয়ে গেছে, তবুও হার মানছেন না। হ্যাঁ, কেটি ভাবলেন, বান্দাকে কেউ কখনও পরাস্ত করতে পারবে না।

কেটি তার ছাপান্নতম জন্মদিন পালন করলেন ফিফথ এভিনিউর বাড়িতে, টনির সঙ্গে। তিনি ভাবলেন, চব্বিশ বছরের ছেলেটি এখন আমার উত্তরাধিকারী। কিন্তু আমাকে দেখলে কেউ কি ওর মা বলে ভাববে?

ছেলে বলল–আনন্দ মুখর জন্মদিন।

–তুমি আমাকে আর একটু খুশি করবে.তো? আমি তো কিছুদিন বাদে সবকিছু ছেড়ে দেব। কেটি ভাবলেন, তোমাকে আমার জায়গা নিতে হবে।

কেটির ইচ্ছেতে, তারা এখন ফিফথ এভিনিউতে চলে এসেছেন।

কেটি বলেছিলেন তোমাকে একটু নিরাপদে থাকতে হবে।

টনি এই ব্যাপারে কোনো কথা বলতে পারেনি।

রোজ সকালবেলা টনি এবং কেটি এক সঙ্গে ব্রেকফাস্টের আসরে বসেন। ক্রুগার ব্রেস্ট লিমিটেড নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। টনি ইতিমধ্যেই তার কার্যকলাপের দ্বারা মাকে অবাক করে দিয়েছে। ব্যবসাটাকে আরও বড়ো করতে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

***

প্যান আমেরিকানের ফ্লাইট। রোম থেকে নিউইয়র্ক। এখানে কোনো ঘটনা ঘটেনি। টনি এই এয়ার লাইনকে ভালোবাসে। এরা খুব ভালো কাজ করে। সে মাঝে মধ্যেই এই প্লেনে চড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়।

সেবার পাশে এক মধ্য বয়সিনী যাত্রীকে দেখতে পেল সে।

ফ্যাশান ম্যাগজিন পড়ছে। সে একটা পাতা ওলটাল, টনি দেখল, তার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেছে। বল গাউন পরা এক মডেলের ছবি। ডোমিনিক। হ্যাঁ, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই চোখ, এই চিবুক, এই বুক–কেউ কী ভুলতে পারে?

-আমাকে ওই কাগজটা দেবেন?

পরের দিন সকালবেলা, টনি বিজ্ঞাপন সংস্থার নাম জানল। সে বলল আমি একজন মডেলের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। আপনি কি সাহায্য করতে পারেন? আমি হোপ পত্রিকাতে তার ছবি দেখেছি। ব্রথম্যান স্টোরে বল গাউন পরে দাঁড়িয়ে আছে।

-হ্যাঁ।

–ওই মডেল এজেন্সির নাম কী?

–কালটন ব্লেসিং এজেন্সি।

টেলিফোন নাম্বার টনির হাতে চলে এসেছে।

টনি এক মহিলার সাথে কথা বলল–ডোমিনিক ম্যাসেনের খবর কী?

-না, আমরা ব্যক্তিগত খবর দেব না।

টনি সেখানে বসে রইল। রিসিভারের দিকে তাকিয়ে। কী করে ডোমিনিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়? সে ব্রাড রজারসের অফিসে গেল।

–টনি কফি চলবে।

–না, ধন্যবাদ ব্রাড। কালটন ব্লেসিং মডেল এজেন্সির নাম শুনেছেন?

–হ্যাঁ, কী হয়েছে? এটা তো আমাদেরই।

–কী?

–হ্যাঁ, এটা আমাদের একটা সহযোগী সংস্থা।

–এটা আমরা কবে কিনেছি?

কয়েক বছর আগে, তখন তুমি সবেমাত্র এই সংস্থায় যোগ দিয়েছ। কেন কী হয়েছে?

–একজন মডেলের ঠিকানা চাই।

–বলো, আমি বলে দিচ্ছি।

সন্ধেবেলা, টনি কালটন ব্লেসিং এজেন্সির অফিসে গিয়ে তার নাম বলল। ষাট মিনিট বাদে তার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট মিস্টার ক্লিটনের দেখা হল। ক্লিটনের কাছ থেকে টনি জানতে পারল যে, তার মায়ের একান্ত অনুরোধ এবং আগ্রহে ডোমিনিককে মডেল হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

ডোমিনিকের সাথে আগামীকাল দেখা হতে পারে।

***

টনি ডোমিনিকের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর বাইরে সে ডান গাড়িতে অপেক্ষা করছে।

ডোমিনিক বেরিয়ে এলহা, তার সাথে একটা মস্ত বড়ো চেহারার লোক। ডোমিনিক টনিকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

-তুমি এখানে কী করছ?

–তোমার সঙ্গে কথা বলব।

বড়ো চেহারার লোকটা বলল –অন্য কোনো সময়, আমরা এখন ব্যস্ত আছি।

টনি বলল–তোমার বন্ধুকে এখন যেতে বলো।

-তুমি আমাকে তাড়িয়ে দেবার কে হে?

ডোমিনিক লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল –কেন, তুমি এখন চলে যাও। তোমাকে একটু পরে ডাকছি।

লোকটা চলে গেল গটগট করতে করতে।

ডোমিনিক টনির পাশে এসে বসেছে। ডোমিনিক বলল–তুমি ভেতরে এসো।

অ্যাপার্টমেন্টে একটা মস্ত বড়ো ডুপ্লেক্স। সুন্দর সাজানো। অনেক দাম পড়েছে নিশ্চয়ই।

টনি বলল তুমি কেমন আছো?

-হ্যাঁ, আমি এখন ভালো আছি। তুমি কি ড্রিঙ্ক নেবে?

–না, ধন্যবাদ। প্যারিস থেকে চলে আসার পর তোমার কথা খুব ভেবেছি।

–আমি চলে গিয়েছিলাম।

–কোথায়?

–আমেরিকায়।

–কালটন ব্লেসিং এজেন্সিতে কীভাবে কাজ পেলে?

–আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম।

–তুমি আমার মার সাথে কখন দেখা করলে ডোমিনিক?

–কেন তোমার অ্যাপার্টমেন্টে? প্যারিসে? মনে নেই?

—না, সত্যি করে বলল, আমি কখনও কোনো মহিলাকে আঘাত করিনি। কিন্তু তুমি যদি মিথ্যে কথা বলল, তাহলে আমি তোমার মুখে আঘাত করব।

ডোমিনিক কথা বলতে পারছে না।

সে বলল–সত্যি করে বলো। আমার মায়ের সাথে তোমার কখন কোথায় দেখা হয়েছিল।

–যখন তুমি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলে। তোমার মা আমাকে তোমার মডেল হতে বলেছিল।

টনির পেটে অসম্ভব যন্ত্রণা। তবুও সে বলতে থাকে যাতে তোমার সাথে আমার দেখা হয়, তাই তো?

-হ্যাঁ।

–তুমি আমার সাথে ভালোবাসার অভিনয় করেছিলে?

-হ্যাঁ, এটা একটা যুদ্ধ। ব্যাপারটা সাংঘাতিক। আমার হাতে কোনো টাকা ছিল না। টনি বিশ্বাস করো, শেষ পর্যন্ত তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম।

–আর কতগুলো প্রশ্নের জবাব দেবে?

টনির কণ্ঠস্বরের মধ্যে তিক্ততা ঝরে পড়ছে। ডোমিনিক ভয় পেয়েছে।

–কী জানতে এসেছ?

–মা চেয়েছিল, আমার ওপর নজরদারি রাখতে, তাই তো?

–হ্যাঁ।

ডোমিনিকের ভালোবাসা মনে পড়ে গেল। এইসব টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে। মায়ের সৌজন্যে? টনির মরে যেতে ইচ্ছে করল। সে কি সারা জীবন মায়ের হাতের পুতুল হয়ে বেঁচে থাকবে? মায়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত? মা তাকে ভালোভাবে বেঁচে থাকতে দেবে না।

সে ডোমিনিকের দিকে তাকাল। তারপর বেরিয়ে গেল। টনির চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে ডোমিনিকের চোখ জলে ভরে গেছে। টনি, আমি কিন্তু তোমাকে সত্যি ভালোবাসি, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

***

কেটি লাইব্রেরিতে বসে আছেন। টনি ঢুকল। মদ খেয়েছে।

–আমি ডোমিনিকের সঙ্গে কথা বলেছি। তোমরা হাসাহাসি করেছ আমাকে নিয়ে। কি তাই তো?

কেটি বিপদ সংকেত শুনতে পেলেন টনি?

-এখন থেকে আমি আমার জীবনটা নিজের মতো চালাব। তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?

টলতে টলতে টনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কেটি শান্তভাবে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর একটা আতঙ্ক এসে তাকে গ্রাস করল।

.

২০.

পরের দিন টনি রিমেজ ভিলেজে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করল। না, মার সঙ্গে সে আর থাকবে না। মার সাথে যেটুকু দেখা হবে, ব্যবসায়িক স্বার্থে। এছাড়া আর কখনও নয়।

কেটির হৃদয় ভেঙে গেছে। কিন্তু তিনি তো সঠিক পথের সন্ধান করতে চেয়েছিলেন।

ব্রাড রজারস কেটির অফিসে এসে বলল–কেটি, সমস্যা কিন্তু আরও বাড়বে।

-কী হয়েছে?

–দক্ষিণ আফ্রিকা সংসদ কালো মানুষদের অধিকার রাখতে চাইছে না। তারা কমিউনিস্ট অ্যাক্ট পাশ করেছে।

কেটি চিৎকার করে বললেন হায় ঈশ্বর।

এই আইনের সঙ্গে সাম্যবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। সরকার যে কোনো সময় যে কোনো মানুষকে শাস্তি দিতে পারবে।

–এইভাবে কালোদের অধিকার ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

কেটি বলার চেষ্টা করলেন।

–মি. পিয়ারস ফোন করেছেন জোহানেসবার্গ থেকে।

জোনাথন পিয়ারস হলেন জোহানেসবার্গ ব্রাঞ্চ অফিসের ম্যানেজার। কেটি ফোনটা ধরলেন হ্যালো জনি, কী খবর?

–একটা খবর দিতে চাইছি।

–খবর?

–এইমাত্র একটা রিপোর্ট পেলাম যে, পুলিশ বান্দাকে ধরে ফেলেছে।

***

কেটি ফ্লাইট ধরে জোহানেসবার্গের দিকে উড়ে চলেছেন। তিনি কোম্পানির সমস্ত আইনবিশারদকে সাবধান করে দিয়েছেন, তারা যেন এখনই বান্দার সপক্ষে কোর্টে হাজির হন। এর সাথে ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেডের স্থায়িত্ব এবং সম্মান জড়িয়ে আছে।

প্লেনটা জোহানেসবার্গ এয়ারপোর্টে থামল। কেটি তার অফিসে গেলেন। কারাধ্যক্ষকে ফোন করলেন।

-ওকে আলাদা ব্লকে রাখা হয়েছে, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। কোনো ভিজিটারকে যাবার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। তবে আপনার ব্যাপারটা আমি আলাদাভাবে দেখতে পারি।

পরের দিন সকালবেলায় কেটি জোহানেসবার্গ জেলখানায় গিয়ে বান্দার মুখোমুখি বসলেন। বান্দার হাতে পায়ে শেকল। সামনে একটা কাঁচের আবরণ। চুল সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, চোখের ভেতর হতাশা এবং উত্তেজনা।

-আমি জানি, তুমি আসবে, তুমি তোমার বাবার মতো। তুমি সমস্যা থেকে দূরে থাকবে, কেমন করে?

কেটি বললেন –হ্যাঁ, এখান থেকে বেরোতে হবে। কী করে বেরোনো যায়?

–আমি জানি না। হয়তো কফিনের একটা বাক্স করে।

–না, আমি ভালো ল ইয়ার লাগাব।

–কেটি এটা ভুলে যাও, আমাকে এরা কখনও ছাড়বে না। আমাকে মরতেই হবে।

–তুমি কেন একথা বলছ?

–আমি খাঁচাবন্দী জীবন ভালোবাসি না। আমি এখান থেকে মুক্তি পেতে চাইছি।

কেটি বললেন বান্দা চেষ্টা করতেই হবে। কিন্তু এমন কিছু করো না যাতে ওদের সন্দেহ হতে পারে।

-কোনো কিছু আমাকে মারতে পারবে না। তুমি এমন একজন মানুষের সাথে কথা বলছ, যে, হাঙরদের সঙ্গে লড়াই করে যুদ্ধে জিতেছে। ল্যান্ডমাইন তাকে ওড়াতে পারিনি, কুকুরের দল কামড়াতে পারেনি। তুমি সবকিছু জানো। সেটা আমার জীবনের সেরা সময়।

***

কেটি পরের দিন আবার দেখা করতে এলেন।

সুপারিটেনডেন্ট বললেন আমি দুঃখিত মিসেস ব্ল্যাকওয়েল, এখন আর ওখানে যাওয়া যাবে না।

-কেন?

–সে কথা আমি বলব না।

***

পরের দিন সকালে কেটির ঘুম ভেঙে গেল। তিনি খবরের কাগজের সংবাদ পড়ে অবাক হলেন। ব্রেকফাস্ট খেতে পারলেন না। লেখা হয়েছে জেলখানা ভেঙে পালানোর সময় বিদ্রোহী নেতার মৃত্যু।

এক ঘণ্টা বাদে তিনি জেলখানায় পৌঁছে গেলেন।

সুপারিটেনডেন্ট বললেন উনি জেল ভেঙে পালাবার চেষ্টা করছিলেন, পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে।

কেটি জানেন, এটা একটা অসত্য কথা। বান্দার মতো মানুষ হয়তো মারা গেছেন, কিন্তু তার স্বপ্নরা চিরদিন বেঁচে থাকবে।

দুদিন কেটে গেছে, শোক যাত্রার প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। কেটি এবার প্লেনে চড়ে নিউইয়র্কের দিকে যাত্রা করেছেন। তিনি জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকলেন। আহা, এই পবিত্র প্রিয়ভূমির দিকে শেষবারের মতো তাকালেন। এই ভূমিখণ্ডের মধ্যে আছে অসাধারণ উর্বরতা। এখানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হিরে লুকিয়ে আছে। এটা হল ঈশ্বরের

নির্বাচিত পরম ভূমিখণ্ড। কিন্তু এখানকার মানুষ? কতদিন তারা অনাচার আর অত্যাচারের মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হবে?

পরের দিন সকালে কেটি রজারসকে ডেকে পাঠালেন। বললেন তোমার সাথে, কিছু গোপন আলোচনা আছে। চার্লি এবং ফ্রেডরিক সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কী?

ব্রাড ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে এসেছিল। সে বলল–চার্লি ডালাসে জন্মেছেন, উচ্চাকাঙ্খী পুরুষ, তিনি তার নিজস্ব সাম্রাজ্য চালিয়ে থাকেন। তবে তাকে হয়তো শয়তানের প্রতিভু বলা যেতে পারে।

–কত বয়স হবে?

–সাতচলিশ।

–সন্তান?

–একটি মেয়ে, পঁচিশ, মেয়েটি অসাধারণ সুন্দরী।

–মেয়েটির বিয়ে হয়েছে?

–হ্যাঁ, ডিভোর্স হয়ে গেছে।

–এবার ফ্রেডরিক হকম্যান?

-হকম্যানের বয়স চার্লির থেকে কম। তাকে দেখলে অনুভবী মানুষ বলে মনে হয়। তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ জার্মান পরিবার থেকে এসেছেন। তিনি বিপত্নীক। তার ঠাকুরদাদা একটি ইস্পাতের কারখানা শুরু করেছিলেন। ফ্রেডরিক হকম্যান ঠাকুরদাদার কাছ থেকে এই ব্যবসাটা পেয়েছেন। এছাড়া আরও কিছু সম্পত্তি পেয়েছিলেন। কমপিউটারের জগতে পদার্পণ করেছিলেন। অনেকগুলো মাইক্রো প্রসেসারের ওপরে পেটেন্ট নিয়েছেন।

-ছেলেমেয়ে?

–একটি মেয়ে আছে, বয়স তেইশ।

মেয়েটি কেমন?

–আমি এখনও জানতে পারিনি, ব্রাড রজারস একটু চিন্তা করে বলল। তারপর সে আরও বলল এই ব্যাপারে আলোচনা করে কী লাভ, কেটি? আমি হয়তো আরও তথ্য দিতে পারব, কিন্তু এই দুটো কোম্পানির কেউ তাদের ব্যবসা বিক্রি করতে চাইছে না। আমি হলফ করে বলতে পারি।

***

দশদিন কেটে গেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কেটিকে আমন্ত্রণ জানালেন। ওয়াশিংটনে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এখানে বিশিষ্ট শিল্পপতিদের ডেকে পাঠানো হয়েছে। কী করে অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশকে সাহায্য করা যায়, সেটি হল আলোচনার মূল বিচার্য বিষয়।

দুজন মানুষ সম্পর্কে আরও উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। তিনি আরও বেশি খবর আনার চেষ্টা করছেন। হ্যাঁ, এতে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িয়ে আছে। তিনি দেখলেন ফ্রেডরিক এবং চার্লি চরিত্রের দিক থেকে বিপরীত গ্রহের বাসিন্দা। ফ্রেডরিককে এক সুপুরুষ বলা যায়। তার মধ্যে আভিজাত্যের ছাপ আছে, দেখলেই বুঝতে পারা যায়, তিনি একটা কঠিন নিয়মনীতি মেনে চলেন। হ্যাঁ, ফ্রেডরিকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলে কী হয়?

***

ওয়াশিংটনের আলোচনা সভা তিনদিন ধরে চলেছিল। উপরাষ্ট্রপতি এই সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন। রাষ্ট্রপতিকেও কিছুক্ষণের জন্য দেখা গিয়েছিল। সকলেই কেটি ব্ল্যাকওয়েলের ব্যক্তিত্ব দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কেটির মধ্যে একটা আশ্চর্য জীবনসত্তা আছে, তিনি এত বড়ো এক বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী, কিন্তু পাঁচজনের মধ্যে তা প্রকাশ করেন না।

চার্লির সাথে কথা বলার সুযোগ এল।

মিস্টার চার্লি, আপনার পরিবারের সকলকে কি আপনার সঙ্গে এনেছেন?

–আমি আমার মেয়েকে এনেছি। তাকে কিছু বাজার করতে হবে।

-তাই নাকি? কেটি তার উচ্ছ্বাস দেখালেন। তারপর বললেন, শুক্রবার আমি, ডাকহারবারে একটা ছোট্ট ডিনার দিচ্ছি। আপনি কি মেয়েকে নিয়ে সেখানে আসবেন?

–হ্যাঁ, আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। আমি নিশ্চয়ই যাব।

কেটি হাসলেন–আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব, যদি কাল রাতের বিমান ধরেন, তাহলে ভালো হয়।

দশ মিনিট বাদে কেটি হকম্যানের সাথে কথা বলতে শুরু করলেন।

আপনি কি ওয়াশিংটনে এখনও রয়েছেন? আপনার স্ত্রী এসেছে নাকি?

-না, আমার স্ত্রী কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। আমি আমার মেয়ের সঙ্গে এসেছি।

কেটি জানতেন যে, তারা জে অ্যাডামস হোটেলে আছেন। ৪১৮ নম্বর স্ট্রিটে। তিনি বললেন–ডাকহারবারে আমি একটা ছোট্ট ডিনারের আয়োজন করেছি। আপনি মেয়েকে নিয়ে এলে খুব ভালো হবে।

–আমি তো জার্মানিতে ফিরে যাব। তারপর বললেন, ঠিক আছে, একদিন-দুদিন পরে গেলে কোনো অসুবিধা হবে না।

***

ডাকহারবারে পার্টি। প্রতি দুমাস অন্তর একবার করে কেটি এই আনন্দ আসরের আয়োজন করে থাকেন। এখানে পৃথিবীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানুষরা এসে উপস্থিত হন। তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। কেটি এবারের পার্টিটা দিচ্ছেন অন্য একটা উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য। তিনি টনির কাছে প্রস্তাবটা রাখলেন।

টনি বলেছিল না, আমি সোমবার কানাডা যাব। মনে হচ্ছে ফিরতে পারব না।

-ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কেটি বললেন। চার্লি এবং হকম্যান আসবেন, তোমাকে থাকতেই হবে।

-আমি জানি, ওঁরা কে। আমি ব্রাড রজারসের সঙ্গে কথা বলেছি। কিন্তু ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কী হবে?

–এই ব্যাপারটা ওখানে আলোচনা করলেই ভালো হয়।

–তুমি কোন কোম্পানি কিনতে চাইছ?

-কেন? চার্লির যে তেল কোম্পানিটা আছে, সেটা। আরব দেশে এর মস্ত বড়ো চাহিদা আছে।

-তাহলে কি আমায় থাকতে হবে?

–হ্যাঁ, তুমি থাকলে ভালো হয়। কদিন বাদে না হয় কানাডাতে যেও।

টনি এসব ব্যাপারগুলো মোটেই ভালোবাসে না। তবুও সে বলল আচ্ছা, আমি থাকব।

***

অতিথিরা একে একে সিডারহিল হাউসে আসতে শুরু করেছেন। কেটি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রত্যেককে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছেন। ব্রাড রজারস চার্লির মেয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির নাম লুসি, হ্যাঁ, অসাধারণ সুন্দরী। লম্বা, কালো চুলের বন্যা, ভারী সুন্দর বাদামী চোখের তারা। দেখতে শুনতে সত্যি অতুলনীয়। চেহারার মধ্যে কোনো খুঁত নেই। পোশাকটাও তাকে ভারী সুন্দর মানিয়েছে। ব্রাড এর আগেই সব খবর কেটিকে জানিয়েছিল। সে এক ইতালিয় ছেলেকে বিয়ে করেছিল, দুবছর আগে ডিভোর্স হয়ে গেছে।

টনির সাথে লুসির কথা হল। কেটি তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। মুখে কোনো আলাদা অভিব্যক্তি নেই।

লুসি সব কিছু দেখে অত্যন্ত আনন্দিত। তার কণ্ঠস্বরের ভেতর আনন্দ এবং উচ্ছ্বাস ঝরে পড়ছে। সে টনিকে প্রশ্ন করল–তোমরা কি এখানে বেশি সময় থাকো?

-না।

আবার প্রশ্ন তুমি কি এখানে বড়ো হয়েছ?

–আমার জীবনের কিছুটা সময় এখানে কেটে গেছে। টুনি যেন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে কেটি বললেন টনির জীবনের অনেক শুভ মুহূর্ত এই বাড়িতে কেটে গেছে।

মায়ের দিকে তাকিয়ে টনি বলল–মা, আমার বোধহয় কানাডাতে গেলেই ভালো হত।

-না, তোমাকে এখানে থাকতে হবে।

চার্লি এই নিমন্ত্রণ পেয়ে খুবই খুশি হয়েছেন। তিনি বললেন আপনার সন্তান সম্পর্কে অনেক কথাই শুনেছিলাম। এখন তাকে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

এবার কাউন্ট হফম্যানের পালা। তার মেয়ের নাম মারিয়ানা। তিনি একটু দেরি করে এসেছেন। তিনি এসেই লজ্জিত সুরে বললেন –প্লেনটা লা গার্ডিয়াতে আটকে ছিল।

কেটি বললেন–কী লজ্জার বিষয়। হকম্যান মারিয়ানাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন। তিনি বললেন স্কচ পাওয়া যাবে?

মারিয়ানার দিকে তাকিয়ে কেটি বললেন তুমি কী নেবে?

–আমি এখন কিছুই নেব না।

অন্যান্য অতিথিরা এসে গেছেন। টনি সকলের সঙ্গে কথা বলছে। তাকেই আজ গৃহকর্তার ভূমিকাতে অভিনয় করতে হচ্ছে।

বিরাট ডাইনিং রুম, কেটি মারিয়ানা হকম্যানকে এক সুপ্রীম কোর্ট জাস্টিসের পাশে বসিয়ে দিলেন। তার পাশে এক সেনেটর বসে আছেন। টনির সামনে লুসিকে বসানো হল। সকলেই এসে গেছেন। বিবাহিত এবং অবিবাহিতরা, সকলেই লুসির দিকে তাকিয়ে আছে। কেটি লুসি এবং টনির কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করছেন। বোঝা যাচ্ছে, টনি

হয়তো ধীরে ধীরে লুসির প্রতি আকর্ষিত হয়ে উঠছে। এভাবেই একটা সুন্দর গল্প শুরু হতে পারে।

পরের দিন সকালবেলা, শনিবার, ব্রেকফাস্টের আসর।

চার্লি কেটির কাছে জানতে চাইলেন মিসেস ব্ল্যাকওয়েল, আপনার প্রমোদ তরণীতে একবার ভ্রমণ করলে কেমন হয়? এটা কত বড়ো?

কেটি তার ছেলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন টনি? এটা কতটা হবে?

টনি শান্তভাবে বলল–আশি ফুট।

টেকসাসে আমরা এ ধরনের সুযোগ পাই না। একবার কি ভ্রমণ করা যেতে পারে?

চার্লির মুখে উদ্ভাসিত হাসি।

কেটি হেসে বললেন –ঠিক আছে। আমরা আগামীকাল ওই ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে পারি।

টনি দুজনের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে কিছুই বলল না। তার মনে হচ্ছে চার্লি বোধহয় এক চালাক ব্যবসাদার। তিনি কেটি ব্ল্যাকওয়েলের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক স্থাপন করতে চলেছেন। কেটি, টনি এবং লুসির দিকে তাকিয়ে বললেন তোমরা দুজন একটা ক্যাপবোটে ঘুরে এসো না।

টনি কিছু বলার আগেই লুসি বলল হ্যাঁ, যাব।

টনি শান্তভাবে বলল –আমি দুঃখিত। একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে আমার।

মায়ের চোখে অবিশ্বাস এবং সন্দেহ।

কেটি মারিয়ানার দিকে তাকিয়ে বলল–তোমার বাবা কোথায়?

-বাবা তো সকালে উঠে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছে।

–তুমি ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসো? আমার একটা সুন্দর ঘোড়াশালা আছে।

–ধন্যবাদ, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল, আমি একটু ঘুরে দেখব কি?

-হ্যাঁ, দেখতে পারো। কেটি টনির দিকে তাকিয়ে বললেন –কী? তুমি কি লুসিকে নিয়ে বেরোবে না?

–হ্যাঁ, আজ আমি একটু ব্যস্ত আছি।

ছোট্ট একটা বিজয়, কেটি হাসলেন, অথবা টনি?

ব্রেকফাস্ট শেষ হয়ে গেছে। কেটি বললেন তোমার ফোনগুলো ধরার আগে তুমি লুসিকে নিয়ে বাগান থেকে ঘুরে এসো।

এবার টনি আর বাধা দিতে পারল না। কেটি চার্লির দিকে তাকিয়ে বললেন –আপনি কি পুরোনো বই পড়তে ভালোবাসেন? আমার লাইব্রেরিতে অনেক পুরোনো বই আছে।

টেকসাস ভদ্রলোক হেসে বললেন –আপনি যা দেখাবেন তাতেই আমি খুশি হব।

কেটি মারিয়ানার দিকে তাকিয়ে বললেন –তুমি কি ঠিক আছে?

–মিসেস ব্ল্যাকওয়েল, আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না।

টনি এবং লুসি বেশ কিছুক্ষণ বাগানে ঘুরে বেড়াল। এখানে অনেক ফুল ফুটেছে। রঙের খুন-খারাপি উৎসব। মনে হয় একটুকরো স্বর্গ বুঝি নেমে এসেছে।

***

বিরাট লাইব্রেরি, কেটি সব কিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন। অলিভার গোল্ডস্মিথ, টবিয়ার স্মল জন ডন, সকলের বই আছে। ভদ্রলোক দেখে অবাক হয়ে গেছেন। উনি বুঝতে পারছেন, কেটি শুধু অর্থ উপার্জনের জন্যই সময় কাটান না। এসব কাজেও অনেকটা সময় দিতে হয় তাকে।

***

টনি তখন তার প্রাইভেট স্টাডিতে বসে আছে, হলওয়েের পাশে একটা ছোট্ট ঘর। আর্মচেয়ারে বসেছিল সে, দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল। মারিয়ানা ঢুকে পড়েছে।

মারিয়ানা দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলোর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। সে বিশ্বাস করতে পারছে না, এত সুন্দর ছবি এখানে থাকতে পারে। যখন সে জানতে পারল, টনি এই ছবিগুলো এঁকেছে, তখন তার উচ্ছ্বাস হল আকাশ ছোঁয়া।

টনি ভাবছে, এই দুটি মেয়ের মধ্যে কে আমার কাছাকাছি আসতে পারে? লুসি কি আমাকে জয় করার চেষ্টা করছে? কিন্তু তাহলে সে সময় নষ্ট করবে। টনি প্রেমে আঘাত পেয়েছে। মা এবং ডোমিনিকের চক্রান্তের শিকার হয়েছে। এখন সে মেয়েদের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে ভালোবাসে।

***

রবিবার সকালবেলা, টনি সাঁতার কাটতে গেছে। মারিয়ানা জলের ভেতর ছিল, একটা ছোট্ট বিকিনি করে। অসাধারণ দেহ সৌন্দর্য তার লম্বা এবং মেদবর্জিত। আভিজাত্যের ছাপ আছে। টনি জলের ভেতর ওই জলপরিকে দেখে অবাক হয়ে গেল। সুন্দর ছন্দে মেয়েটি সাঁতার কাটছে। সাঁতার কাটতে কাটতে মারিয়ানা টনির দিকে এগিয়ে এসে বলল সুপ্রভাত।

টনি বলল-সুপ্রভাত।

মারিয়ানা বলল–আমি সবরকম খেলা খেলতে ভালোবাসি। বাবার কাছ থেকেই এই স্বভাবটা পেয়েছি।

টনি একটা তোয়ালে ছুঁড়ে দিল। মারিয়ানা শরীর মুছছে।

টনি জিজ্ঞাসা করল–ব্রেকফাস্ট শেষ হয়েছে?

-না, এত তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট হয় না আমাদের।

এটা তো একটা হোলে, সব সময় খাবার পাওয়া যাবে।

টনি জানতে চাইল তুমি থাকো কোথায়?

বেশির ভাগ সময় মিউনিখে থাকি। শহরের বাইরে একটা দুর্গের ভেতর।

–তুমি কীভাবে বেড়ে উঠেছ?

মারিয়ানা বলল এটা একটা লম্বা গল্প, যুদ্ধের সময় আমাকে সুইজারল্যান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর আমি অক্সফোর্ডে যাই। সরবোনে পড়াশুনা করি। লন্ডনে ছিলাম কয়েক বছর। টনির চোখে চোখ রেখে বলল, এবার তোমার কথা বলল।

নিউইয়র্ক, ইউরোপ, সুইজারল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, কয়েক বছর দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর, যুদ্ধের সময়। প্যারিস

টনি এবার কিছু বলার চেষ্টা করল। কিন্তু গল্প শেষ হয়ে গেছে।

-তুমি ছবি আঁকা ছেড়ে দিলে কেন?

মারিয়ানার এই প্রশ্নে টনি থতমত –ও ব্যাপারটা ছেড়ে দাও। চলো, আমরা ব্রেকফাস্টের আসরে যাই।

***

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তারা নিশ্চুপ হয়ে খেয়ে চলেছে। মারিয়ানা কিছু বলার চেষ্টা করছে, টনি এখন শুনছে না।

শেষ পর্যন্ত টনি বলল–তুমি কখন জার্মানিতে ফিরে যাবে?

–আগামী সপ্তাহে। আমার বিয়ে হবে।

টনি অবাক হয়ে গেছে –আহা, কার সঙ্গে?

-সে একজন ডাক্তার। আমার অনেক দিনের সাথী।

টনি জিজ্ঞাসা করল নিউইয়র্কে আমার সঙ্গে ডিনার খাবে?

-হ্যাঁ, আমার ভালোই লাগবে।

***

লং আইল্যান্ডে একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্ট। সমুদ্রের ধারে, টনি মারিয়ানার মুখোমুখি বসে থাকতে চেয়েছিল। সে কেন জার্মানিতে ফিরে যাচ্ছে? আগামী সপ্তাহে। হ্যাঁ, তার তো বিয়ে হবে।

***

পরের পাঁচদিন ধরে টনি আর মারিয়ানা সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছে। টনি কানাডাতে যায়নি। কিন্তু কেন? সে জানে না। মারিয়ানা কি তাকে গ্রাস করেছে? তার হৃদয় হরণ করেছে?

মারিয়ানা এই প্রথম নিউইয়র্কে এসেছে, টনি তাকে সর্বত্র নিয়ে গেল। শেষ অব্দি? এসে গেল সেই ভয়ংকর দিনটি, সোমবার সকালে মারিয়ানা জার্মান দেশে চলে যাবে।

***

টনি হাউসটন থেকে চলে এল। মায়ের সঙ্গে সে কোম্পানির বিমানে যেতে পারত কিন্তু এই ব্যাপারটা সে এড়িয়ে চলতে ভালোবাসে। সে একা একা থাকতেই চায়।

একটা রোলস রয়েস দাঁড়িয়েছিল। হাউসটনের এয়ারপোর্টে। রোলস রয়েস ব্রাঞ্চের দিকে এগিয়ে চলল।

ড্রাইভার গল্প করছিল অনেকে সরাসরি ব্র্যাঞ্চে চলে যায়। ওই ভদ্রলোক মস্ত বড় ব্যবসাদার।

টনি ভাবল সবকিছু বাড়িয়ে বলা হয়েছে হয়তো। কিন্তু সত্যি সত্যি চার্লসের ব্যবসা দেখলে অবাক হতে হয়।

কেটি ইতিমধ্যে এসে গেছেন। তিনি এবং চার্লি টেরেসে বসে আছেন। সামনে একটা সুইমিং পুল, লেকের মতো আকারের। টনি প্রবেশ করল।

চার্লস তাকে দেখে উঠে এলেন, কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন।-টনি কেমন লাগল?

-অনেক ধন্যবাদ।

–তুমি আগের প্লেনটা ধরলে না কেন? মায়ের প্রশ্ন। লুসি তোমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

টনি জিজ্ঞাসা করল –কোথায় সে?

চার্লি টনির দিকে তাকিয়ে বললেন–দেখো, কাছাকাছি কোথাও পেয়ে যাবে। হয়তো বারবিকিউতে আছে।

–অনেক ধন্যবাদ।

লুসিকে পাওয়া গেল। সাদা শার্ট এবং টাইট জিনস পরেছে। টনি স্বীকার করতে বাধ্য হল, মেয়েটির মধ্যে গুণ ও সৌন্দর্য আছে।

সে বলল –টনি, আমি তোমাকে কখন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

টনি বলল –হ্যাঁ, একটা দরকারি কাজ ছিল। আসতে দেরী হয়ে গেল।

লুসি হাসল ঠিক আছে। তুমি আমার সঙ্গে সমস্ত সময়টা কাটাবে তো?

কেটি এবং চার্লি চোখে চোখ রেখে হাসলেন।

***

বারবিকিউটা অসাধারণ। টেকসাসের ক্ষেত্রেও একটা আলাদা প্রাপ্তি হতে পারে। দুশোজন ইতিমধ্যেই এসে গেছেন। সকলেই এসেছেন ব্যক্তিগত বিমানে। অথবা মার্সিডিজ কিংবা রোলস রয়েসে। দুটো ব্যান্ড নানা সুর বাজিয়ে চলেছে। বারটেন্ডাররা শ্যাম্পেন, হুইস্কি, সফট ড্রিঙ্কস এবং বিয়ার পরিবেশন করেই চলেছে। খাবারের গন্ধ বেরিয়ে আসছে, নানাধরনের খাবার।

সব কিছুই টনির সম্মানার্থে।

টনি এবং লুসি একপাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। কত কথা বোধহয় জমে আছে। আধঘন্টা কেটে গেছে। লুসি তখনও টনির সঙ্গে গল্প করছে। কিন্তু উনি ভাবছে, এই মেলামেশার অন্তরালে কী আছে?

***

এয়ারপোর্ট থেকে টনি মারিয়ানাকে ফোন করল। বলল–আমি তোমাকে দেখতে চাইছি।

এক মুহূর্তের চিন্তা–হ্যাঁ, আমারও ইচ্ছে করছে তোমাকে দেখতে।

টনি মারিয়ানাকে তার চিন্তার জগৎ থেকে বাইরে বের করতে পারছে না। অনেক দিন সে একলা থেকেছে। কিন্তু একাকীত্বের যন্ত্রণা তাকে গ্রাস করতে পারেনি। মারিয়ানা তার জীবনে আসার পর সে কেমন যেন হয়ে গেছে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, কিছু একটা নেই তার জীবনে।

মারিয়ানা টনির সাথে তার অ্যাপার্টমেন্টে দেখা করল। টনি তাকিয়ে থাকল অবাক চোখে। একটা অদ্ভুত তৃষ্ণা, একটা পিয়াস।

মারিয়ানা টনিকে জড়িয়ে ধরল। আবেগ আকাশ ছুঁয়েছে। হ্যাঁ, একটা অবরুদ্ধ ইচ্ছা, একটা প্রচণ্ড জাগ্রত শক্তি।

-মারিয়ানা, আমি তোমাকে বিয়ে করব।

–তুমি কি ঠিক বলছ টনি? একটা সমস্যা আছে।

–তোমার এনগেজমেন্ট?

–না, সেটা আমি ভেঙে দিয়েছি। কিন্তু তোমার মা?

–তার কিছু বলার থাকবে না।

–না, আমি জানি, তোমার মা চাইছেন, তুমি যেন লুসিকে বিয়ে করো।

—এটা মায়ের ষড়যন্ত্র, টনি মারিয়ানাকে আরও ভালোভাবে জড়িয়ে ধরে বলল, আমার পরিকল্পনা আমি সফল করবই।

-উনি আমাকে ঘেন্না করবেন টনি, আমি সেটা চাইছি না।

–আমি যা চাইছি, তোমাকে তা মানতে হবে।

আবার একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটতে চলেছে।

***

কেটি ব্ল্যাকওয়েল খবরটা জানতে পারলেন টনির কাছ থেকে। হ্যাঁ, তিনি একটু অবাক হয়ে গেছেন। কিন্তু কেন? বিয়েটা হয়ে গেছে, গতকাল, মধুচন্দ্রিমার আসর।

মা অবাক হয়ে গেছেন। এত সাহস? ব্রাড রজারস অফিসে এসে বলল আপনি আমায়। ডেকেছেন? তারপর কেটির মুখের দিকে তাকিয়ে ব্রাড বলল –এ কী? আপনার কী হয়েছে?

কেটি হেসে বললেন টনি কাজটা করে দিয়েছে, হপম্যানের সাম্রাজ্য এখন আমাদের হাতে।

ব্রাড রজারস চেয়ারে বসে পড়ল আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। মারিয়ানা হপম্যানকে বিয়ে করা কী করে সম্ভব হল?

কেটি বললেন আমি টনিকে ভুল পথে চালনা করেছিলাম বলতে পারো, এটা আমারই একটা ষড়যন্ত্র।

কিন্তু কেটি জানেন, মারিয়ানা টনিকে সত্যি ভালোবাসবে। হ্যাঁ, লুসির শরীরে একটা খুঁত আছে, লুসি কোনোদিন মা হতে পারবে না।

আর মারিয়ানা? মারিয়ানা টনিকে তার ঈঙ্গিত পুত্রসন্তান উপহার দেবে।

বিয়ের পর ছমাস

২১.

বিয়ের পর ছমাস কেটে গেছে। হপম্যান কোম্পানির সাথে ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেডের সংযুক্তিকরণ শেষ হয়েছে। ফ্রেডরিক হপম্যানের ওপর আরও বেশি কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। টনি অবাক হয়ে গেছে, শেষ পর্যন্ত মা এ বিয়েটা মানল কী করে?

প্রথম থেকেই বিয়েটা অসাধারণ সফলতার দিকে এগিয়ে চলেছে। মারিয়ানা এবং টনি – একে অন্যকে পাগলের মতো ভালোবাসছে।

যখন টনি ব্যবসার কাজে বাইরে যায়, মারিয়ানা তার সঙ্গে থাকে। তারা একসঙ্গে খেলা করে, একসঙ্গে আনন্দ করে, প্রতিটি মুহূর্তকে উপভোগ করার চেষ্টা করে। টনি ভাবে, আহা, জীবন এত সুন্দর!

টনি এবং মায়ের মধ্যে যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলছিল, মারিয়ানা সেটাও বন্ধ করে দিয়েছে। তাই সময়টা এখন তরতরিয়ে এগিয়ে চলেছে।

শেষ পর্যন্ত কেটি এবং মারিয়ানার মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে টেলিফোনে তারা অনেকবার কথা বলে। সপ্তাহে অন্তত একবার লাঞ্চের আসরে চলে যায়।

একবার মারিয়ানা একটু অসুস্থ হয়ে পড়ল। সে কেটিকে বলল –ডাবল হুইস্কি দিতে হবে।

মারিয়ানা কিন্তু শুধুমাত্র ওয়াইন ছাড়া আর কিছুই খায় না।

কেটি জানতে চাইলেন মারিয়ানা কী হয়েছে?

ডাক্তার হার্টলের সঙ্গে দেখা করে এলাম।

কেটির মনে আশঙ্কা–কেন?

-না, এমনি...।

মনে হল মারিয়ানা কিছু একটা বলতে চাইছে না।

কয়েকদিন আগেই ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল। কিন্তু কেন?

***

ডঃ হার্টলে বললেন মিসেস ব্ল্যাকওয়েল, তোমার বয়স কত?

–তেইশ।

–তোমার পরিবারের কারও হার্টের অসুখ আছে?

–না।

–ক্যানসার?

–না।

–তোমার মা বাবা বেঁচে আছেন?

–বাবা বেঁচে আছেন, মা মোটর অ্যাকসিডেন্টে মারা যান।

–তোমার কখনও মামস হয়েছে?

–না।

–হাম?

–হ্যাঁ, দশ বছর বয়সে।

–হুপিং কাশি?

–না।

–শরীরে কোনো কাটাছেঁড়া। টনসিল?

–তখন আমার নবছর বয়স।

–অন্য কোনো কারণের জন্য তোমায় কি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল?

–হ্যাঁ।

কবে?

-আমি তখন মেয়েদের হকি টিমে ছিলাম। একবার একটা খেলা খেলতে খেলতে আমি। চোখে অন্ধকার দেখি। হাসপাতালে গিয়ে আমার চোখ খুলে যায়, আমি সেখানে দুদিন ছিলাম।

–ওই খেলার সময় তোমার দেহে কোথাও আঘাত লেগেছিল?

–না, আমার চোখ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

–তখন তোমার কত বয়স?

–ষোলো।

জন হাটলে মারিয়ানার দিকে তাকিয়ে বললেন সকালে যখন ঘুম ভাঙে তখন কোথাও কি ব্যথা লাগে?

মারিয়ানা একটু ভেবে বলল –হ্যাঁ, ডানদিকে। কয়েকদিন ব্যথাটা থাকে।

-মাথা ব্যথা করে? চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়?

—হ্যাঁ, কিন্তু এখন সেই ঝামেলা চলে গেছে। ডঃ, হার্টলে আমার কি কিছু হয়েছে?

–আর কয়েকটা টেস্ট করতে হবে।

কী ধরনের টেস্ট?

–সেরিব্রাল অ্যানজিওস্কম, কিন্তু তুমি এমন কিছু ভেবো না।

তিনদিন কেটে গেছে। মারিয়ানা ডঃ হার্টলের কাছ থেকে একটা ফোন পেয়েছে। এখুনি তাকে ওখানে যেতে হবে।

ডঃ হার্টলে বললেন তোমার সমস্যা সমাধান হয়েছে।

–কিছু খারাপ?

-না, পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে তোমার একটা ছোট্ট স্ট্রোক হয়েছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা খুবই সাধারণ। বিশেষ করে অল্প বয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে। এর জন্য চিন্তা করার কিছু নেই।

মারিয়ানা অবাক হয়ে গেছে। তার মানে? এটা কি আবার হতে পারে?

-না, তুমি এখন স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে।

–আমি আর টনি মাঝে মধ্যে ঘোড়ায় চড়ি। টেনিস খেলি। তা হবে তো?

-হ্যাঁ, বেশি কিছু করার চেষ্টা করো না? টেনিস খেলা থেকে যৌনতার আসরে চলে যেও। কোনো সমস্যা নেই।

মারিয়ানা উঠে দাঁড়াল। জন হার্টলে বললেন মিসেস ব্ল্যাকওয়েল, যদি সন্তানের মা হবার কথা ভেবে থাকো, কোনো ছেলেকে দত্তক নিলেই ভালো হয়।

মারিয়ানা অবাক হয়ে গেছে –এই যে আপনি বললেন, আমি পুরোপুরি স্বাভাবিক।

-হ্যাঁ, কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আছে। গর্ভাবস্থা হলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা হতে পারে, কারণ গর্ভকালীন শেষ ছ থেকে আট সপ্তাহ খুব ভয়ংকর। তখন ব্লাডপ্রেশারের চাপ বেড়ে যায়।

মারিয়ানা আর কথা বলতে পারছে না। টনির শব্দ তার কানে ভাসছে তোমার কোলে আমি একটা সন্তান উপহার দেব, মারিয়ানা তোমার মতো সুন্দর এক জলপরি।

মারিয়ানা কেটিকে বলল আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি ডাক্তারের চেম্বার-থেকে সোজা আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

কেটি জানেন তাকে এখন এই যন্ত্রণাটা কীভাবে সহ্য করতে হবে।

তিনি বললেন ঠিক আছে আমি দেখছি, অত চিন্তা করার কিছু নেই।

–কেটি, টনি এবং আমি সন্তানের জন্য পাগল হয়ে উঠেছি।

-মারিয়ানা, ডঃ হার্টলের কথা মনে রাখতে হবে। কয়েক বছর আগে তোমার একটা ছোট্ট সমস্যা হয়েছে। অত ভাবছ কেন?

শেষ পর্যন্ত কেটি বললেন টনিকে এই খবরটা দিও না কিন্তু।

কেটি মনে মনে ভাবলেন, ডঃ জন হার্টলেকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। যাতে এই খবরটা টনির কানে কোনো মতেই না পৌঁছোয়।

***

তিনমাস কেটে গেছে। মারিয়ানা এখন গর্ভবর্তী, টনির মনে আকাশ ছোঁয়া আনন্দ। ডঃ জন হার্টলে অবাক হয়ে গেছেন।

তিনি মারিয়ানাকে বললেন আমি এখনই গর্ভপাতের ব্যবস্থা করছি।

-না, ডঃ হার্টলি, সন্তানটা আমার চাই।

মারিয়ানা কেটিকে গিয়ে সব কথা খুলে বলল, কেটি জন হার্টলের অফিসে গিয়ে বললেন–আমার পুত্রবধূকে অ্যাবরশনের কথা কেন বলেছেন?

–কেটি, আমার মনে হচ্ছে, এই ছেলেটার জন্ম দিলে ও হয়তো বেঁচে থাকবে না।

–না, আপনি কিছু জানেন না, এভাবে ওকে ভয় দেখাবেন না।

***

আটমাস পরবর্তী ঘটনা, ফেব্রুয়ারির সকাল চারটে, মারিয়ানার প্রসব যন্ত্রণা উঠেছে, তার আর্তনাদ টনিকে ভাবিয়ে তুলেছে।

টনি বলল– চিন্তা করো না ডার্লিং, আমি এখনই তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাব।

মারিয়ানা ভাবল, ডঃ হার্টলের কথাটা হয়তো টনিকে বলা উচিত ছিল।

মারিয়ানা এবং টনি হাসপাতালে পৌঁছে গেল। সব কাজই অত্যন্ত দ্রুত করা হচ্ছে। টনি ওয়েটিং রুমে বসে আছে। মারিয়ানাকে পরীক্ষার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল।

এখনই অপারেশন করতে হবে।

***

হাসপাতাল করিডরে সিজারের মেশিন। একটা শব্দ শোনা গেল। আরে এই তো লেমান!

টনি তাকাল, হ্যাঁ, এই ভদ্রলোককে সে ডোমিনিকের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ দেখেছিল। এর নাম হচ্ছে বেন। সেই লোকটনির দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। হিংসা অথবা প্রতিহিংসা? ডোমিনিক কিছু বলেছে?

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

একটু বাদেই ডোমিনিক সেখানে এসে হাজির হল। ডোমিনিক বেনকে বলল মেয়েটি এখন ইনটেনসিভ কেয়ারে আছে। সে টনিকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

টনি, তুমি এখানে কী করছ?

–আমার স্ত্রী সন্তান প্রসব করছে।

–তোমার মা কী ব্যবস্থা করেছে? বেন জানতে চাইল।

–তুমি কী বলতে চাইছ?

ডোমিনিক আমাকে সব কিছু বলেছে তুমি তো মায়ের হাতের খোকা।

-বেন, আর কথা বলো না।

–কেন সত্যিটা বললে রাগ করো নাকি?

টনি ডোমিনিকের দিকে তাকিয়ে বলল –এ কী বলছে?

–কিছুই না। বেন, চলল, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

বেন কিন্তু ব্যাপারটায় মজা পাচ্ছিল দুধ খাওয়া খোকা? তুমি সুন্দরী মডেলদের সাথে শোবে? তোমার মা তোমার জন্য কী নিয়ে আসবে। তুমি প্যারিসে ছবির প্রদর্শনী করবে, তোমার মা ব্যবস্থা করবে।

সীমা ছাড়িয়ে যেও না বেন।

–আমি ছাড়াচ্ছি কি? ও কী জানে?

টনি জিজ্ঞাসা করল–আমার মা প্যারিসে এগজিবিশনের ব্যবস্থা করেছিল, সত্যি?

ডোমিনিক বলল–আমি এ ব্যাপারে কিছু জানি না।

–তার মানে? তোমরা জর্জকে টাকা দিয়েছিলে আমার ছবির প্রদর্শনের জন্য?

–টনি, জর্জ তোমার ছবিগুলো সত্যিই ভালোবাসতেন।

–ওই আর্টফিটিং এর কথাটা বলবে নাকি?

–অনেক হয়েছে বেন। ডোমিনিক যাবার চেষ্টা করছিল।

টনি তার হাতে হাত রেখে বলল–হ্যাঁ, কী হয়েছে বলো? মা কি ওনাকেও টাকা দিয়েছিল?

-হ্যাঁ, ডোমিনিকের শব্দ এবার কমে গেছে। ফিসফিসানি কণ্ঠস্বর।

কিন্তু উনি যে আমার ছবিগুলোকে ঘেন্না করলেন?

-না টনি, উনি তোমার ছবিগুলোকে কখনওই খারাপ বলেননি। উনি তোমার মাকে বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে তুমি এক মস্ত বড় আর্টিস্ট হবে।

অবিশ্বাস্য। আমার মা ভদ্রলোককে পয়সা দিয়েছিলেন আমাকে ধ্বংস করার জন্য।

-না, তোমাকে ধ্বংস করার জন্য নয়, ওনার মতে ছবি এঁকে কেউ বড়ো হতে পারে না।

পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেছে। তার মানে? আমি আমার নিজের জীবনের পথে চলতে পারব না।

তখন অপারেটিং রুমে ডাক্তাররা মারিয়ানার জীবনকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। রক্তচাপ খুব নেমে গেছে। হৃৎস্পন্দন অনিয়মিত। তাকে অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে। রক্ত সংবহন চলেছে। কিন্তু কোনো কিছুই কাজ করছে না। সেরিব্রাল হেমারেজ শুরু হয়ে গেছে।

দুটো যমজ কন্যার জন্ম হয়েছে।

***

ডাক্তার ম্যাটসান টনির কাছে খবরটা দিলেন।–আপনি আনন্দ করুন। দুটি কন্যার জনক হয়েছেন।

টনি জিজ্ঞাসা করল–মারিয়ানা? সে ভালো আছে?

ডাক্তার ম্যাটসান বললেন না, আমরা দুঃখিত। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে...

-কী হয়েছে? একটা আর্তনাদ। না, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। ও মরে যেতে পারে না।

মি. ব্ল্যাকওয়েল, মারিয়ানা মারা গেছে।

–ও কোথায়? আমি ওকে দেখব।

–এখন যেতে পারবেন না।

–তোমরা ...তোমরা আমার বউকে মেরে ফেলেছ। তোমরা ওকে হত্যা করেছ।

টনি ডাক্তারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করল। দু জন ছুটে এসে টনিকে সরিয়ে নিল।

–মি. ব্ল্যাকওয়েল, ব্যাপারটা ভালোভাবে গ্রহণ করার চেষ্টা করুন।

টনি উন্মাদের মতো চিৎকার করে বলছে আমি আমার বউকে দেখব।

ডঃ জন হার্টলে এসে গেছেন ওকে যেতে দাও। আমাদের একা থাকতে দাও।

ডঃ ম্যাটসান এবং অন্যান্যরা চলে গেলেন। টনি বাচ্চা ছেলের মতো কান্নাকাটি করছে।

–জন, ওরা মারিয়ানাকে মেরে ফেলেছে।

–হ্যাঁ, টনি, আমি দুঃখিত। কেউ তাকে মারেনি। কয়েক মাস আগে আমি বলেছিলাম, মারিয়ানার পক্ষে মা হওয়া সম্ভব নয়।

অনেকক্ষণ বাদে টনি বলল আপনি কী বলছেন?

–মারিয়ানা তোমাকে বলেনি? তোমার মা কিছু বলেনি?

টনি আবার তাকাল আমার মা?

-হ্যাঁ, উনি ভেবেছিলেন। আমি বোধহয় মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছি। উনি মারিয়ানাকে অভয় দিয়েছিলেন। আমি দুঃখিত টনি, আমি বাচ্চা দুটোকে দেখেছি, ভারী সুন্দর।

টনি সেখান থেকে চলে গেল।

***

কেটির বাটলার দরজাটা খুলে দিল, টনির জন্য।

–গুড মর্নিং, মি. ব্ল্যাকওয়েল।

–গুড মর্নিং, লেস্টার।

বাটলার টনির দিকে তাকিয়ে আছে সব কিছু ঠিক আছে তো স্যার?

টনি কী বলবে বুঝতে পারছে না। তারপর বলল এক কাপ কফি হবে লেস্টার?

টনি দেখল বাটলার কিচেনের দিকে চলে গেল।

হা, টনি ট্রফি রুমে ঢুকে পড়েছে। সে ক্যাবিনেটের কাছে গেল। সেখানে অনেকগুলো বন্দুক সাজানো আছে। সে তাকিয়ে থাকল। ক্যাবিনেটটা খোলো, কে যেন বলল।

সে ক্যাবিনেটটা খুলল। একটা রিভলবার বের করল। ব্যারল দেখে নিল। হ্যাঁ, লোড করা আছে।

ওপরে চলে যাও, টনি!

টনি সিঁড়িতে পা ফেলে ফেলে ওপরের দিকে যাচ্ছে। সে জানে, এটা হয়তো তার মায়ের কুফল। কিন্তু, এখনই শেষ করতে হবে। কেটি তার জীবনে এমনভাবে বাধার সৃষ্টি করবে, না, এই ঘটনাটা ঘটলে কোম্পানিটা মরে যাবে।

টনি কেটির বেডরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

কে যেন তাকে বলছে এখনই দরজাটা খুলতে হবে।

টনি দরজাটা খুলল–কেটি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

–টনি কী হয়েছে?

টনি সাবধানে রিভলবারটা তুলে ধরল। তারপর ট্রিগারে হাত দিল।

.

২২.

বাইশ যমজ মেয়ে দুটিকে দেখে সকলেই অবাক হয়ে গেছে। আহা, এমন সুন্দর চেহারা। ডাক্তাররা তাদের দিকে তাকিয়ে আছেন অবাক চোখে।

গত কয়েক দিন খুব খারাপ অবস্থায় কেটে গেছে। জন হার্টলে এই দিনগুলোর কথা কখনওই ভুলতে পারবেন না। যখন তিনি কেটি ব্ল্যাকওয়েলের বেডরুমে পৌঁছোলেন, চারপাশ থমথম করছে। বাটলারের কাছ থেকে একটা ফোন পেয়েছেন। কেটি মেঝের ওপর শুয়ে আছেন। কোমা অবস্থায় চলে গেছেন। দুটো বুলেটের চিহ্ন। রক্ত ছুটে আসছে। টনি ক্লোসেটের দিকে তাকিয়ে আছে। মায়ের জামাকাপড়গুলো কাঁচি দিয়ে কেটে দিচ্ছে।

ডাঃ হার্টলে কেটির দিকে তাকালেন, অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করলেন। পালস বোঝার চেষ্টা করলেন। খুবই দুর্বল, মুখটা নীল হয়ে গেছে। ইনজেকশন দেওয়া হল।

ডঃ হার্টলি জিজ্ঞাসা করলেন–কী হয়েছে?

বাটলার বলল–আমি কিছুই জানি না স্যার। মি. ব্ল্যাকওয়েল আমাকে বললেন, কফি তৈরি করতে। আমি কিচেনে ছিলাম। বুলেটের শব্দ পেয়ে ছুটে এলাম। দেখি মিসেস ব্ল্যাকওয়েল মেঝেতে পড়ে আছেন। মি. ব্ল্যাকওয়েল বলছেন, মা, তোমাকে আর কষ্ট দেব না। আমি তোমাকে মেরে ফেলতে চাই। তারপর উনি ক্লোসেটের কাছে গিয়ে পোশাকগুলো ছিঁড়তে শুরু করেছেন।

-টনি, তুমি কী করছ?

–আমি মাকে সাহায্য করছি। আমি কোম্পানিটা ধ্বংস করব। মারিয়ানাকে ওরা মেরে ফেলেছে, আপনি সবই জানেন।

কেটিকে এমারজেন্সি ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হল। তাকে রক্ত দেওয়া হল। বুলেট বের করা হল।

তিনজন নার্স টনিকে একটা অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিয়েছে। ডাঃ হার্টলি টনিকে ইনজেকশন দিলেন। টনি শান্ত হল। অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ডঃ হার্টলির ফোন পেয়ে ব্রাড রজারস ছুটে এসেছে।

ডঃ হার্টলে কেটির সঙ্গে কথা বলতে গেছেন

জ্ঞান ফিরে পেয়ে কেটি প্রথমেই বললেন আমার ছেলে কোথায়?

–কেটি, চিন্তা করবেন না। তার দায়িত্ব আমরা নেব।

টনিকে একটা প্রাইভেট স্যানিটোরিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

–জন, সে আমাকে মারতে চাইছে কেন?

–মারিয়ানার মৃত্যুর জন্য সে আপনাকে দায়ী করেছে।

–এটা পাগলামি।

জন, হার্টলে কোনো কথা বললেন না।

ডঃ হার্টলে চলে যাবার পর কেটি অনেকক্ষণ শুয়ে ছিলেন এই শব্দগুলো বিশ্বাস করতে পারছেন না। তিনি মারিয়ানাকে খুবই ভালোবাসেন। কারণ মারিয়ানা টনিকে সুখী করেছে। টনি, আমি তোমার জন্য সব কিছু করেছি। আর তুমি কিনা আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করলে। হ্যাঁ, আমি তো মরতে চাই না। কিন্তু? আমি বাঁচব কী করে!

শেষ পর্যন্ত কেটি ভাবলেন, এটা আমাকে সহ্য করতেই হবে। আমি আবার উঠে দাঁড়াব, কোম্পানি আবার নতুন জীবন ফিরে পাবে।

.

পঞ্চম খণ্ড

ইভ ও আলেকজান্দ্রা

১৯৫০-১৯৭৫

২৩.

ডাকহারবারের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ কেটিকে ধীরে ধীরে সারিয়ে তুলল।

টনিকে এখন একটা ব্যক্তিগত অ্যাসাইলামে রাখা হয়েছে। সেখানে তাকে নানাভাবে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। কেটি প্যারিস থেকে মনোবিশারদদের উড়িয়ে নিয়ে এসেছেন। ভিয়েনা এবং বার্লিন থেকেও অনেককে আনা হয়েছে। তারা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ করেছেন, এখন চলেছে নিরাময়ের পালা।

.

ফ্রেডরিক হপম্যান তার দুই নাতনিকে নিয়ে খুবই খুশি। তিনি বললেন- আমি মেয়ে দুটিকে আমার সঙ্গে জার্মানিতে নিয়ে যাব।

মারিয়ানার মৃত্যুর খবর তার বয়স অন্তত কুড়ি বছর বাড়িয়ে দিয়েছে, কেটির মনে হল। ভদ্রলোককে দেখলে কেটির মন কেঁপে ওঠে। না, টনির শিশুকন্যাদের তিনি কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না।

তিনি বললেন- ফ্রেডরিক, একজন মহিলা ছাড়া এদের দেখাশুনো করবে? মারিয়ানা নিশ্চয়ই চেয়েছিল, এই মেয়ে দুটি এখানেই বড়ো হোক। আপনি ইচ্ছে মতো এসে ওদের সাথে দেখা করে যাবেন।

শেষ পর্যন্ত ফ্রেডরিক এই মতটা মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

***

কেটির বাড়িতে যমজ কন্যাদের নিয়ে আসা হল। তাদের জন্য একটা সুন্দর নার্সারি অ্যাপার্টমেন্টের ব্যবস্থা করা হল। এক তরুণী ফরাসি ভদ্রমহিলাকে রাখা হল গর্ভনেস হিসেবে। মেয়েটির নাম সোলঞ্জ ডুনাস।

আগে যে মেয়েটির জন্ম হয়েছিল তার নাম রাখা হল ইভ, পরেরটির নাম দেওয়া হল আলেকজান্দ্রা। তাদের দেখতে একেবারে একরকম। আলাদা করার সামান্যতম উপায় নেই।

কেটি এখন অনেকটা সময় নাতনিদের মধ্যে কাটাতে ভালোবাসেন। আবার স্বপ্ন দেখা শুরু করেছেন তিনি। একদিন ব্যবসার জগৎ থেকে স্বেচ্ছা অবসর নেবেন। তখন এই দুই কন্যার হাতেই বিরাট সাম্রাজ্যের ভার অর্পণ করতে হবে।

***

যমজ কন্যার প্রথম জন্মদিন। কেটি একটা সুন্দর পার্টি দিয়েছিলেন। একই রকম দেখতে দুটো বার্থডে কেক আনা হল। বন্ধুরা অনেক উপহার এনেছেন। এবার দ্বিতীয় জন্মদিন এসে গেল। কেটি বুঝতেই পারছেন না, কী দ্রুত সময় কেটে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে মেয়ে দুটির বয়স হল পাঁচ বছর।

ইভ তার বোনকে হত্যা করার চেষ্টা করল। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। সব ব্যাপারে ইভ দিদিগিরি ফলাবার চেষ্টা করে।

প্রথম থেকেই আলেকজান্দ্রাকে সে যথেষ্ট ঘেন্না করে। পৃথিবীর সব সুখ সে তার মুঠো বন্ধ করবে, এমন একটা অদম্য বাসনা জেগেছে তার মনের মধ্যে। কিন্তু কেন? রাতের বেলা সোলাঞ্জ দুই কন্যকে যথেষ্ট দেখাশোনা করে। দুজন চিৎকার করে প্রার্থনা করে। এবার ইভ চোখ বন্ধ করে কিছু বলার চেষ্টা করে। তার মনে একটাই বাসনা, ঈশ্বর যেন আলেকজান্দ্রাকে মেরে ফেলে। শেষ অব্দি ইভের এই ইচ্ছেটা ঈশ্বর পূরণ করলেন না। ইভ চিন্তা করল সে, আলেকজান্দ্রাকে মেরে ফেলবে।

কদিন বাদেই পাঁচ বছরের শুভ জন্মদিনের অনুষ্ঠান হবে। ইভ কিছুতেই আলেকজান্দ্রার সাথে আর একটা আলো ঝলমল পার্টিতে উপস্থিত হতে পারবে না। হ্যাঁ, সমস্ত উপহার আমার। বন্ধুবান্ধবরা শুধু আমার সঙ্গেই গল্প করবে।

***

আগামী কাল জন্মদিন। ইভ বিছানাতে শুয়ে আছে, জেগে আছে। বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। সে আলেকজান্দ্রার কাছে চলে গেল।

সে বলল- আলেক্স, চল আমরা কিচেনে যাব। জন্মদিনের কেকগুলো দেখব।

আলেকজান্দ্রার চোখে ঘুম– সকলে ঘুমিয়ে আছে।

–আমরা কারও ঘুম ভাঙাব না।

–ডুনাস জেগে উঠলে রাগ করবে। সকালেই তো কেকগুলো দেখব।

না, আমি এখন সেগুলো দেখব। তুই কি আমার সঙ্গে আসবি, নাকি আসবি না?

আলেকজান্দ্রা চোখ রগড়ে ঘুম তাড়িয়ে নিল। এখন জন্মদিনের কেক দেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তার নেই। কিন্তু দিদির ডাক সে না শুনে থাকবে কী করে?

সে বলল– আমি আসছি।

আলেকজান্দ্রা বিছানা থেকে নামল। চটি পরল। দুজনেরই পরনে গোলাপি নাইলনের নাইট গাউন।

ইভ বলল– কোনো শব্দ করবি না।

তারা বেডরুমের সামনে চলে এল। লম্বা করিডর পার হল। পাশেই ডুনাসের বেডরুম। ধীরে ধীরে সিঁড়িতে গিয়ে পা রাখল। বিরাট কিচেন। দুটো বড়ো বড়ো গ্যাস স্টোভ। ছটা ওভেন। তিনটে রেফ্রিজারেটর। আর একটা চলমান ফ্রিজার।

রেফ্রিজারেটরের মধ্যে ইভ জন্মদিনের কেকগুলো দেখতে পেল। একটাতে লেখা আছে শুভ জন্মদিন আলেকজান্দ্রা, আর একটাতে লেখা আছে শুভ জন্মদিন ইভ।

আগামী বছর থেকে এখানে একটা মাত্র কেক থাকবে।

ইভ আলেকজান্দ্রার কেকটা রেফ্রিজারেটর থেকে বার করল। সেটাকে টেবিলের ওপর রেখে মোমবাতিগুলো জ্বালিয়ে দিল। তারপর বলল- আমি দেখব মোমের আলোয় কেকটা কেমন দেখায়।

না-না, এটা কখনও করিস না। কেকটা নষ্ট হয়ে যাবে। মিসেস টাইলার রাগ করবে।

-না, উনি কিছু মনে করবেন না। ইভ আর একটা ড্রয়ার খুলল। এবার দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালতে হবে।

–আমি বিছানায় চলে যাচ্ছি।

–ঠিক আছে যা, আমি একাই পারব।

–আমায় কী করতে হবে?

–তুই মোমবাতিগুলো জ্বেলে দে।

আলেকজান্দ্রা ভয় পেয়েছে– আগুন লাগতে পারে। বারবার ওদের বলা হয়েছে, কখনওই দেশলাই কাঠি নিয়ে না খেলতে। তারা জানে, যেসব ছেলেমেয়েরা এই আদেশ না মানে, তাদের কী হয়। কিন্তু আলেকজান্দ্রাকে এ কাজ করতেই হবে। ইভ তাকিয়ে থাকল, তুই এদিকটা জ্বালা।

আলেকজান্দ্রা মোমের ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল, ইভের দিকে পেছন ফেরা। হঠাৎ ইভ একটা দেশলাই জ্বালিয়ে দিল। একটা কাঠি সে হাতের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল। আগুন জ্বলে উঠল। ইভ আগুনের টুকরোটা আলেকজান্দ্রার পায়ে ফেলে দিল। আলেকজান্দ্রা বুঝতে পারল, কী ঘটতে চলেছে। সে চিৎকার করল- হেল্প! হেল্প!

ইভ তাকিয়ে আছে জ্বলন্ত নাইট গাউনের দিকে। হ্যাঁ, জিতে গেছে সে, আলেকজান্দ্রার সমস্ত শরীরটা পুড়তে শুরু করেছে।

ইভ বলল- দাঁড়িয়ে থাক। আমি বালতি করে জল আনছি, সে প্যান্ট্রিতে চলে গেল। আনন্দে তার মন তখন আকাশ ছুঁয়েছে।

***

এক হরর ছবি আলেকজান্দ্রার জীবন বাঁচিয়ে দিল। ব্ল্যাকওয়েলের রাঁধুনির নাম মিসেস টাইলার। সে এক পুলিশ সার্জেন্টের রক্ষিতা। মাঝে মধ্যেই তার সঙ্গে শয্যা ভাগ করে। সেই রাতে সে একটা মোশন পিকচার দেখতে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সে তার প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি অব্দি এল।

এক ঘন্টা আগেই তারা পৌঁছে গেছে। টাইলার পেছন দিকের দরজাটা খুলে দিয়েছে। আলেকজান্দ্রার আর্তনাদ তার কানে প্রবেশ করল। টাইলার এবং সার্জেন্ট ডগারথি তাড়াতাড়ি কিচেনে ঢুকে পড়ল।

এ কী? সার্জেন্ট আলেকজান্দ্রাকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন। নাইট গাউনটাতে আগুন জ্বলে গেছে। হ্যাঁ, শরীরের অনেকটা পুড়ে গেছে। কিন্তু এখনও আগুন চুল স্পর্শ করতে পারেনি। আলেকজান্দ্রা অচেতন হয়ে মেঝের ওপর পড়ে আছে। টাইলার জল ঢেলে আগুন শিখা নিভিয়ে দিলেন। তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

সার্জেন্ট ডগারথি বললেন–এখনই একটা অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হবে। মিসেস ব্ল্যাকওয়েল কি বাড়িতে আছেন?

-হ্যাঁ, উনি ওপরে ঘুমোচ্ছন।

–ওনাকে এখনই ডাকতে হবে।

মিসেস টাইলার অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করল। প্যান্ট্রি থেকে বাটলারের চিৎকার ভেসে এল–ইভ কাঁদছে এবং তার হাতে জলের পাত্র।

–আলেকজান্দ্রা কি মরে গেছে? ইভ জানতে চাইল মরে গেছে?

মিসেস টাইলার ইভকে আদর করে বলল– না, সে ঠিক আছে। সে আবার ভালো হয়ে যাবে।

–এটা আমার ত্রুটি, ইভ কাঁদতে কাঁদতে বলল। সে আলো জ্বালাতে চেয়েছিল। আমি তাকে একাজ করতে কেন দিলাম?

***

আলেকজান্ড্রার শরীরটা ভালোভাবেই পুড়ে গেছে। ডঃ হার্টলে কেটিকে বলেছিলেন। হয়তো এ যাত্রায় ও বেঁচে যাবে। এখন পোড়ার যন্ত্রণা অনেক উপশম হয়ে যায়।

কেটি অবাক হলেন- কী করে ঘটনাটা ঘটল? তিনি ভাবলেন, ইভের দিকে আরও নজর দিতে হবে।

ইভের কিছু হয়েছে?

-না, এই মেয়েটা নিজেকে দোষারোপ করতে চাইছে। সে এখন থেকে দুঃস্বপ্ন দেখবে। কেন এই ঘটনা ঘটল বলুন তো? ইভ খুব আবেদনি।

ছোটো ছেলেমেয়েরা এমনই করে থাকে। কোনো সমস্যা হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। কেমন?

***

ইভ একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। জন্মদিনের অনুষ্ঠানটা বাতিল করে দেওয়া হল। ইভ ভাবল, আমি আরও একবার আলেকজান্ড্রার কাছে হেরে গেলাম।

আলেকজান্ড্রার ক্ষতচিহ্নগুলো মিলিয়ে গেল। হ্যাঁ, এখন আর কোথাও কোনো কলঙ্কের দাগ নেই। ইভের মন একটা অদ্ভুত আবেগে পরিপূর্ণ।

কেটি বললেন– চিন্তা করো না, এমন ঘটনা ঘটতেই পারে। এর জন্য নিজেকে দোষ দিয়ে কী লাভ?

না, ইভ নিজেকে দোষ দিচ্ছে না। মিসেস টাইলারকে সে দোষী করতে চাইছে। টাইলার কেন এসে সব ব্যাপারটা গোলমাল করে দিল।

***

এখানে নৈঃশব্দ্য এবং শান্তি বিরাজ করছে। টনির দিন কাটছে এক অদ্ভুত নীরবতার মধ্যে দিয়ে।

মাঝে মধ্যে কেটি সেখানে যান। সুপারের সাথে কথা বলেন। তিনি জানেন, টনি হয়তো আর কোনোদিন সুস্থ সবল জীবনে প্রবেশ করতে পারবে না।

.

২৪.

পরের দুবছর কেটে গেল ঘটনাবিহীনতার মধ্যে। আলেকজান্দ্রা ধীরে ধীরে কেটির হৃদয় হরণ করেছে। এই মেয়েটিকে আরও বেশি নিরাপত্তা দিতে হবে। গরমের ছুটিতে ইভ এবং আলেকজান্দ্রাকে নিয়ে যাওয়া হল বাহামাতে। আলেকজান্দ্রা জলে ডুবে মরতে বসেছিল, ইভও সাঁতার কাটছিল। শেষ অব্দি একজন মালী তাকে বাঁচিয়ে দেয়।

পরের বছর দুই বোন গিয়েছিল পিকনিকে। আলেকজান্ড্রা পাহাড়ের চূড়ো থেকে পড়ে যায়। কোনোরকমে একটা গাছের ডাল ধরে বেঁচে যায়।

কেটি ইভকে বললেন- বোনের ওপর নজর রাখতে পারিস না? এ কীরে? তুই তাহলে কেমন দিদি?

ইভ বলেছিল– ঠাম্মা, এবার থেকে বোনকে আমি আরও ভালোভাবে দেখব।

কেটি পাগলের মতো দুজনকে ভালোবাসেন। তাদের বয়স এখন সাত বছর। দুজনেই একই রকম হাসিখুশী পরির মতো সুন্দরী। মাথায় নরম সোনালী চুলের বন্যা। বালিকাসুলভ কোমল চেহারা। ম্যাকগ্রেগরের মতো চোখ পেয়েছে। একরকম দেখতে। কিন্তু ব্যক্তিত্বের দিক থেকে একেবারে আলাদা। আলেকজান্ড্রার কোমল লাবণ্য টনির কথা মনে করায়। ইভ যেন তারই এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি কেটি ভাবতে থাকেন।

রোলস রয়েসে করে ড্রাইভার তাদের স্কুলে নিয়ে যায়। আলেকজান্ড্রা এসব বড়োলোক মোটেই পছন্দ করে না। ইভ আবার এগুলো নিয়ে আনন্দ করতে ভালোবাসে। কেটি প্রত্যেক সপ্তাহে নাতনিদের হাতে যথেষ্ট টাকা তুলে দেন। কীভাবে তারা টাকা খরচ করছে, তার হিসাব রাখতে বলেন। ইভের পয়সা সব শেষ হয়ে যায়। আলেকজান্ড্রার কাছ থেকে সে ধার করে। সে হিসাবপত্রের খাতায় কারচুপি করে। ভাবে, ঠাম্মা কিছুই বুঝতে পারবে না। কেটি অবশ্য সবকিছু বুঝতে পারেন, কিছু বলতে চান না। সাত বছর বয়স, এখন থেকেই কেমন পাকা হিসাবরক্ষক হয়ে উঠেছে।

***

শুরু থেকেই কেটি একটা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসতেন। এই স্বপ্ন হল, টনি হয়তো একদিন সেরে উঠবে। সে ক্রুগার ব্রেন্টে চলে আসবে। সময় কেটে গেল, স্বপ্নটা ধূসর হয়ে যাচ্ছে।

***

১৯৬২- ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেড আরও বড়ো হয়েছে। নতুন নেতৃত্বের দরকার। কেটি তার সত্তরতম জন্মদিন পালন করলেন। চুলের রং সাদা হতে শুরু করেছে। এখনও চেহারাটা খুব আকর্ষণীয়। তিনি জানেন, সারা পৃথিবী তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে।

বারো বছর বয়স হয়েছে যমজ কন্যা দুটির। তারা এখন বালিকা থেকে কিশোরী হবার দিকে এগিয়ে চলেছে। কেটি আগের মতোই আরও বেশি সময় কাটাচ্ছেন দুই নাতনির সঙ্গে।

ইস্টারের সপ্তাহে তিনি তাদেরকে নিয়ে ডাকহারবারে গেলেন কোম্পানির নিজস্ব প্লেনে। মেয়ে দুটি সম্পত্তি দেখে অবাক হয়ে গেল। জোহানেসবার্গেও তারা হয়তো একদিন যাবে। কিন্তু ডাকহারবার তাদের খুব ভালো লেগেছে।

মেয়ে দুটিকে এখনও একই রকম দেখতে লাগে। কেটির মনে হয়, স্বভাবে এই পরিবর্তন না থাকলেই বোধহয় ভালো হত। বারান্দায় বসে মাঝে মধ্যে তিনি তার দুই নাতনির দিকে তাকিয়ে থাকেন। হ্যাঁ, ইভ শেষ পর্যন্ত নেত্রী হবে। আলেকজান্দ্রা তাকে

অনুসরণ করবে। ইভের মধ্যে একটা সহজাত প্রবৃত্তি আছে, আলেকজান্দ্রা নমনীয়। ইভ অ্যাথলেটের মতো কঠিন, আলেকজান্দ্রা এখনও মাঝে মধ্যেই দুর্ঘটনার মুখে পড়ে।

***

ইভকে একটা ভালো স্কুলে পাঠাতে হবে। কেটি অনেক ভাবনা-চিন্তা করলেন। সাউথ ক্যারোলিনার একটি স্কুলের কথা মনে পড়ল। কেটি হেডমিস্ট্রেসকে বলেছিলেন। আমার দুই নাতনি খুব ভালো। কিন্তু ইভ একটু বেশি চালাক। তাকে আমি এক অসাধারণ মেয়ে বলতে পারি। সে যেন সব সুযোগ সুবিধা পায়।

–আমাদের সব ছাত্রীরা একই রকম সুবিধা পায়, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। এবার ইভের বোনের কথা বলুন।

–আলেকজান্দ্রা ভীষণ ভালো মেয়ে, কেটি বললেন, আমি কিন্তু মাঝে মধ্যে আসব।

নতুন স্কুলে পড়াশুনা শুরু হল। ইভ অতি সহজেই নতুন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিল। কিন্তু আলেকজান্দ্রা তখনও তার মুখচোরা স্বভাবটা বজায় রেখেছে। কেটি শেষ পর্যন্ত ভাবলেন, এখানে সবকিছু তার মনের মতো চলবে। শুধু একটা সমস্যা থেকে যাচ্ছে। সে হল ওই আলেকজান্দ্রা।

***

সকালবেলা তারা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেড়াতে যায়। বেশির ভাগ মেয়েরাই জাম্পারের সুযোগ নিয়েছে। কেটি নাতনিদের বারোতম জন্মদিনে উপহার দিলেন। যে ভদ্রলোক ঘোড়ায় চড়া শিক্ষা দেন, তিনি হলেন জেরোমে ডেভিস। তিনি সব কিছু পর্যবেক্ষণ করেন। আহা, ইভের সোনালী চুল সকালের রোদে ভাসতে ভাসতে উড়ে চলেছে অসাধারণ একটা ছবি। মিস্টার ডেভিস ভাবলেন, কোনো কিছুই ইভকে স্তব্ধ করতে পারবে না।

টমি নামে আর একজন আলেকজান্দ্রাকে বিশেষ ভালোবাসেন। আলেকজান্দ্রা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেছে। এবার বাঁদিকে ফিরবে। আলেকজান্দ্রা এবং ইভ বিভিন্ন রঙের রিবন পরেছে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে।

এভাবেই তাদের ক্লাস এগিয়ে চলেছে।

একবার একটা দুঘর্টনা ঘটে গেল।

আলেকজান্দ্রার ঘোড়াটা হঠাৎ বুনো হয়ে উঠেছে। সে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। শেষ পর্যন্ত ডেভিস এসে আলেকজান্দ্রাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

স্কুলের দিনগুলো কেটে চলেছে। দেখা গেল, তারা খুবই খুশি। তবে আলেকজান্দ্রা এখনও মাঝে মধ্যে তার বাড়ির কথা চিন্তা করে।

***

কয়েক মাস কেটে গেছে, আর একটা অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে গেল। কয়েকটি মেয়ে মারুজিহানা খাচ্ছিল। ইভ এই নিষিদ্ধ ড্রাগ তাদের সরবরাহ করেছে। এই ঘটনাটা মানতে চাইল না। শেষ পর্যন্ত আলেকজান্দ্রার লকেটের ভেতর পুরিয়া পাওয়া গেল।

ইভ বলল- ও একাজ কখনও করতে পারে না। কেউ এটা পুরে দিয়েছে।

কেটিকে হেডমিস্ট্রেস ডেকে পাঠালেন। হ্যাঁ, তাকে একটু বলে দিতে হবে।

***

পঞ্চদশ জন্মদিন, কেটি দুই নাতনিকে নিয়ে সাউথ ক্যারোলিনাতে গেলেন। সেখানে একটা বিরাট পার্টি দেওয়া হল। ইভ অল্প বয়সী ছেলেদের দিকে চলতে শুরু করেছে। হ্যাঁ, ছেলেরাও তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করছে।

কিন্তু আলেকজান্দ্রা এসব মোটেই ভালোবাসে না। সে তার ঠাম্মাকে দুঃখ দিতে চায় না। তাই এই পার্টিতে যোগ দেয়। ইভ সাজতে ভালোবাসে, আলেকজান্দ্রা পড়াশুনার দিকে নজর দিতে চায়। ছবি আঁকাতে তার সহজাত প্রতিভা। ডাকহারবারে বাবার আঁকা ছবিগুলোর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আহা, বাবা কেন এখন অ্যাসাইলামে, মাঝে মধ্যে ভগবানকে প্রশ্ন করে।

আলেকজান্দ্রা জানে না, কোনোদিন বাবার সাথে তার দেখা হবে কিনা।

***

স্কুলে দ্বিতীয় বছর। ইভ গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে তার শরীরটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। সে কথা বলতে পারছে না। সকালের ক্লাসে আসতে পারছে না। মাঝে মধ্যেই মাথা ঘুরছে। শেষ পর্যন্ত তাকে ইনফারমারিতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। হেডমিস্ট্রেস সব কিছু পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন, ঘটনাটা সাংঘাতিক।

ডাক্তার বললেন- ইভ গর্ভবতী।

-এটা কী করে ঘটল?

একই রকম ভাবে।

-ও তো একেবারে বাচ্চা মেয়ে।

–হ্যাঁ, ও তো গর্ভধারণ করতে পারে।

ইভ কারও সঙ্গে কথা বলতে চাইল না। আমি কাউকে সমস্যায় ফেলব না।

তারপর? তুমি আমার কথা শোনো। আর বলো কী করে ঘটেছে?

ইভ বলল- আমাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। সে কেঁদে ফেলল।

হেডমিস্ট্রেস আরও আঘাত পেয়েছেন। তিনি ইভকে বললেন– কে এটা করেছে?

— মিস্টার পার্কিংসন।

—ইংরাজির শিক্ষক।

ইভ কেন এই ঘটনায় জড়িয়ে পড়ল? ভদ্রমহিলা বিশ্বাস করতে পারছেন না।

জোসেফ পার্কিংসন এক শান্ত স্বভাবের মানুষ। স্ত্রী এবং তিনটি ছেলেমেয়ে আছে তার। তিনি আট বছর ধরে এই স্কুলে পড়াচ্ছেন। কিন্তু ঘটনাটি সত্যি ঘটে গেছে? হেডমিস্ট্রেস তাকে ডেকে পাঠালেন। ইভ সত্যি কথাই বলেছে। তিনি হেডমিস্ট্রেসের মুখোমুখি বসলেন। তার সমস্ত মুখ থরথর করে কাঁপছে।

–আপনি নিশ্চয়ই জানেন কেন আপনাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে, মিঃ পার্কিংসন?

–হ্যাঁ, আমি জানি।

—এটা ইভের ব্যাপার।

–হ্যাঁ, আমি অনুমান করছি।

–ইভ বলেছে, আপনি তাকে ধর্ষণ করেছেন?

পার্কিংসন অবাক হয়ে তাকালেন– হায় ঈশ্বর, আমাকে ইচ্ছে করে প্রলুব্ধ করা হয়েছে।

তার মানে? আপনি কী বলছেন? মেয়েটি—

ওকে আর মেয়ে বলবেন না। ও একটা শয়তানি।

ঘাম মুছে ভদ্রলোক বললেন- সমস্ত সেমিস্টারে সে সামনের রো-তে এসে বসত। তার পোশাকের এখান সেখান খুলে রাখত ইচ্ছে করে। আমার দিকে এগিয়ে আসত। এমন কিছু প্রশ্ন করত, যার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। নিজেকে আরও ভালোভাবে উন্মুক্ত করত। আমি এ ব্যাপারগুলো উপেক্ষা করার চেষ্টা করেছিলাম। ছ-সপ্তাহ আগে সে আমার বাড়িতে এল। আমার মেয়ে এবং স্ত্রী বাড়িতে ছিল না। তারপর? আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারি নি।

ভদ্রলোক কেঁদে ফেললেন।

ইভকে অফিসে নিয়ে আসা হল। ইভের মনোভাব এখন অনেক শান্ত। সে পার্কিংসনের চোখের দিকে তাকাল। হ্যাঁ, ঘটনা ঘটে গেছে।

এবার পুলিশের চিফের সামনে দাঁড়াতে হল ইভকে।

–ইভ বলল, কী ঘটেছে?

ইভ শান্তভাবে বলল- মিঃ পার্কিংসন বলেছিলেন, তিনি আমার সাথে ইংরাজি পড়া নিয়ে আলোচনা করবেন। তিনি রোববার বিকেলবেলা আমাকে তার বাড়িতে ডেকেছিলেন। বাড়িতে তিনি একলা ছিলেন। তিনি বলেছিলেন বেডরুমে যেতে। আমি তাকে অনুসরণ করে দোতলায় চলে গেলাম। তিনি আমাকে বিছানাতে ফেলে বলাৎকার করলেন।

–এটা একটা মিথ্যে কথা। এটা ঘটে গেছে।

কেটিকে ডেকে পাঠানো হল। হ্যাঁ, পুরো ঘটনাটা তার সামনে বলা হল। ঠিক করা হল, এই ঘটনাটাকে চেপে দিতে হবে। মিঃ পার্কিংসনকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। এমন কী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তাকে ওই রাজ্য থেকে চলে যেতে হবে, এমন কথাও বলা হল।

কেটি আর একটা কাজ করলেন। তিনি স্কুলটা তুলে দিলেন।

ইভ এই ঘটনাটা শুনে বলেছিল- ঠাম্মা, স্কুলটা আমি কিন্তু ভালোবাসতাম।

***

কয়েক মাস পরে ইভ খবর পেল, আলেকজান্দ্রা সুইজারল্যান্ডে চলে গেছে, সেখানে গিয়ে পড়াশুনা করবে।

.

২৫.

ইভের কাছে জগৎটা শূন্য হয়ে গেছে, জীবন উদ্দেশ্যবিহীন, ইভ এখন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সে বিজ্ঞানী হতে চাইছে অথবা গাইয়ে। সার্জেন্ট, পাইলট কিংবা অভিনেত্রী। সে সব কিছু করতে চাইছে, কিন্তু কিছুই করতে পারছে না।

পাশে একটা স্কুল, ইভ তখন সপ্তদশী, সব ছাত্ররা তার প্রতি আকর্ষিত। সে সকলের সাথেই কথা বলে, সে নিজেকে আর দমিয়ে রাখতে পারছে না। বুঝতে পারে, তার এই শরীরটা দিয়েই সকলকে জয় করতে হবে। একটা চুম্বন, একটু আলিঙ্গন, বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। কিন্তু কেন?

ইভ এখন আরও সুন্দরী হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর সবথেকে বড়ো সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী। একের পর এক বিয়ের প্রস্তাব আসছে তার কাছে। সব প্রস্তাব সে ছিঁড়ে ফেলছে। সে জানে, একদিন তাকে একটা ভালো পাত্র দেখতেই হবে।

***

শনিবারের রাত। আলেকজান্দ্রার সাথে এক ফরাসি ছাত্রের দেখা হল। তার নাম রেনে। দেখতে খুব একটা ভালো নয়। কিন্তু মনের ভেতরে বুদ্ধি আছে। আছে সংবেদনশীলতা। আলেকজান্দ্রা ভাবল। এই ছেলেটি চমৎকার। তারা পরের শনিবার শহরের কোনো এক জায়গায় দেখা করার চেষ্টা করল।

তখন থেকে আলেকজান্দ্রা রেনের সাথে মাঝে মধ্যে সময় কাটায়। একদিন কথায় কথায় সে ইভের কাছে বলেছিল- রেনে কিন্তু অন্যছেলেদের মতো নয়, সে লাজুক, ভারী সুন্দর। আমরা শনিবার থিয়েটার দেখতে যাব।

–তুই ওকে কতটা ভালোবাসিস?

অনেকটা, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, ও আমাকে ভালোবাসে কিনা?

ইভ বলল- তুই কি ওর সঙ্গে বিছানায় গিয়েছিস?

ইভ, না-না, রেনে কিন্তু ওই ধরনের ছেলে নয়। ও খুবই লাজুক।

–তা হলে? এভাবে কি ভালোবাসা হয়?

না, আমি ওভাবে কাউকে ভালোবাসতে চাই না।

শনিবার, আলেকজান্দ্রা থিয়েটার হলের সামনে পৌঁছে গেছে। রেনেকে কোথাও দেখা গেল না। আলেকজান্দ্রা এক ঘণ্টা অপেক্ষা করল। কিন্তু রেনে কোথায়? সে একা একা একটা কাফেতে কিছুক্ষণ বসে থাকল। তারপর স্কুলে ফিরে এল। ইভ তার ঘরেতে নেই। আলেকজান্দ্রা আলো বন্ধ করে দিয়েছে। রাত দুটোর সময় ইভ ঢুকে পড়ল।

আলেকজান্দ্রা বলল- তুই কোথায় গিয়েছিলি?

–আমি আমার পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তোর সন্ধ্যেটা কেমন কাটল?

–ও আসেনি।

–সে কী? তুই যে বললি ছেলেটা খুবই ভালো।

–হ্যাঁ, কিছু একটা হয়েছে, হয়তো।

অ্যালেক্স, তুই অন্য কাউকে খোঁজার চেষ্টা কর।

আলেকজান্দ্রা অবাক হয়ে গেছে কেন একথা বলল ইভ? সে কি সত্যি খারাপ? বোনের তুলনায়?

আলেকজান্দ্রা যেসব ছেলেদের ভালোবাসে, ইভ তাদের দখল করতে চায়। এক সপ্তাহ বাদে রেনের সঙ্গে হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে গেল।

রেনে বলল- কী হয়েছে?

-তুমি আমাকে ফোন করোনি কেন?

ফোন?

–হ্যাঁ, ইভ?

আলেকজান্দ্রা। আমি দুঃখিত, আমায় এক্ষুনি যেতে হবে। সে চলে গেল।

আলেকজান্দ্রা বুঝতে পারল, আসলে, কোন ঘটনাটা ঘটেছে।

সন্ধ্যেবেলা আলেকজান্দ্রা এসে ইভকে সব কথা বলল। ইভ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল–না-না, ও তোকেই ভালোবাসে, হয়তো ঠিক মতো চিনতে পারেনি!

ইভের চারপাশের পৃথিবী আরও বর্ণরঙিন হয়ে উঠেছে। ইভ জানে, এই সুন্দর শরীরটা দিয়ে পুরুষদের জয় করতে হবে। অন্তত দু-ডজন ছেলে তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। ছ-জন শিক্ষকের দৃষ্টি আছে তার দিকে। হ্যাঁ, স্কুলে এই ঘটনাটা সকলে জেনে গেছে। ইভ সকলের মাথা চিবিয়ে খাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে।

***

আলেকজান্দ্রা ডরমেটরিতে ফিরে এসেছে। এটাই শেষ কাজ। সে দেখল, ইভ গোছগাছ করছে।

–কোথায় যাচ্ছিস?

বাড়ি যাবো।

বাড়ি? এখন?

–অ্যালেক্স, এখানে থেকে কী হবে? আমরা কিছুই শিখব না। সময় নষ্ট হচ্ছে।

–এমন কথা কেন বলছিস?

–হ্যাঁ, রোজ সকালে উঠে আমার এই কথাটা মনে হয়। তুই কি যাবি?

, আমি যাব না এখন।

–অ্যালেক্স, তুই থাক। আমি নিউইয়র্কে চলে যাব। যে পৃথিবীতে আমরা ছিলাম, সেখানে যাব।

হেডমিস্ট্রেসকে কী বলবি?

সব কিছু বলে দিয়েছি।

উনি কী বললেন?

উনি বললেন, ইচ্ছে করলে আমি যেতে পারি।

আলেকজান্দ্রা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বলল– আমি এখন কী করব, বুঝতে পারছি না।

–তোর ব্যাপার তুই ভালোবোঝার চেষ্টা কর।

আলেকজান্দ্রা ক্লোসেটের কাছে চলে গেল। স্যুটকেস গোছাতে শুরু করল।

ইভ এসে বলল আমি কিন্তু তোকে বাধ্য করছি না।

আলেকজান্দ্রা বলল- আমি একা থাকব কী করে।

ইভ বলল- ঠিক আছে, ঠাম্মাকে ফোন করে সব কথা বলে দিস।

আলেকজান্দ্রা বলল- ঠাম্মা বোধহয় এ ব্যাপারটা মানতে চাইবে না।

ইভ বলল– ওই বুড়ির জন্য চিন্তা করে কী হবে। আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব।

আলেকজান্দ্রা স্কুলটা ছাড়তে চাইছিল না, কিন্তু ইভ চলে যাচ্ছে, সে থেকে কী করবে?

***

কেটি ব্ল্যাকওয়েলের বন্ধু-শত্রু- দুই-ই আছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে এটা হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। দুই নাতনির কথা মাঝে মধ্যে তিনি চিন্তা করেন। তাঁ, একটা অনভিপ্রেত গর্ভপাতের ঘটনা।

তারপর? কেটি শুনলেন, দুই নাতনি ফিরে আসছে, তা হলে একটা দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটে গেল।

***

মেয়েরা ফিরে এল। কেটি তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ইভকে সিটিংরুমে নিয়ে গেলেন। বললেন- তোমার সম্পর্কে অনেক খারাপ খবর শুনেছি। আমি জানতে চাই, তোমাকে কি স্কুল থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে?

-না, আমাদের বার করে দেওয়া হয়নি। অ্যালেক্স আর আমি ঠিক করলাম, স্কুল থেকে চলে আসব।

-কেন? ছেলেদের সাথে জড়িয়ে পড়া।

ঠাম্মা, এ ব্যাপারে তোমার সাথে পরে কথা বলব।

বলো কেন এসেছ?

–অ্যালেক্সই বদমাইসি করেছে।

–অ্যালেক্স কী করেছে?

–না, ওকে দোষ দিও না। ও বাধ্য হয়ে এটা করেছিল। এটাতে ওর কোনো হাত ছিল না।

তার মানে? তুমি আগে বলোনি কেন?

–ও নিজেকে হত্যা করতে চেয়েছিল ঠাম্মা, আমি অ্যালেক্সের জন্য কত চিন্তা করি, তুমি কি তা জানো?

কেটি অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বললেন- ইভ কেঁদো না। সোনা, বলো কী হয়েছে? ব্যাপারটা তোমার আমার মধ্যেই থাকবে।

কেটি আলেকজান্দ্রার দিকে তাকালেন। অসাধারণ, এই মেয়েটা এমন, বাইরে দেখতে কী সুন্দর, ভেতরটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আলেকজান্দ্রাকে নিয়ে অনেক হয়েছে, আর কোনো দুঃখজনক ঘটনা তিনি ঘটতে দেবেন না।

***

পরবর্তী দুবছর ইভ এবং আলেকজান্দ্রা মিসেস পরটারের স্কুলে পড়াশুনা শেষ করল। ইভ মারামারি ঝগড়াতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। কোনো কিছু তাকে সুখী করতে পারছে না। আর এখন কেটির বয়স হয়েছে উনআশি।

একুশতম জন্মদিন, কেটি তার নাতনিদের নিয়ে প্যারিসে গেলেন। অনেক কিছু কিনে দিলেন।

ছোট্ট একটা ডিনার পার্টির আয়োজন করা হল। সেখানে কাউন্ট আলফ্রেড নিজে এসেছিলেন। তাঁর স্ত্রী এসেছিলেন। কাউন্টেস ভিভিয়েন। তাকে দেখতে খুবই সুন্দর। মধ্য পঞ্চাশ বয়স হয়েছে। কাউন্টের মাথায় চুল ঈষৎ ধূসর। শরীরের মধ্যে অ্যাথলেটের ছাপ আছে।

ইভ কারও দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না। মাঝে মধ্যে চোরা চোখে কাউন্ট আলফ্রেডকে দেখছে। ওই মুটকি মেয়েটাকে নিয়ে আলফ্রেড নিশ্চয়ই খুশি হতে পারেন না। আলফ্রেড কী জানেন, যৌনতার আসল খেলা কাকে বলে? ইভ মনে মনে শপথ করল, এই চ্যালেঞ্জটা তাকে জিততে হবে।

পরের দিন ইভ আলফ্রেডকে ফোন করল। আমি ইভ বলছি, আমাকে কি আপনি মনে রেখেছেন?

–তোমাকে আমি কী করে ভুলে যাব কিশোরী কন্যা? তুমি আমার বন্ধু কেঁটির সবথেকে সুন্দরী নাতনি।

-হ্যাঁ, আপনার কথা শুনে ভালো লাগছে কাউন্ট। আপনাকে আমি কি বিরক্ত করেছি? আমি আমার ঠাম্মাকে একটা ব্যাপারে চমক দেব। আমি জানি না, এটা কী করে ঘটবে? ওয়াইনের বিষয়ে আমায় কিছু জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আপনি কি আমায় সাহায্য করবেন?

-হ্যাঁ, তুমি কীভাবে সার্ভ করবে, তার ওপর নির্ভর করছে।

–আমি কিছু মনে রাখতে পারছি না, আমি কি একবার যাব?

এসো, আমি সব ব্যবস্থা করে রাখছি।

ইভ রিসিভারটা সাবধানে নামিয়ে রাখল। হ্যাঁ, এই লাঞ্চের সময় কাউন্টকে বধ করতে হবে।

***

তারা একটা ছোট্ট হোটেলে এসে দেখা করল। আলোচনাটা সংক্ষিপ্ত। ইভ মারিওইয়োরের কথা শুনছিল। শেষ পর্যন্ত বলল- আলফ্রেড, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

কাউন্ট অবাক হয়ে গেছে- তুমি কী বলছ?

-আমি তোমাকে ভালোবাসি।

কাউন্ট মদে চুমুক দিয়ে বললেন- এটা হচ্ছে ভিনটেজইয়ার, তিনি ইভের হাতে হাত রাখলেন। বললেন- এসো, আমাদের ভালোবাসা শুরু হোক।

-না, আমি সে ভালোবাসার কথা বলছি না, আলফ্রেড।

কাউন্ট অবাক হয়ে ইভের চোখের দিকে তাকালেন। তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। মেয়েটির বয়স একুশ বছর, তিনি মধ্য বয়স অতিক্রম করেছেন। বিবাহিত সুখী মানুষ। তিনি কী করে এই মেয়েটির ফাঁদে জড়িয়ে পড়বেন? মাত্র তিনদিন আগে দেখা হয়েছে। তার কথা হারিয়ে গেছে। তিনি মেয়েটির দিকে তাকালেন। একটা বুক খোলা স্কার্ট পরেছে। পাতলা সবুজ সোয়েটার, বুকের সবকিছু পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে। ব্রেসিয়ার পরেনি। ইচ্ছে করেই হয়তো। এমন কী কাউন্ট তার উঁচু দুটো স্তনবৃন্ত দেখতে পেলেন। তিনি পরিচ্ছন্ন অসহায় মুখে তাকালেন। সবকিছু হারিয়ে গেছে শব্দরা কোথায় হারিয়ে গেছে।

-তুমি কী বুঝতে পারছ না, আমি কোন ভালোবাসার কথা বলছি? কাউন্ট আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না। ইভের পাতা ফাঁদে পা দিতেই হল। তারা একটা ছোট্ট হোটেলে গিয়ে পৌঁছোল। হা, কাউন্ট স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, শরীরের খেলাতে ইভ সত্যি পারদর্শিনী। একফোঁটা একুশ বছরের মেয়ে হলে কী হবে। কাউন্টকে সে হারিয়ে দিয়েছে। পরিপূর্ণ তৃপ্তি বলতে যা বোঝায় সেদিনের শরীর সঙ্গমে কাউন্ট তাই লাভ করেছেন।

ব্যাপারটা হয়তো সেখানেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু ইভের দুর্ভাগ্য, তা হল না। শেষ পর্যন্ত অতি উৎসাহী এক ভদ্রমহিলা তাদের হোটেল থেকে বেরোতে দেখেন। এই দুজনের ছবি খবরের কাগজের পাতায় ছাপা হয়েছিল। ভদ্রমহিলা দুজনকেই চিনে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে কেটিকে সব কথা বলেছিলেন। কেটি তখন একেবারে রেগে গেছেন। তিনি ভেবেছিলেন, এর অন্তরালে হয়তো আলেকজান্দ্রা আছে, কিন্তু না, ব্যাপারটা গোলমেলে বোঝা গেল।

ইভের সাথে সরাসরি কথা হল। ইভের ব্যবহারে তিনি তিতি-বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। ইভ যেভাবে পরিবারের নাম ডোবাচ্ছে, তাতে তো তিনি চিন্তিত। শেষ পর্যন্ত তিনি পরিষ্কার বললেন– ইভ, আমি তোমাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করছি। তোমাকে মাসে মাসে একটা টাকা দেওয়া হবে। তুমি এখন থেকে আর আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে না। তুমি নিউইয়র্কে গিয়ে আলাদা অ্যাপার্টমেন্টে থাকবে। আর যদি তোমার কোনো কেচ্ছার খবর আমার কানে পৌঁছোয়, তা হলে মাসিক টাকাও আমি বন্ধ করে দেব, মনে রেখো। কেমন?

ইভ ভাবতে পারেনি, সামান্য দু-এক ঘন্টার শরীর ছোঁয়ার খেলা তার জীবনে এত বড়ো বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। সে স্থির দৃষ্টিতে ওই বৃদ্ধা শয়তানিকে দেখল। তারপর রাগে গরগর করতে থাকল। হ্যাঁ, যে করেই হোক, আলেকজান্দ্রাকে সরিয়ে দিতেই হবে। একটার পর একটা ছবি তার মনের ক্যানভাসে ভেসে উঠল। আলেকজান্দ্রা প্রত্যেকবারই বেঁচে যাচ্ছে। এবার কোনো কথা বলে বোধহয় ঠাকুরমার কান ভারী করে তুলেছে।

***

আলেকজান্দ্রা দিদির এই প্রস্তাবটা বিশ্বাস করতে পারছে না। এই প্রথম দিদিকে ছেড়ে তাকে একলা থাকতে হবে। এক মুহূর্তে তার জগৎটা শূন্য হয়ে গেল। প্রথমে সে দিদির সঙ্গে নিউইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু দিদির ব্যবহারে ভয় পেয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত আমতা আমতা করে বলল- তোর সঙ্গে প্রায় দেখা হবে তো?

মুখে শয়তানি হাসি এনে ইভ জবাব দিল- হ্যাঁ, তুই ভাবতেই পারবি না।

ইভ নিউইয়র্কে ফিরে এসেছে

২৬.

ইভ নিউইয়র্কে ফিরে এসেছে। সে একটা হোটেলে উঠল। তাকে যেমনটি বলা হয়েছিল। এক ঘণ্টা বাদে ব্রাড রজারসের টেলিফোন তোমার ঠাকুরমা প্যারিস থেকে ফোন করেছেন। ইভ, মনে হচ্ছে কোনো সমস্যা।

না, এটা আমাদের পারিবারিক ব্যাপার।

উনি ওনার উইলটা নতুন করে লিখবেন।

–হ্যাঁ, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

–সোমবারে দেখা হবে।

ব্রাড, হা, সোমবারে।

–আমার অফিসে, ঠিক আছে।

***

ইভ ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেডের অফিসে পৌঁছে গেছে। সিকিউরিটি গার্ড তাকে দেখে অভিবাদন জানাল। হ্যাঁ, আমি এই সামাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী।

ব্রাড অবাক হয়ে গেলেন। কেটি টেলিফোন করেছেন কেটি বলেছেন, তিনি ইভকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন। কিন্তু কেন? ইভকে ওর ঠাকুরমা খুবই ভালোর্বাসেন। এর মধ্যে কী ঘটনা ঘটেছে? কিন্তু ব্রাডের কাজই হল কেটির সমস্ত আদেশ পালন করা। তিনি তো আর বাধা দিতে পারেন না।

তিনি বললেন ইভকে কয়েকটা কাগজে সই করতে হবে। তুমি সেগুলো পড়ো আর সই করো।

–তার কোনো দরকার দেখছি না।

ইভ, তুমি বুঝতে পারছ না, তোমার ঠাকুরমার উইল অনুসারে তুমি আজ থেকে প্রতি সপ্তাহে ২৫০ ডলার করে পারে। তোমার ঠাকুরমা তোমার নামে একটা মস্ত বড়ো ফান্ড রেখে যাচ্ছেন। তার পরিমাণটা খুব একটা কম হবে না। সেটা হল ৫০ লক্ষ ডলার। কিন্তু সেই টাকাটা তুমি পাবে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।

–অসম্ভব। আজ একটা ভালো পোশাক কিনতে গেলে অনেক খরচ হয়ে যায়। এইভাবে কেন আমাকে অপমানিত করা হচ্ছে? ইভের মনে হল, সামনে ব্রোঞ্জের যে পেপার ওয়েটটা আছে, সেটা দিয়ে ব্রাডের মাথাটা থেঁতলে দেবে। কিন্তু পারল না।

ব্রাড অবাক হয়ে গেছে- তুমি ব্ল্যাকওয়েলদের নাম আর ব্যবহার করতে পারবে না। তোমাকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকতে হবে।

..হ্যাঁ, তোমার নামের সাথে যদি কোনো গুজব ছড়িয়ে যায়, পত্রিকাতে কিংবা অন্য কোথাও তোমার ছবি ছাপা হয়, তাহলে তোমার সাপ্তাহিক টাকাটা বন্ধ করে দেওয়া হবে। সবকিছু বুঝতে পারছ তো?

. ...তোমার এবং তোমার বোন আলেকজান্দ্রার নামে বীমার পত্র আছে। তোমার ঠাকুরমা এটাকে পরিবর্তন করতে চাইছেন। এই পলিসিটাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই বছরের শেষে যদি তোমার ব্যবহারে ঠাকুরমা খুশি থাকেন, তাহলে তোমার সাপ্তাহিক মাসোহারার পরিমাণ দ্বিগুণ করে দেওয়া হবে। আর একটা কথা বলার আছে।

বলুন।

–তুমি কোনোদিন ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা করবে না।

বুড়ি কুত্তি শয়তানি, তোর মুখ আমি দেখব না। তুই পচে মর, তাতে আমার কী এসে গেল?

ব্রাডের কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্নতা–যদি তোমার কোনো সমস্যা থাকে, তুমি আমাকে টেলিফোন করো। তুমি ওই বাড়িতে আর কখনও যেও না, কেমন?

এভাবেই আলোচনা শেষ হয়ে গেল।

ব্রাড জানতে চাইল কোনো প্রশ্ন আছে কি?

-না।

–তাহলে এখানে সই করো।

দশ মিনিট কেটে গেছে। ইভ এখন রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। তার পকেটে ২৫০ ডলার!

পরের দিন সকালবেলা ইভ একজন রিয়েল স্টেট এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করল। তাকে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিতে হবে। মনে মনে অনেক কিছুই সে ভাবছে। কিন্তু এইটুকু অর্থে চলবে কী করে? শেষ অব্দি একটা ছোটো অ্যাপার্টমেন্ট নিতেই হবে। ঠাকুরমাকে গালাগালি দিল মন খুলে। কিন্তু কোনো উপায় নেই।

ইভের কাছে এটা একটা বন্দিশালা। না, সে আলেকজান্দ্রার কথা চিন্তা করল। আলেকজান্দ্রা ওই বিরাট প্রাসাদে থাকবে, আর আমি এইভাবে জীবন কাটাব। কিন্তু সমস্যার সমাধান কোথায় হবে!

***

–মিস ব্ল্যাকওয়েল, বলল, তোমার জন্য আমি কী করতে পারি? আলভিন সিগ্রাম জানতে চাইলেন। তিনি ন্যাশনাল ইউনিয়ান ব্যাঙ্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট। তার হাতে অনেকের ভাগ্য জড়িয়ে আছে। জুগার ব্রেন্টের প্রধান অ্যাকাউন্ট এই ব্যাঙ্কে অবস্থিত।

ইভ বোঝাবার চেষ্টা করল– আমার নামে কিছু টাকা জমা আছে। পঞ্চাশ লক্ষ ডলার। এই ট্রাস্টের নিয়মানুসারে পঁয়ত্রিশ বছরের আগে আমি টাকাটা পাব না। অনেক দিন সময় লাগবে।

-হ্যাঁ, তোমার এখন কত বয়স হবে, উনিশ বোধহয়।

একুশ।

–তোমাকে তো আর তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা যায় না।

ইভ ভালোভাবে হাসার চেষ্টা করল- ধন্যবাদ, মিঃ সিগ্রাম।

লোকটা বোকা হাঁদা। একে ফাঁদে ফেলতে হবে।

–আমার কাছ থেকে তুমি কী সাহায্য চাইছ?

–আমি কি ট্রাস্ট ফান্ড থেকে কিছু টাকা ধার পেতে পারি? পরে আমি শোধ করে দেব। আমার বিয়ের সম্বন্ধ চলছে। আমার প্রেমিক একজন কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ার। ইজরায়েলে কাজ করে। আগামী তিনবছর তাকে ইজরায়েলে থাকতে হবে।

আলভিন সিগ্রাম সহানুভূতির কণ্ঠস্বরে বললেন আমি বুঝতে পারছি। তার মন এখন আনন্দে নাচছে। আহা, এই মেয়েটির তো আবেদন রাখতেই হবে। সবসময় ট্রাস্ট ফান্ড থেকে টাকা অগ্রিম দেওয়া যায়। মেয়েটি যদি আমাকে খুশি করতে পারে, তাহলে আরও –আরও বেশি দেওয়া হবে।

আলভিন বললেন কোনো সমস্যা নেই। অতি সহজেই এর সমাধান হয়ে যাবে। আমরা তোমাকে পুরো টাকাটা ঋণ হিসেবে দিতে পারব না, কিন্তু অনেকটাই দেব। মনে করো তোমাকে যদি ১০ লক্ষ ডলার দেওয়া হয়, তাহলে চলবে?

ইভের মন আনন্দে আত্মহারা হ্যাঁ, চলবে।

-তুমি আমাকে ওই ট্রাস্টের পুরো হিসাবটা দিয়ে যেও।

–আপনি ব্রাড রজারসের সঙ্গে কথা বলুন, উনি আপনাকে সব খবর দেবেন। ইভ আবার বলল, কতদিন সময় লাগবে?

একদিন-দুদিনের মধ্যে হয়ে যাবে।

ইভ অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছে। আলভিন সিগ্রাম টেলিফোন নিয়ে ব্রাড রজারসের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন।

দুদিন বাদে ইভ ব্যাঙ্কে ফিরে এল। আলভিন সিগ্রামের অফিসে পৌঁছে গেল। ভদ্রলোক বললেন মিস ব্ল্যাকওয়েল, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না।

-কেন? আপনি যে বললেন ব্যাপারটা খুবই সহজ।

–না, আমি সব তথ্য জানতাম না। ব্রাডের সঙ্গে কী কথা হয়েছিল, ভদ্রলোকের মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ, পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের একটা ফান্ড আছে ইভ ব্ল্যাকওয়েলের নামে। কিন্তু টাকাটার কোনো অংশই ইভকে। দেওয়া উচিত নয়। ইভের চরিত্র ভালো নয়। সে উল্টোপাল্টা খরচ করে।

ব্রাড রজারস এসব কথা কেন বলতে গেল। শেষ পর্যন্ত এই ভদ্রলোকের মন বিগড়ে গেছে।

উনি আবার বললেন আমি কিছুই করতে পারব না।

ইভ খুবই হতাশ হয়েছে, সে বলল- ধন্যবাদ। আপনাকে কষ্ট দিলাম, এজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। দেখি, অন্য কোনো ব্যাঙ্কে সম্ভব কিনা।

আলভিন সিগ্রাম বললেন– না, পৃথিবীর কোনো ব্যাঙ্ক তোমাকে ওই ট্রাস্টের বিনিময়ে এক পেনিও ধার দেবে না।

***

আলেকজান্দ্রা অবাক হয়ে গেছে। আগে নানাভাবে ঠাম্মা ইভকে ভালোবেসেছে। সে সবসময় পেছনের সারিতেই থেকে গেছে। এখন ব্যাপারটা কী করে পাল্টে গেল। সে কীভাবে ইভকে হারিয়ে দিতে পারল।

কেটি ব্ল্যাকওয়েল আলেকজান্দ্রার সঙ্গে বেশি সময় কাটাচ্ছেন। আলেকজান্দ্রা এই অবস্থাটা মানতে পারছে না। এই জীবনটা সে কেমনভাবে কাটাবে।

এই প্রথম কেটি আলেকজান্দ্রার দিকে ভালো করে তাকালেন। হ্যাঁ, আলেকজান্দ্রার মধ্যে সম্ভাবনা আছে।

তার মধ্যে একটা অন্তর্মুখী অবস্থা আছে। সে ইভের থেকে আরও বেশি সংযমী। তার মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি আছে। আছে শৈশবী অনুসঙ্গী। আছে অসাধারণ সৌন্দের্যের ছটা। সে সব সময় বিভিন্ন পার্টিতে লোকেদের ভালোভাবে অভ্যর্থনা জানাতে পারে। কেটি শেষ পর্যন্ত চিন্তা করল। আলেকজান্দ্রকে বাইরে জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

***

ইভের দিন ভালোভাবেই কেটে চলেছে। ঠাকুরমার কথা মাঝে মধ্যে মনে পড়ে। একটা পার্টিতে সে ছ-জনের সাথে যোগাযোগ করল। এই পাটিটা শেষ হবার পর বাড়িতে ফিরে এসেছে। ছ-জনের মধ্যে চারজন বিবাহিত। দুজনের কাছ থেকেই একের পর এক খবর আসতে শুরু হল। ইভ বুঝতে পারল, টাকার জন্য আর চিন্তা করতে হবে না। তাকে অনেকে উপহার দিল, নানা ধরনের জুয়েলারী, ছবির সম্ভার, এমন কী নগদ টাকা।

তারা সকলেই ইভের সঙ্গ উপভোগ করতে চাইছে। ইভকে সব সময় বাইরে দেখা গেল। বিবাহিত লোকেরা তার অ্যাপার্টমেন্টে আসতে শুরু করল। ইভ সকলের সাথেই সুন্দর ব্যবহার করে চলেছে। কিন্তু যাতে সাংবাদিকের চোখে না পড়ে তার ব্যবস্থা করেছে। সে কারোর সাথে বেশি দিন সম্পর্ক রাখছে না। যে করেই হোক ওই অপমানের প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে।

একদিন টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি নামে একটা খবরের কাগজের পাতায় আলেকজান্দ্রার ছবি ছাপা হল। সুন্দর চেহারার এক যুবকের সঙ্গে আলেকজান্দ্রা নাচছে। ইভ আলেকজান্দ্রার

দিকে দেখছে না। লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে। হ্যাঁ, যদি আলোকজান্দ্রা এই লোকটিকে বিয়ে করে এবং তার একটা পুত্রসন্তান হয়, তাহলে কী হবে?

ইভ অনেকক্ষণ ওই ছবিটার দিকে তাকিয়ে ছিল।

এক বছর ধরে আলেকজান্দ্রা নিয়ম করে ইভকে টেলিফোন করেছে। লাঞ্চ এবং ডিনারের জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কোনো না কোনো অজুহাত দেখিয়ে ইভ সেই আমন্ত্রণে সাড়া দেয়নি। এখন ইভ ঠিক করল আলেকজান্দ্রার সঙ্গে কথা বলতে হবে। সে আলেকজান্দ্রাকে তার অ্যাপার্টমেন্টে ডেকে পাঠাল।

***

আলেকজান্দ্রা ওই অ্যাপার্টমেন্টে এসে ঢুকল ইভ তাকে জড়িয়ে ধরল।

আলেকজান্দ্রা বলল- এটা খুব সুন্দর, তাই না?

-হ্যাঁ, এটা আমার ভালোই লাগে।

দেওয়ালে কতগুলো পেন্টিং ঝোলানো আছে। আলেকজান্দ্রা ঘুরে সবকিছু দেখল।

ঠাকুরমা কেমন আছে, ইভ জানতে চাইল।

ঠাকুরমা ভালোই আছে। ইভ, আমি জানি না, তোদের মধ্যে কী হল? আমি কি সাহায্য করব?

ইভ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল না। ঠাকুরমা তোকে কিছু বলেনি?

না, ঠাকুরমা এ ব্যাপারে আলোচনা করেনি।

আমি দোষ দিতে পারছি না, আমার সঙ্গে এক ডাক্তারের আলাপ হয়েছিল। আমরা বিয়ে করতে চলেছি। আমরা নিয়মিতভাবে বিছানাতে যাই। ঠাকুরমা এই খবরটা জানতে পেরেছে। সে আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। সে আমার মুখ দেখবে না। অ্যালেক্স, ঠাকুরমা আগেকার দিনের মনোভাব পোষণ করে, তাই না?

আলেকজান্দ্রার মুখে কেমন একটা ছাপ- হ্যাঁ, ঘটনাটা সত্যি সাংঘাতিক। তোরা দুজন ঠাকুরমার কাছে চলে যা, আমার মনে হয় ঠাকুরমা তোদের ক্ষমা করবে।

না, এরোপ্লেন অ্যাকসিডেন্টে ছেলেটি মারা গেছে।

ইভ, তুই তো একথা আমাকে বলিসনি।

–একথা তোকে বলতে আমার লজ্জা করছিল। তবে তোকে আমি সব কথা বলতে পারি।

ঠাকুরমাকে বলব?

না, আমার কথা আর বলতে হবে না। তুই কখনও এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করবি না প্রতিজ্ঞা কর।

আলেকজান্দ্রা বলল- ঠিক আছে। আমাকে বিশ্বাস কর।

–ভালোই আছি, ইচ্ছে মতো ঘোরাফেরা করতে পারছি।

আলেকজান্দ্রা তার বোনের দিকে তাকাল–ইভকে সে আর পাশে পাচ্ছে না, ব্যাপারটা তাকে দুঃখ দিচ্ছে। ইভ আলেকজান্দ্রার হাতে হাত রাখল। বলল- তোর জীবন কেমন চলছে বল? কারোর সঙ্গে যোগাযোগ হল? নিশ্চয়ই কোনো প্রেমিকের সন্ধান পেয়েছিস?

না।

ইভ আলেকজান্দ্রার দিকে তাকিয়ে বলল- সত্যি বলছিস?

-হ্যাঁ, সময় তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। ঠাকুরমার সঙ্গে কথা বলতে হবে। আসছে সপ্তাহে আমি একটা চাকরির জন্য আবেদন করব।

ইভ অবাক হয়ে গেছে। কিন্তু সে চাকরি করবে কেন?

আলেকজান্দ্রা বলল- ইভ তোর কি টাকা লাগবে?

–না, অনেক টাকা আমার হাতে আছে।

আলেকজান্দ্রা বলল, ঠিক আছে তুই আমাকে ফোন করিস কিন্তু।

ইভ আলেকজান্দ্রার দিকে তাকাল দরকার হলে অবশ্যই করব অ্যালেক্স।

***

সপ্তাহের শেষে নাসাউতে একটা পার্টি ছিল। ইভের সব বন্ধুরা সেখানে এসেছে। নিকা নামে একটা মেয়ের সাথে ইভের আলাপ হয়েছে। নিকাকে সে সুইজারল্যান্ড থেকেই চেনে।

এখন আবার তার জীবনে সে এসেছে। সেই সন্ধ্যাতে ইভ একটা সুন্দর মরকতের ব্রেসলেট পরে ছিল। এক সপ্তাহ আগে একজন ইনসিওরেন্স এগজিকিউটিভ তাকে ওই ব্রেসলেটটা উপহার দিয়েছে। তাকে বেশ কয়েকটা পোশাক দেওয়া হয়েছে।

***

বিরাট ম্যানসন সমুদ্রের ধারে। প্রধান বাড়িতে তিরিশটা ঘর আছে। সব থেকে ছোটো ঘরটা ইভের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে অনেক বড়ো। ইভকে এক পরিচারিকা তার ঘরে নিয়ে গেল।

ড্রয়িংরুমে ষোলো জন মানুষ বসে আছে। তারা সকলেই যথেষ্ট অর্থবান। নিকা ইভের মতো মতবাদে বিশ্বাস করে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে বেড়াতে ভালোবাসে।

ইভ সকলকে অধিকার করার চেষ্টা করছে। বেশির ভাগ লোকদের বিয়ে হয়ে গেছে। তাই ফাঁদে ফেলাটা অত্যন্ত সহজ।

টাক মাথার একটা লোক হাওয়াইয়ান স্পোর্টস শার্ট পরেছিল। সে বলল– বলো তোমার নাম কী? তুমি কি আমাকে সুখ দিতে পারবে? তোমার তো হলিউডের স্টার হওয়া উচিত।

–আমি কি অতখানি প্রতিভাশালী? ইভ জানতে চাইল।

–হ্যাঁ, তুমি এখানে একা আছো?

হা।

–আমার প্রমোদ তরণী সমুদ্রে আছে। তুমি আর আমি কি কাল সেখানে যেতে পারি?

–হ্যাঁ।

–ঠিক আছে, ওখানে অনেক কথা হবে কেমন? তোমার ঠাকুরমাকে আমি চিনি অনেক বছর ধরে। ইভের ঠোঁটে হাসি। সে বলল-ঠাকুরমার কোনো তুলনা নেই। আমি এখন একটু ওদিকে যাচ্ছি, কেমন?

ভদ্রলোক বলল- মনে আছে তো কাল?

***

ইভ এখন আর একা নয়। তখন থেকে অনেক বন্ধু জুটে গেছে তার। একটার পর একটা তরঙ্গ আসছে, সমুদ্রটা শান্ত, মনে হচ্ছে, আকাশে নক্ষত্ররা হিরের মতো জ্বলছে।

ইভ প্যারাডাইস আইল্যান্ড বিচকে দেখতে পেল। একটা মোটরবোট এগিয়ে চলেছে। হ্যাঁ, এই তো জীবন, এই তো আসল আনন্দ!

***

নিকার ড্রয়িংরুম, পাঁচ ঘণ্টা বাদে। ইভের মনে হল, সে বোধহয় এত আনন্দ কোনো দিন পায়নি। সে চোখ খুলল। হ্যাঁ, ছফুট লম্বা মানুষটি, অসাধারণ দেহ সুষমা। কালো চোখ, অ্যাথলেটের মতো শরীর। সে হাসছে, অন্ধকারে ঝিকিয়ে উঠছে তার সাদা দাঁত।

–আমি জর্জ মেলিস, তুমি তো ইভ ব্ল্যাকওয়েল? তুমি এখানে?

–হ্যাঁ, কণ্ঠস্বর কেমন যেন।

–এসো ডার্লিং, নিকা বলল, তোমাদের সাথে আর সকলের আলাপ করিয়ে দিই।

না, সকলের সঙ্গে কথা হয়েছে। জর্জ বলল।

নিকা দুজনের দিকে তাকাল- ঠিক আছে। দরকার হলে আমাকে ডেকো।

ইভ হাসছে, আরও একজন-আরও একজন তার জীবনে প্রবেশ করছে।

ইভ এখন একে গ্রাস করবে। সব কিছু।

ইভ জানতে চাইল তোমার পরিচয়?

–আমি গ্রিক, আমার পরিবার চাষ করে থাকে। বিরাট খামার আছে আমাদের। হা, মেলিসের নাম সবাই জানে। আমেরিকাতে ওদের সুপার মার্কেট আছে।

–তোমার বিয়ে হয়েছে?

না।

এই উত্তরটা আনন্দ দিয়েছে ইভের মনে।

–এসো, আমরা কিছু ব্যক্তিগত কথা বলি।

ইভের সাথে সমস্ত সন্ধ্যেটা কেটে গেছে। তারা একসাথে সিগারেট খেয়েছে। ড্রিক করেছে। মধ্যরাত। গেস্টরা একে একে বিদায় নিতে শুরু করেছেন।

জর্জ বলল- তোমার বেডরুম কোনটা?

–উত্তরে, হলের একেবারে শেষের দিকে।

জর্জের চোখে আনন্দের হাসি।

***

ইভ পোশাক খুলল, চান করল। ছোট্ট একটা রাত পোশাক পরল। কালো রঙের নেগিলি, কোনোরকমে তার শরীরকে আটকে রেখেছে। রাত একটা। দরজাতে হাতের শব্দ। সে খুলে দিল। জর্জ ঢুকে পড়েছে।

জর্জের চোখে বিস্ময়- হায়, তুমি তো ভেনাসের মতো সুন্দরী।

-হ্যাঁ, এটাই আমার সম্পদ। এসো, তোমাকে একটু আদর করব।

সে জর্জকে জড়িয়ে ধরল। একটা ঠোঁটের খেলা। জিভে জিভে ঠোকাঠুকি।

ইভের চিৎকার- হায় ঈশ্বর!

জর্জ তার জ্যাকেট খুলল, ইভ তাকে সাহায্য করল। এক মুহূর্তের মধ্যে জর্জ সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে গেল। অসাধারণ শরীর আছে তার। সেটা শক্ত হয়ে উঠেছে।

ইভ বলল– তাড়াতাড়ি, আমার ভেতরে ঢুকিয়ে দাও। আমি আর থাকতে পারছি না।

জর্জ বলল- হ্যাঁ, তুমি উল্টে শোও, আমি অন্যভাবে তোমাকে আদর দেব।

ইভ অবাক হয়ে গেছে সে কী? সত্যি? না-না।

জর্জ বারবার বলছে। তাকে এভাবে করতেই হবে।

-প্লিজ, ওভাবে করো না।

জর্জ আবার আঘাত করার চেষ্টা করল। সে ইভকে ঘুরিয়ে শুইয়ে দিল।

না, আমি মরে যাব!

হ্যাঁ, শেষ অব্দি কাজটা হয়েছে, ইভ তার চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। মনে হচ্ছে সে বোধহয় বাতাসে ভেসে চলেছে। জর্জ সেটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। একেবারে ভেতরের দিকে। ইভ চিৎকার করার চেষ্টা করছে।

শেষকালে ইভ বলল- আমাকে এভাবে আঘাত দিও না।

সে জর্জকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু জর্জ তার নিতম্বকে শক্তভাবে ধরে রেখেছে। বারবার সেখানে ঢোকাচ্ছে, হা, তার বিশাল আকারের লিঙ্গটি। অসম্ভব যন্ত্রণা।

ইভ বলছে– বন্ধ করো।

জর্জ আরও ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। ইভের মনে হল একটা তীব্র যন্ত্রণা ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছে।

শেষ পর্যন্ত সে তার চেতনা ফিরে পেয়েছে। চোখ খুলল। জর্জ চেয়ারে বসে আছে। পোশাক পরে নিয়েছে। সিগারেট খাচ্ছে। সে ইভের মাথায় হাত রাখল। ইভ তখনও চিৎকার করছে।

-কেমন লাগল?

ইভ কথা বলার চেষ্টা করছে, ভীষণ যন্ত্রণা, তুমি একটা শূয়োর। তার কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণতা।

-হ্যাঁ, আমি তোমাকে ব্যথা দিতে চেয়েছিলাম।

–কেন?

সে হাসল। মাঝে মধ্যে আমি এমন আচরণ করি। কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি। প্রতি রাতে আমি তোমাকে এভাবেই আদর দেব।

ইভের মনে হল কিছু একটা বলবে। সে বলল- তুমি একটা উন্মাদ।

সে জর্জের চোখের দিকে তাকাল, চোখের মধ্যে একটা আগ্রহ। ইভ তাড়াতাড়ি বলল, না আমি এভাবে বলতে চাইনি। এসো, তুমি আমার পাশে শোবে এসো।

জর্জ মেলিস অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকল। সে পাশে এসে বসল। হ্যাঁ, তার জুয়েলারীর দিকে তাকিয়ে থাকল, প্লাটিনামের ব্রেসলেট। দামী হিরের নেকলেস, জর্জ নেকলেসটার দিকে তাকাল। বলল– এটাকে আমি স্মৃতি হিসেবে রেখে দেব।

ইভ কিছু বলতে পারল না।

-শুভরাত ডার্লিং। সে বাইরে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে ইভকে আদর দিল ঠোঁটের ওপর।

ইভ অনেকক্ষণ একা বসে ছিল। একটা যন্ত্রণা তখন তাকে গ্রাস করেছে। হ্যাঁ, যৌনতা কী মারাত্মক।

ইভ বাথরুমে চলে গেল। আয়নায় তাকাল। চোখ মুখ বসে গেছে। বুঝতে পারল, একটা চোখে বেশ আঘাত লেগেছে। সে হটবাথ নিল। এক বন্য কুকুরীর মতো হেঁটে গেল।

তারপর? ঘুম–শুধু ঘুম!

***

সকালবেলা ইভের ঘুম ভেঙে গেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বিছানা। হ্যাঁ, এজন্য লোকটাকে শাস্তি দিতেই হবে। সে আবার স্নান করল। জায়গায় জায়গায় ফুলে গেছে। জর্জের কথা মনে হচ্ছে। জর্জের আচরণের মধ্যে একটা অদ্ভুত নির্মমতা লুকিয়ে আছে।

দু-ঘন্টা কেটে গেছে। ইভ নীচে নেমে এসেছে। অন্য গেস্টদের সঙ্গে আসরে এসেছে। নিকাকে দেখা গেল– এ কী অবস্থা হয়েছে তোর মুখের?

ইভ হাসল- হ্যাঁ, রাতে আমি পড়ে গিয়েছিলাম, আলো জ্বালাতে ভুলে গিয়েছিলাম।

ডাক্তার ডাকতে হবে?

না-না, ডাক্তারের দরকার নেই। জর্জ কোথায়?

–ও টেনিস খেলছে। ও দারুণ টেনিস খেলে। লাঞ্চে দেখা হবে বলেছে। ওকে কেমন লাগল?

-হ্যাঁ, ও কী করেরে?

-ও ভীষণ পয়সাওয়ালা গ্রিক। ও হল সবথেকে বড় ছেলে কিন্তু ব্যবসাতে মন নেই। আসলে এত বেশি টাকা আছে ওর, পায়ের ওপর পা রেখে জীবন কাটাতে পারবে।

***

ইভের মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। জর্জের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হবে। কিন্তু কোথা থেকে এবং কেমন করে? হঠাৎ এক পুরোনো বান্ধবীর কথা তার মনে পড়ে গেল। সেই মেয়েটি একটি ফ্যাশান পত্রিকা চালায়। এই পত্রিকার প্রধান কাজ হল বিখ্যাত মানুষদের জীবনী প্রকাশ করা। সেই মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগ করে ইভ জর্জের পুরোনো ইতিহাস জেনে নিল। হ্যাঁ, তাদের টাকার কোনো অভাব নেই। কিন্তু জর্জের এই বেপরোয়া মনোভাব তাকে পথের ভিখারি করে দিয়েছে। একটার পর একটা কলঙ্কের সাথে সে জড়িয়ে পড়েছে। তাই তাকে গ্রিস থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার ইভ বুঝতে পারল, কেন স্মারক হিসেবে জর্জ ওই নেকলেসটা নিয়ে গেছে। এমন লোককেই আমার দরকার- ইভ মনে মনে ভাবল, আমাকেও অন্যায়ভাবে আমার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। জর্জের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একইরকম। আমরা দুজনে হাত মেলাব। শেষ পর্যন্ত আমরা একটা বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলব।

পরদিন সকালে ইভ জর্জকে ফোন করে ডেকে পাঠাল। তার অ্যাপার্টমেন্টে জর্জকে আমন্ত্রণ জানাল।

জর্জ তিরিশ মিনিট বাদে এসেছে। জর্জের এটাই হল স্বভাব। কখনও সময় রাখতে পারে না।

জর্জ এই ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টের চারিদিকে তাকাল। তারপর বলল– ভারী সুন্দর।

সে ইভের কাছে এগিয়ে এল। বলল তোমার কথাই সব সময় ভেবেছি।

ইভ তার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে বলল- শোনো, তোমার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে।

জর্জ বলল- একটু পরে কথা বললে কেমন হয়।

-না, এখনই কথা বলতে হবে। তুমি যদি আর কখনও আমাকে ওইভাবে আদর দাও, আমি কিন্তু তোমাকে মেরেই ফেলব।

জর্জ ইভের দিকে তাকাল এবং বলল- সত্যি?

না, এটাকে ঠাট্টা মনে করো না। তোমার জন্য একটা ব্যবসায়িক প্রস্তাব আছে।

–তুমি আমাকে এখানে ডেকেছ ব্যবসা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য?

–হ্যাঁ, এই ব্যবসা তোমার ভালোই লাগবে।

কী বলবে বলো?

–তোমার পরিবার খুবই ধনী, তাই তো? আমার পরিবারও তাই। কিন্তু আমি ধনী নই। আমাদের দুজনকেই প্রতারিত করা হয়েছে।

-হ্যাঁ, তুমি কী করতে বলছ?

-তুমি আমার বোন আলেকজান্দ্রার সাথে পরিচিত হও। তুমি তাকে বিয়ে করবে। তারপর এই বিরাট সম্পত্তিটা আমরা ভাগ করে নেব।

কী করে? জর্জের চোখে বিস্ময়।

–একটা দুর্ঘটনা ঘটবে। ছোট্ট একটা দুর্ঘটনা, সকলেই জানে আলেকজান্দ্রা বারে বারে দুর্ঘটনায় পড়ে।

.

২৭.

নতুন একটা জীবন হাতছানি দিয়ে ডাকছে আলেকজান্দ্রাকে। বার্কলে অ্যান্ড ম্যাথুজ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এজেন্সি। ম্যাডসন এভিনিউতে বিরাট অফিস। বছরে কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা করে। পরের সোমবার সেখানে আলেকজান্দ্রা গিয়ে পৌঁছোল।

কর্মব্যস্ততার ছাপ সব জায়গায় রয়েছে। বিরাট বাড়িতে এলে মনে হয়, প্রতিটি মুহূর্ত কত উল্লেখযোগ্য। আলেকজান্দ্রাকে তার বিরাট অফিসে নিয়ে যাওয়া হল। বার্কলে এবং ম্যাথুজ উঠে এসে আলেকজান্দ্রার হাতে হাত রাখলেন। দুজন অংশীদারকে মোটেই এক রকম দেখতে নয়। বার্কলে লম্বা এবং রোগা, মাথায় সাদা চুল। ম্যাথুজ খর্বাকৃতি, চেহারাটা ফোলা ফোলা।

এই অপিসে আরও অনেককে দেখা গেল। ফার্মের ভাইস প্রেসিডেন্ট লুকাস পিন্টারসনও পর্যন্ত এসে গেছেন।

আলেকজান্দ্রার দিকে তাকিয়ে সকলে শুভ কামনা করলেন। বলা হল এখন থেকেই কাজে যোগ দিতে হবে।

আলেকজান্দ্রার দিনটা নতুনভাবে শুরু হয়েছে।

***

কাজের চাপে আলেকজান্দ্রা মাথা তুলতে পারেনি। মাঝে মধ্যে সহকর্মীরা এসে সাহায্য করেছে।

***

এই ব্যাপারে আলেকজান্দ্রা জানতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। সব জিনিসটা তাকে বুঝে নিতে হবে। কীভাবে লেআউট করতে হয়, কপি লিখতে হয়– সবকিছু।

***

পরবর্তী সোমবার কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেগুলো সমাধান করতে হবে। রোজ সকাল এবং সন্ধ্যেবেলা তাকে বিভিন্ন অধিবেশনে যোগ দিতে হচ্ছে। কেউ কেউ ন্যাশনাল মিডিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। কেউবা নিউইয়র্ক টাইমসের পাতায় প্রকাশিত ফিনানসিয়াল রিপোর্টটা দেখাচ্ছে।

একটির পর একটি কাজের বোঝা। সবকিছু আলেকজান্দ্রাকে ঠাণ্ডা মাথায় সামাল দিতে হবে।

একদিন দুপুরবেলা আলেকজান্দ্রা তার সহকর্মী অ্যালিস কোপবেলকে বলেছিল– তুমি কি লাঞ্চের জন্য সময় দিতে পারবে?

-না, আমি ব্যস্ত আছি।

তারপর সে আর এক সহকর্মী ভিনসে বারনেসকে বলল- তুমি সময় দেবে?

কেউ তাকে সময় দিচ্ছে না কেন?

লাঞ্চের আসরে বসে আলেকজান্দ্রার মনে হচ্ছে, এরা সকলে বোধহয় তার কাজে বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু সে তো আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

আলেকজান্দ্রা আরও তিনদিন অপেক্ষা করল। তারপর বলল- অ্যালিস, তুমি কি একটা ছোট্ট ইতালিয়ান রেস্টুরেন্টে যাবে?

না, আমি ইতালিয়ান খাবার খেতে ভালোবাসি না।

ভিনসে বারনাসও তার প্রস্তাব প্রত্যাখান করল।

আলেকজান্দ্রার মুখে লজ্জার আভা–হ্যাঁ, যে কোনো কারণেই তোক এরা আমার সংসর্গ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কেন সে বুঝতে পারছে না। সে এইভাবে কী করে একা একা জীবন কাটাবে।

বৃহস্পতিবার দুপুর একটা, আলেকজান্দ্রা বসে আছে, সে চারপাশে তাকিয়ে দেখছে, সকলেই লাঞ্চ খেতে বেরিয়ে গেছে। নিঃসঙ্গতা এসে তাকে গ্রাস করেছে। এক মুহূর্ত বাদে নরম্যান ম্যাথুজের কণ্ঠস্বর শোনা গেল কিছু বলার আছে?

প্রিন্টক্রাফটার মেশিন ধরে বললেন মি. ম্যাথুজ–একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

-কী হয়েছে? এভাবে কেউ কপি রাইট করে?

এভাবেই একটা অশুভ সংকেত বেজে উঠল। চার ঘণ্টা সময় লেগেছে এই ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে। আলেকজান্দ্রা কিছুই করতে পারছে না। না, এভাবে কাজ করলে তাকে এই কোম্পানিতে রাখা যাবে না।

আলেকজান্দ্রার মনে হচ্ছে, এই অফিসের সবাই বুঝি তাকে এখানে চাইছে না।

কিন্তু কেন সে বুঝতে পারছে না।

পরের দিন সকালে আলেকজান্দ্রা তার অফিসে গেছে, সকলেই তার জন্য অপেক্ষা করছে।

আলেকজান্দ্রা বলল–কিছু ভুল হয়েছে কী?

অ্যালিস কোপবেল বলল –আমরা সবাই চাইছি, আজ দুপুরে লাঞ্চে তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে। এখানে একটা সুন্দর ইতালিয় রেস্তোরাঁ হয়েছে।

.

২৮.

ছোটো থেকেই ইভ ব্ল্যাকওয়েল এভাবে জীবন কাটাতে অভ্যস্ত। সে মানুষকে নানাভাবে বিমুগ্ধ করার চেষ্টা করে। আগে নেহাতই কিশোরী সুলভ কৌতুকের সঙ্গে এটা করত। এখন তার আচরণের মধ্যে একটা শয়তানি প্রবৃত্তি এসে গেছে। সে চাইছে, এইভাবে বেশ কিছু টাকা আয় করতে, কিন্তু এখন তার লক্ষ্য জর্জ মেলিস। যে করেই হোক জর্জের সাথে আলেকজান্দ্রার আলাপ করাতেই হবে।

***

তারা বিছানাতে শুয়ে আছে একেবারে নগ্ন হয়ে। হ্যাঁ, জর্জ হল পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর জন্তু। বুনো উন্মাদনা দিতে পারে, কিন্তু এ-জন্তুকে এখন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ইভ ধীরে ধীরে জর্জের দেহের নানা জায়গাতে তার জিভের পরশ দিল। হ্যাঁ, ওটা শক্ত হয়ে উঠেছে।

সে আবেগ ঝরানো কণ্ঠস্বরে বলল –জর্জ, এখনই আমাকে আনন্দ দিতে শুরু করো। আমি দু-পা ফাঁক করে শুয়ে আছি।

জর্জ বলল–না, তুমি ঘুরে শোও। আমি পেছন দিকে করব।

-না, এটাই আমার উপায়। এটাই আমাকে সুখী করতে পারে।–

-এটা আমার ভালো লাগে না।

-আমি জানি, তুমি বোধ হয় সমকামী? ছোটো থেকে এটা অভ্যাস করেছ? কিন্তু আমি তো একটা ছেলে নই, আমি একটা মেয়ে। এসো, আমার ওপর চড়ে বসো।

জর্জ ইভের ওপর চড়ে বসল। তার উদ্ধত দণ্ডটা ঢুকিয়ে দিল। এভাবে আমার আনন্দ হয় না, ইভ।

-আমি জানি, কিন্তু আমাকে তো এভাবেই আনন্দ দিতে হবে।

এবার ইভের আসল খেলা শুরু হল। সে শরীরটাকে একবার সামনের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, পরক্ষণেই পেছনের দিকে নামিয়ে আনছে। হ্যাঁ, ঘর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। জর্জ কিন্তু প্রচণ্ড হতাশ। সে ইভকে আঘাত করার চেষ্টা করল। ইভ কোনো দিকে তাকাচ্ছে না।

ইভ বলল –আবার। আবার করো। শেষ অব্দি রতি তৃপ্ত হয়ে গেল সে। একটা শব্দ বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে।

জর্জ নিজেকে বিযুক্ত করল। বলল, এবার আমার কথা মতো কাজ করতে হবে। প্লীজ উল্টে শোও।

ইভ কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য এনে বলল–পোশাক পরে নাও।

-হ্যাঁ।

জর্জ উঠে দাঁড়াল। রাগ এবং হতাশায় থরথর করে কাঁপছে। ইভ তাকিয়ে থাকল। তার ঠোঁটে শয়তানি হাসি।

-এই তো ভালো ছেলের মতো কাজ করেছ, জর্জ। তোমাকে একটা পুরস্কার দেব, তোমার হাতে আমি এমন একটা রত্ন তুলে দেব, তুমি ভাবতেই পারছ না। সেই রত্নটার নাম হল আলেকজান্দ্রা!

***

রাতারাতি জীবনটা পালটে গেছে আলেকজান্দ্রার কাছে। এর অন্তরালে কী আছে সে জানে না। এত বড়ো বিজয় যে কোনোদিন হবে সে ভাবতেই পারছে না।

লাঞ্চ খেতে খেতে তারা অনেক গল্প করছিল। এখন কাজটা আরও বেশি ভালো লাগছে আলেকজান্দ্রার।

শুক্রবার সকালবেলা,ইভ টেলিফোন করেছে আলেকজান্দ্রাকে। লাঞ্চের আসরে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সে বলল –একটা ফরাসি রেস্টুরেন্ট খুলেছে। সেখানকার খাবার দারুণ।

বোনের কাছ থেকে ফোন পেয়ে আলেকজান্দ্রা খুব খুশি। আলেকজান্দ্রা প্রতি সপ্তাহে বোনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করে। কিন্তু ইভ, তার এই আমন্ত্রণে সাড়া দেয় না।

সে বলল–তোর সাথে লাঞ্চ খেতে আমার ভালোই লাগবে।

***

রেস্টুরেন্টটা ছোটো। খাবারদাবার খুবই দামী, দেখা গেল অনেকেই টেবিলের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। ইভ তার ঠাকুরমার নাম করে টেবিল অর্ডার দেয়। হ্যাঁ, এবার একটা নতুন গল্প শুরু হতে চলেছে। ইভ আর মেলিস বসেছিল, আলোকজান্দ্রা পৌঁছে গেল।

ইভ তার বোনকে আদর করল। বলল –তোকে দারুণ দেখাচ্ছে। কাজটা তোর নিশ্চয়ই ভালো লাগছে তাই তো?

ইভ জানতে চাইল।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

আলেকজান্দ্রা ইভকে সব ঘটনা খুলে বলল। ইভ তার জীবনকথা শোনাল, অবশ্যই রেখে ঢেকে। কথাবার্তার মাঝে ইভ জর্জ মেলিসের দিকে তাকাল। জর্জ এই দুই কন্যার দিকে তাকিয়ে আছে। হ্যাঁ, সে বুঝতে পারছে না, কাকে গিয়ে এখন সম্ভাষণ জানানো উচিত।

শেষ পর্যন্ত ইভ বলল –জর্জ।

জর্জ বলল –ইভ।

ইভ বলল–কী সুন্দর সন্ধ্যেটা বলো তো? আমার বোনের সঙ্গে আলাপ করো খুশী হবে। আলেক্স, এই হল আমার উপহার জর্জ মেলিস।

জর্জ আলেকজান্দ্রার হাতে হাত রেখে বলল তোমাকে দেখে আমি খুবই খুশী হয়েছি।

আলেকজান্দ্রা জর্জের পাশে বসে আছে। খুবই উৎসাহী হয়ে উঠেছে সে।

ইভ বলল তুমি কি আমাদের সঙ্গে বসবে?

-না, একটা জরুরি কাজ আছে, পরে আবার দেখা হবে।

জর্জ চলে গেল, আলোকজান্দ্রা বলল—এই ছেলেটি কে?

–নিকার বন্ধু, তার বাড়ির পার্টিতে দেখা হয়েছে।

–ওকে তো দেখতে দারুণ।

ইভ বলল –ও কিন্তু আমার মতো নয়, মেয়েদের চোখে এক আকর্ষণীয় পুরুষ।

–আমারও তাই মনে হচ্ছে। ও কি বিবাহিত?

-না, অনেকে চেষ্টা করছে। জর্জের প্রচুর পয়সা। ওর কাছে সবকিছু আছে, সুন্দর চেহারা, অঢেল অর্থ, সামাজিক প্রতিপত্তি।

বুদ্ধি করে ইভ অন্য বিষয়ে চলে গেল।

খাবারের দাম দেবার সময় ইভ জানতে পারল, মেলিস দাম মিটিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

***

আলেকজান্দ্রা শুধু জর্জ মেলিসের কথা চিন্তা করছে।

সোমবার বিকেলবেলা ইভ তাকে ফোন করে বলল –ডার্লিং, জর্জ তোর ফোন নাম্বার জানতে চাইছে, আমি কি দেব?

আলেকজান্দ্রা অবাক হয়ে গেছে–হ্যাঁ, তুই দিতে পারিস।

-আলেক্স আমি বলেছি না, ও একেবারে অন্যরকম।

–ঠিক আছে, আমার নাম্বার দিয়ে দে।

তারা দু-চারটে কথা বলল। ইভ টেলিফোন রিসিভার রেখে দিল। সে জর্জের দিকে তাকাল। জর্জ নগ্ন হয়ে বিছানাতে শুয়ে আছে। সে বলল আমার আশা কি পূরণ হয়েছে?

-হ্যাঁ।

কবে থেকে খেলাটা শুরু হবে?

***

আলেকজান্দ্রা জর্জ মেলিসকে ভুলে যাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভুলতে পারছে কই? সবসময় জর্জের কথাই মনে পড়ছে। জর্জকে একেবারে অন্য জগতের বাসিন্দা বলে মনে হচ্ছে। জর্জের মধ্যে একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। হ্যাঁ, তার হাতের স্পর্শ সমস্ত শরীরে শিহরণ জাগিয়েছিল।

এক সপ্তাহ কেটে গেল। আলেকজান্দ্রা আর থাকতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত হতাশা রাগে পরিণত হল। সে ভাবল, অন্য কাউকে নির্বাচন করতে হবে।

ফোনটা বেজে উঠল–পরবর্তী সপ্তাহে আলেকজান্দ্রা একটা সুন্দর গলার স্বর শুনতে পেল। তার সমস্ত রাগ এক লহমায় কোথায় হারিয়ে গেল।

-আমি জর্জ মেলিস বলছি, তোমার সাথে দেখা হয়েছিল, মনে আছে, আমি ফোন করলে তুমি রাগ করবে না। ইভ আমায় তাই বলেছে।

-হ্যাঁ, আমি রাগ করছি না। লাঞ্চের জন্য ধন্যবাদ।

–আর একটা খাওয়া কিন্তু পাওনা আছে। খাওয়া অথবা অন্য কিছু?

আলেকজান্দ্রা অবাক হয়ে গেছে।

-আমার সাথে একদিন ডিনার খাবে?

–হা, কবে?

–যেদিন তুমি বলবে?

আলেকজান্দ্রা বুঝতে পারল, একটা সুন্দর নিমন্ত্রণ আসতে চলেছে।

জর্জ বলল –একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্ট আছে। মালবেরি স্ট্রিটে, ভারী সুন্দর, খাবারটাও দারুণ।

-হ্যাঁ, আমি ভালোবাসি। আলেকজান্দ্রা বলল, আমার প্রিয় খাবার।

–তুমি কি জানো?

–হ্যাঁ।

জর্জ ইভের দিকে তাকাল।–হ্যাঁ, একটা সুন্দর ষড়যন্ত্র। আলেকজান্দ্রা কী ভালোবাসে এবং কী ভালোবাসে না, সব কিছুই ইতিমধ্যে জর্জ জেনে গেছে।

জর্জ রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। ইভ বুঝতে পারল, নাটকটা জমে উঠতে আর বেশি দেরী নেই।

***

এমন সুন্দর সন্ধ্যা আলেকজান্দ্রার জীবনে আর কখনও আসবে কিনা সন্দেহ। এক ঘণ্টা আগে জর্জ মেলিস সেখানে ঢুকে পড়েছে। ভারী সুন্দর গোলাপী বেলুন দিয়ে ঘরটা সাজিয়েছে। অর্কিড ফুলের সমারোহ। আলেকজান্দ্রার মনে ভয় ছিল, এই প্রথম সে কোনো এক ছেলের সাথে একলা খেতে যাচ্ছে। শেষ অব্দি তারা সেখানে গিয়ে বসল।

জর্জ বলল তুমি কী খাবে বলো?

আলেকজান্দ্রা বলল–তুমি যা খাওয়াবে।

আলেকজান্দ্রার প্রিয় পদগুলি একে একে বেছে নিল জর্জ মেলিস। আহা, জর্জ কি আমার মনের খবর জানে?

কথায় কথায় জর্জ বলল–রান্না করা আমার জীবনের অন্যতম হবি। আমার মায়ের কাছ থেকে আমি রান্না শিখেছি।

পরিবারের সকলের সাথে তুমি খুব যুক্ত। তাই না জর্জ?

জর্জ হাসল। আলেকজান্দ্রা বুঝতে পারল, এমন সুন্দর হাসি সে জীবনে কখনও দেখেনি। –আমি গ্রিস দেশের বাসিন্দা। আমরা সবাই একসঙ্গে থাকতে ভালোবাসি।

চোখের ভেতর বিষণ্নতা ওদের ছেড়ে থাকতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। আমাদের মস্ত বড়ো একটা ব্যবসা আছে। আমি খুব তাড়াতাড়ি সেখানে ফিরে যাব।

কথায় কথায় জর্জ তার ফেলে আসা দিনযাপনের অনেক গল্প শুনিয়ে দিল। জর্জের এই সরল স্বীকারোক্তি আলেকজান্দ্রাকে অবাক করে দিয়েছে। জর্জ জানতে চাইল তোমার সাথে ইভ থাকে না? ঠাকুরমার সাথে?

-না, ইভ একটা অ্যাপার্টমেন্টে একা থাকে।

আলেকজান্দ্রার ভালো লাগল না, আমার বোন সম্পর্কে এই যুবক একেবারেই উৎসাহী নয়। আলেকজান্দ্রার মনে হল স্বর্গ যেন তার হাতে চলে এসেছে।

কফির আসর–জর্জ বলল, তুমি কি জাজ শুনতে ভালোবাসো? সেন্ট মার্ক প্লেসে একটা ক্লাব আছে। ফাইভ বার্ড।

–যেখানে সিসিল টেলার বাজনা বাজান?

আলেকজান্দ্রার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে জর্জ বলল–তুমি সেখানে গেছো?

আলেকজান্দ্রা হাসছে আমার খুবই ভালো লাগে জায়গাটা। টেলার আমার খুবই প্রিয়।

-কী আশ্চর্য আমাদের সব পছন্দ এক হল কী করে?

তারা সিসিল টেলারের পিয়ানো শুনল। অসাধারণ বাজনা, মনে হল তারা বোধহয় অন্য কোথাও ভেসে গেছে।

রাত দুটো বেজেছে। বার থেকে তারা বাইরে এল। আলেকজান্দ্রা তখনও চাইছে, সুন্দর মুহূর্তটা যেন হারিয়ে না যায়।

রোলস বয়েস এগিয়ে চলেছে। জর্জ এটা ভাড়া করেছে। সে কোনো কথা বলছে না। সে শুধু আলেকজান্দ্রার দিকে তাকিয়ে আছে। দুই বোনের মধ্যে এক অসাধারণ সাদৃশ্য আছে। আহা, দুজন কি একইরকমভাবে শরীরের আরাম দিতে পারবে? আলেকজান্দ্রাকে বিছানাতে প্রত্যক্ষ করতে চাইছে জর্জ, কিন্তু কবে? কবে আলেকজান্দ্রা আবার তার বোনের মতো শিকারের আর্তনাদে বাতাস ভরিয়ে দেবে?

আলেকজান্দ্রা জানতে চাইল–তুমি কী ভাবছ?

–তোমাকে দেখছি দুচোখ ভরে।

তারপর? তারপর চোখে চোখে মিলন, শেষ পর্যন্ত জর্জ মেলিস আলেকজান্দ্রার হাতে হাত রাখল। ব্ল্যাকওয়েল ম্যানসানের কাছে গাড়িটা থেমে গেছে। জর্জ এগিয়ে এল। বলল - এই সন্ধ্যেটা তোমার ভালো লেগেছে?

-শুভরাত জর্জ, আলেকজান্দ্রা বলল।

পনেরো মিনিট কেটে গেছে। আলেকজান্দ্রার ফোন বেজে উঠেছে।

–তুমি কী জানো, এইমাত্র আমি মা-বাবাকে ফোন করে একটা দারুণ সুসংবাদ শুনিয়ে দিয়েছি। আমি বলেছি, জীবনসঙ্গিনী খুঁজে পেয়েছি। সে হল সুন্দরী আলেকজান্দ্রা। আমি আমার পরিবারের সকলকে ডেকে পাঠাব। উড়নচণ্ডী ছেলেটা যে একটা দারুণ কাজ করতে পারে, সেটা ভেবে ওরা অবাক হয়ে যাবে।

.

২৯.

জর্জ মেলিসের ফোনের জন্য আলেকজান্দ্রা অপেক্ষা করছে। কিন্তু ফোন এল না কেন? এক সপ্তাহ কেটে গেল। যখনই ফোন সশব্দে আর্তনাদ করেছে, আলেকজান্দ্রা ছুটে গেছে। সেই সন্ধ্যের কথা সে তুলতে পারেনি।

কিন্তু কেন? কী হতে পারে? হয়তো ওই ছেলেটি এখন আর আমার প্রতি আকর্ষিত নয়। হয়তো কোনো অ্যাকসিডেন্টে তার মৃত্যু হয়েছে, কিংবা সে হাসপাতালে শুয়ে আছে।

আলেকজান্দ্রা আর অপেক্ষা করতে পারছে না। সে ইভকে ফোন করল। অনেকক্ষণ ধরে কথা বলার চেষ্টা করল। তারপর বলল –ইভ, জর্জ মেলিসের কী হল? তোর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

-না, তোর সঙ্গে কথা হয়নি?

–না, গত সপ্তাহে আমরা ডিনার খেয়েছিলাম।

–তারপর দেখা হয়নি?

–না।

–তাহলে হয়তো ব্যস্ত আছে।

আলেকজান্দ্রা বলল –সম্ভবত।

জর্জের কথা ভুলে যা। একটা কানাডিয়ান ছেলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তার একটা নিজস্ব এয়ারলাইন আছে।

না, আলেকজান্দ্রা এসব খবর শুনতে রাজী নয়।

***

অ্যালিস কোপবেল প্রশ্ন করল–কাজ কেমন হচ্ছে?

-কোনো কিছু আর ভালো লাগছে না। কাজে বসলেই শুধু জর্জের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

***

পরের দিন বিকেলবেলা ফোনটা এল।

–অ্যালেক্স, আমি জর্জ মেলিস বলছি।

–তুমি কোথায়?

–আমি এখানে এসে গেছি।

আলেকজান্দ্রা বুঝতে পারছে না, সে কাঁদবে, না হাসবে।

-তোমাকে আবার ফোন করব। এথেন্স থেকে কয়েক মিনিট আগে এসেছি।

—তুমি এথেন্স গিয়েছিলে?

–হ্যাঁ, যে রাতে আমরা একসঙ্গে ডিনার খেয়েছিলাম, সেই রাতেই।

আলেকজান্দ্রার মনে পড়ল।

–স্টিভ, আমার ভাই ফোন করেছিল। বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।

–জর্জ, খুব খারাপ লাগছে এ খবর শুনে। তিনি এখন কেমন আছেন?

–তিনি ভালো হয়ে গেছেন। তিনি আমাকে গ্রিসে ফেরার জন্য বলেছিলেন। ব্যবসার দায়িত্ব নিতে হবে।

-তুমি কি চলে যাচ্ছো?

–না।

–অন্য কেউ দায়িত্ব নেবে?

–হ্যাঁ। আজ সন্ধ্যেবেলা ডিনার খাবে?

–হ্যাঁ।

তারপর? কেটির সঙ্গে কথা বলতে হবে, জর্জ ভাবল।

আলেকজান্দ্রা ফোনটা রেখে দিল। বলল সমস্ত সহকর্মীকে আজ সন্ধ্যেবেলা আমি একটা নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করতে চলেছি।

সহকর্মীরা অবাক হয়ে গেছে।

***

ম্যাকসেল ক্লামে একটা সুন্দর ডিনার। আবার কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে। ইভকে পুরো নম্বর দিতেই হবে। ইভ না থাকলে এই সুন্দর ছেলেটার সঙ্গে আমার কখনও আলাপ হত না। মনে মনে ইভকে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়ে দিল আলেকজান্দ্রা।

তারপর? ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি, চোখে চোখ, একে অন্যকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। এত সুন্দর এক মহিলা, অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে জর্জ। এই জীবনে অনেক মেয়ের

সংস্পর্শে সে এসেছে। কেউ সুন্দরী, কেউ কুৎসিত, কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র। তাদের সে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছে। কোনো না কোনো ভাবে। কিন্তু এই মেয়েটির মতো আর কেউ কি এমন অপলক চোখে তাকিয়েছে তার দিকে?

***

একটা সুন্দর অ্যাপার্টমেন্ট, সাজানো হয়েছে ভারী সুন্দর ফার্নিচার দিয়ে।

–অসাধারণ, আলেকজান্দ্রা বলছে, হ্যাঁ, আলেকজান্দ্রা সদ্য পাওয়া উপহারটা পেয়ে অবাক হয়ে গেছে। হিরের তৈরি নেকলেস।

জর্জ এগিয়ে এসে তাকে শান্ত ভাবে চুমু দিল। তারপর বুকে টেনে নিল। আলেকজান্দ্রা হয়তো এই মুহূর্তটার জন্য প্রতীক্ষা করছিল।

না, কেন এমন একটা অবস্থা হচ্ছে।

জর্জ বলল –এসো, আমি এবার আসল কাজটা শুরু করি।

সে নিজেকে উন্মুক্ত করতে শুরু করল। ইভের কথা মনে পড়ে গেল। আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রেখো, যদি আলেকজান্দ্রার মনে দুঃখ দাও, তাহলে সে তোমাকে পরিত্যাগ করবে। তুমি আর কখনও তার মুখ দেখতে পাবে না। তুমি কি তা বুঝতে পারছ? তুমি ওকে যেন বাজারের বেশ্যা বলে ভেবো না!

জর্জ আলেকজান্ড্রার শরীর থেকে পোশাক সরিয়ে দিল। তার অসাধারণ উলঙ্গতা ভালোভাবে দেখল : হ্যাঁ, ইভের মতো সুন্দর তার শরীর। পরিপূর্ণ যুবতীর সাজে সে সেজে উঠেছে। এখনই ওই শরীরটাকে লন্ডভন্ড করতে ইচ্ছে হল তার। তাকে আঘাত করতে, তার মুখ দিয়ে যেন আর্তনাদের শব্দ বেরিয়ে আসে। মনে পড়ে গেল ইভের সাবধান বাণী -আলেকজান্ড্রাকে দুঃখ দিও না। দুঃখ ও সহ্য করতে পারে না।

দুটো নগ্ন শরীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। তারা একে অন্যকে আলিঙ্গন করল। জর্জ ধীরে ধীরে আলেকজান্ড্রাকে বিছানাতে নিয়ে গেল। দেহের সর্বত্র সাবধানে চুমুর চিহ্ন আঁকতে শুরু করল। তার জিভ এখন এক বাঘবন্দী খেলা খেলছে। হাতের আঙুলগুলো আঁকছে কামনার কারুকাজ। হা, আলেকজান্ড্রার শরীরের প্রত্যেকটা রোমকূপ খাড়া হয়ে উঠেছে। সে বুঝি আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে চাইছে না।

আলেকজান্ড্রা বলল–আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমাকে গ্রহণ করো।

জর্জ তার ওপর চড়ে বসল। তারপর অসাধারণ আনন্দ। সুখ দুঃখ বেদনা মেশানেনা অনুভূতি। আলেকজান্ড্রা শুয়ে আছে। সে বলছে –ডার্লিং, আমি কি তোমার উপযুক্ত হতে পারব?

আলেকজান্ড্রা হঠাৎ কেঁদে ফেলেছে। কেন সে কাঁদছে জানে না। এটা হয়তো আনন্দের অশ্রু।

জর্জ বলল–তুমি এক অসাধারণ কন্যা এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ইভ জানতে পারলে কত না সুখী হবে।

***

প্রেমের ঘটনা শেষ হয়ে গেছে। তারপর কী থাকে? ছোটোখাটো অনুভূতি। কিন্তু জর্জ এবং আলেকজান্দ্রার বেলায় এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। ইভের প্রশিক্ষণে জর্জ অনেক প্রাজ্ঞ হয়ে উঠেছে। সে আলেকজান্দ্রার প্রত্যেকটা আবেগ নিয়ে সুন্দর খেলা খেলছে। এমন কিছু করছে না যাতে আলেকজান্দ্রা কষ্ট পেতে পারে। সে জানে, কীসে আলেকজান্দ্রার মনে আনন্দ হয়, কোন ঘটনা তাকে দুঃখ দেয়। আলেকজান্দ্রা তার ভালোবাসার ধরন দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, এই পৃথিবীতে বুঝি একমাত্র জর্জই তার জীবনসঙ্গী হতে পারে।

জর্জ কথা বলছে সুন্দর ভাবে। কথার মধ্যে কোনো আহাম্মকি নেই।

জর্জ তার ধর্ষকামী মনোভাবকে পরিত্যাগ করেছে। হ্যাঁ, এই মেয়েটিকে সে যন্ত্রণা দেবে না।

জর্জ বুনো স্বভাবটাকেও দূরে সরিয়ে রেখে এসেছে। এভাবেই মেয়েটিকে জয় করতে হবে। তারপর?

***

জর্জের ব্যবহারে আলেকজান্দ্রা সত্যি অবাক হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত আলেকজান্দ্রা ঠিক করল, জর্জকেই বিয়ে করতে হবে। জর্জকে না পেলে সে বেঁচে থাকবে না।

***

ইভের সাথে একরাতে কথা হচ্ছে। ইভ বলল–বিয়ের প্রস্তাবটা ভালো কিন্তু দেখো, তুমি আবার গলে যেও না যেন।

জর্জ জানতে চাইল–আলেকজান্দ্রাকে সত্যি আমাদের দরকার।

-হ্যাঁ, আলেকজান্দ্রা না এলে কোটি টাকার সম্পত্তিটা হাতছাড়া হয়ে যাবে।

***

আলেকজান্দ্রাকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন আর কথা বলতে পারছে না। এই প্রথম তারা এক সঙ্গে ডিনার খেতে বেরিয়েছে। জর্জ, কেটি এবং আলেকজান্দ্রা। আলেকজান্দ্রা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে ঠাম্মার চোখে যেন কোনো ভুল ধরা না পড়ে।

কেটি কখনও তার নাতনিকে এত খুশিয়াল দেখেননি। আলেকজান্দ্রা এর আগে বেশ কয়েক জন যুবকের সংস্পর্শে এসেছিল, কিন্তু কেউ তাকে এতটা অধিকার করতে পারেনি।

জর্জ মেলিসের সাথে দেখা হবার পর কেটির ভালোই লেগেছে। কেটির মনে হচ্ছে, ছেলেটি খুব একটা খারাপ নয়।

তারপর? এক সুন্দর সন্ধ্যা, সকলেই গল্প করছে।

শেষ পর্যন্ত জর্জ মেলিস বলল –মিসেস ব্ল্যাকওয়েল, আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলতে চাইছি না। আমি এক স্বাধীনচেতা মানুষ। আমি কারোর সাহায্য গ্রহণ করি না। আমি মেলিস অ্যান্ড কোম্পানির অন্যতম স্বত্তাধিকারী। কিন্তু সেই কোম্পানিটা আমার ভালো লাগে না। যেহেতু এটা আমার ঠাকুরদাদা তৈরি করেছিলেন, বাবা এটাকে বাড়িয়েছেন, তাই আমি এটাকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করতে চাইছি। আমি একটা চাকরি পেলেই সন্তুষ্ট।

কেটি মাথা নাড়লেন –হ্যাঁ, এই লোকটা খুব একটা খারাপ নয়। কিন্তু এ কি আমার নাতনির উপযুক্ত বর হতে পারবে?

কেটি শেষ পর্যন্ত বললেন বুঝতে পারছি তোমার পরিবার খুবই ধনী।

মিসেস ব্ল্যাকওয়েল, টাকাটা অবশ্যই দরকার লাগে, কিন্তু এছাড়া আরও অনেক কিছু আছে, যা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কেটি নেটওয়ার্কে মেলিস অ্যান্ড কোম্পানির অবস্থান জেনে নিয়েছেন। সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুসারে এই কোম্পানির ব্যবসা তিনকোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

–মি. মেলিস, পরিবারের সাথে তোমার সম্পর্ক কেমন?

জর্জের মুখে আলোকছটা হয়তো খুবই গভীর। আমরা একই পরিবারভুক্ত হয়ে বাস করতে ভালোবাসি।

কেটি বললেন–হ্যাঁ, এটাই তো হওয়া উচিত।

কেটি তার নাতনির দিকে তাকালেন। আলেকজান্ড্রার চোখে মুখে একটা অদ্ভুত প্রত্যাশা। তার মানে? এই ছেলেটিকে পেলে সে হয়তো সুখী হবে।

ডিনারে আরও কিছু কথা হল। কেটি একের পর এক প্রশ্ন করেই চলেছেন। একবার তিনি জানতে চাইলেন, মেলিস, ছেলেমেয়ে তোমার কেমন লাগে?

ইভের কথা মনে পড়ে গেল বুড়ি শয়তানিটা চাইছে তার নাতনির যেন ছেলে পুলে হয়।

জর্জ কেটির দিকে তাকিয়ে বলল–ছোট্ট ছেলে? ছেলেমেয়ে ছাড়া জীবন তো পরিপূর্ণ হয় না। আমি যখন বিয়ে করব, আমার বউটা শুধু ছেলেমেয়ের জন্ম দিতে ব্যস্ত থাকবে।

হ্যাঁ, কেটির মনে হল, এই ছেলেটাকে উপযুক্ত জামাই করা যেতে পারে।

***

আলেকজান্ড্রা বিছানায় শোবার আগে ইভকে ফোন করল। ইভকে জানাল–জর্জ মেলিসকে ডিনারে ডাকা হয়েছে।

ইভ সব কিছু শুনে বলল –ভারী ভালো লাগছে, সব খবর আমাকে জানাবি কিন্তু?

-ঠাকুরমা বোধহয় ছেলেটিকে ভালোবেসেছে।

ইভের মনে আনন্দ–কী করে বুঝলি?

-ঠাকুরমা অনেক প্রশ্ন করছিল।

ইভ শুনে অবাক হল –জর্জ ব্যাপারটা ভালোভাবে সামলে দিয়েছে।

***

পরের দিন সকালবেলা কেটি অফিসে এসেছেন। বললেন ব্রাড রজারসকে ডেকে পাঠাও। জর্জ মেলিস সম্পর্কে একটা রিপোর্ট তৈরি করতে হবে।

–মি. রজারস কালকে আসবেন, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল, একটু অপেক্ষা করা যেতে পারে।

–হা, ঠিক আছে।

***

ওয়াল স্ট্রিটের ম্যানহাট্রান, জর্জ মেলিস তার ডেস্কে বসে আছে। হ্যাঁনসান অ্যান্ড হ্যাঁনসান কোম্পানিতে স্টক এক্সচেঞ্জ খুলে গেছে। বিরাট অফিসে মানুষের কণ্ঠস্বর। ২২৫ জন সদস্য কাজ করছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আছেন।

একটা ফোন বেজে উঠেছে। জর্জ মেলিস ফোনটা ধরলেন, চেনা স্বর। কিছু কথা বলা হল।

খুব এখন ব্যস্ত হয়ে গেছে সে। হেলেন থ্যাচারের সঙ্গে দেখা হল। বছর চল্লিশ বয়সের এক বিধবা। চেহারাটা আকর্ষণীয়। রান্নার হাত চমৎকার। তেইশ বছর ধরে বিবাহিত জীবন যাপন করেছেন। স্বামীর মৃত্যু তার জীবনে একটা শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। কোনো এক পুরুষের সাহচর্য চাইছেন। কিন্তু হ্যাঁনসান অ্যান্ড হ্যাঁনসানে যারা কাজু করে, তাদের কাউকেই মনে ধরছে না।

উনি জর্জ মেলিসের ওপরতলায় অ্যাকাউন্ট বিভাগে কাজ করেন। হেলেন জর্জকে দেখেছেন। তখন থেকেই মনে হয়েছে, এই ছেলেটি তার উপযুক্ত স্বামী হতে পারে। একদিন সকালবেলা দুজনের মধ্যে কথা হল। জর্জ মেলিসের কণ্ঠস্বরে এক অদ্ভুত মাদকতা। হ্যাঁ, দুজনে দুজনকে আকর্ষণ করতে চাইলেন। বারবার ফোন বেজে উঠেছে। শেষ অব্দি দুজনের দেখা হল।

জর্জ আবার কাজ করতে শুরু করল। তাকে এখন অনেক কিছুর ভান করতে হবে। তার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়েছে। কাকে সে জীবনে গ্রহণ করবে, সেটা ঠিক হয়ে গেছে।

জর্জ একটা ঘরে গিয়ে বসল। ঘরটা তিরিশ ফুট লম্বা, পনেরো ফুট চওড়া। স্টক সার্টিফিকেট আছে, প্রত্যেকটা কোম্পানির শেয়ার রয়েছে।

প্রহরী বলল –আপনি কতক্ষণ থাকবেন?

জর্জ মাথা নেড়ে বলল –কমপিউটারগুলো খারাপ হয়ে গেছে। সেগুলো ঠিক করতে হবে।

প্রহরী দাঁত কিড়মিড় করে বলল–কমপিউটারগুলোর হয়েছে এই অবস্থা।

জর্জ তার ডেস্কে ফিরে গেল। হ্যাঁ, তার সমস্ত শরীরে ঘাম। সে টেলিফোন তুলে । আলেকজান্দ্রার সাথে কথা বলল।

-ডার্লিং, তোমাকে আর তোমার ঠাকুরমাকে দেখতে চাইছি।

-তোমার ব্যবসার কাজ আছে কি?

–হ্যাঁ, কিন্তু সেটা আমি বাতিল করেছি। একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর দেব।

***

দুপুর একটা, জর্জ হেলেন থ্যাচারের অফিসে পৌঁছে গেছে। হেলেন তার জন্য রেস্টুরেন্টে অপেক্ষা করছিল। জর্জ দেখা করার চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত দেখা হয়ে গেল। জর্জ বলল -কালকে লাঞ্চ খাবার সময় হবে?

হেলেনের মুখে হাসি–হ্যাঁ, কাল আমি আসব।

***

বিকেলবেলা জর্জ মেলিস অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছে। তার সঙ্গে স্টক সার্টিফিকেট আছে। অন্তত দশ লক্ষ ডলারের। সবটাই চুরি করা।

সে ব্ল্যাকওয়েল হাউসে সাতটার সময় পৌঁছে গেল। লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখল, কেটি এবং আলেকজান্দ্রা বসে আছে।

জর্জ বলল আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে এসেছি। মিসেস ব্ল্যাকওয়েল, আপনার অনুমতি পেলে আমি আপনার নাতনিকে বিয়ে করতে পারব। আমি আলেকজান্দ্রাকে ভালোবাসি এবং আমি বিশ্বাস করি, ও আমাকে ভালোবাসে। যদি আপনি আশীর্বাদ করেন, তা হলে আমাদের বিবাহিত জীবনটা ভালোই কাটবে।

সে পকেটে হাত ঢোকাল। একটা স্টক সার্টিফিকেট বের করে টেবিলে রাখল। তারপর বলল আমি তাকে দশ লক্ষ ডলার উপহার দিতে চাইছি। সে যাতে কোনোদিন আপনার টাকার জন্য বসে না থাকে, তাই এই ব্যবস্থা। কিন্তু আমরা আপনার আর্শীবাদ চাইছি।

কেটি অবাক হয়ে তাকালেন, হ্যাঁ, এই সার্টিফিকেটগুলোর দিকে। তিনি প্রত্যেকটা কোম্পানির নাম জানেন।

আলেকজান্দ্রা অবাক হয়ে গেছে –ডার্লিং! সে ঠাকুরমার দিকে তাকাল।

কেটি দুজনের দিকে তাকালেন। না, এই প্রস্তাবটা তিনি কী করে প্রত্যাখ্যান করবেন। তিনি বললেন আমি আশীর্বাদ করছি।

জর্জ কেটির কাছে এগিয়ে গেল। সে কেটির চিবুকে একটা চুমু এঁকে দিল।

পরবর্তী দু ঘণ্টা ধরে তারা উত্তেজিতভাবে নানা বিষয় নিয়ে গল্প করছিল। বিশেষ করে আসন্ন বিয়ের উৎসব।

আলেকজান্দ্রা বলল –ঠাম্মা, হৈ-চৈ হবে তো।

জর্জ বলেছিল–হ্যাঁ, আমি কিন্তু খুব একটা হৈ-হুঁল্লোড় করতে চাইছি না। বিয়েটা গোপনে হওয়াই উচিত।

সপ্তাহের শেষে তারা ঠিক করল, একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান করা হবে।

-তোমার বাবা কি আসবেন? কেটি জানতে চেয়েছিলেন। জর্জ হেসেছিল। বাবাকে আপনি বাদ রাখতে পারবেন না। আমার বাবা, আমার তিনজন ভাই এবং দুজন বোন, সকলেই আসবে।

-ওদের সঙ্গে দেখা হবার জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে আছি।

–হ্যাঁ, আমি জানি।

কেটি সমস্ত সন্ধ্যে ধরে দারুণ আপ্লুত ছিলেন। হ্যাঁ, নাতনির জন্য গর্ববোধ হতেই পারে। জর্জ চলে গেল। আলেকজান্দ্রা এখন একেবারে একা। তবে একটুখানি সময় জর্জের সঙ্গে কাটিয়েছিল। বলেছিল তুমি এই শেয়ার সার্টিফিকেটগুলো এখানে রেখো না। আমাকে দাও, আমি সেফ ডিপোজিট বক্সে রেখে দেব।

জর্জ সার্টিফিকেটগুলো নিয়ে আবার জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল।

***

পরের দিন সকালবেলা। জর্জ হেলেন থ্যাচারের কাছে পৌঁছে গেল। এই মেয়েটির সাহায্যে সে ওই সার্টিফিকেটগুলো বের করেছিল। এখন আবার হেলেনের কাছ থেকে অ্যাডড্রেস কার্ড নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় সার্টিফিকেটগুলো রেখে এল। হেলেন উন্মুখ হয়েছিল লাঞ্চে যাবে বলে।

জর্জ বলল আমি দুঃখিত হেলেন। আমি বিয়ে করতে চলেছি।

***

তিনদিন বাদে বিয়ের অনুষ্ঠান। জর্জ ব্ল্যাকওয়েল হাউসে এসে নেমেছে। তার মুখে বিষণ্নতার ছাপ। একটা ভীষণ খারাপ খবর আছে। বাবার আবার আর্ট অ্যাটাক হয়েছে।

কেটি জানতে চাইলেন –আমি খুব দুঃখিত। উনি ঠিক আছেন তো?

-হ্যাঁ, আমি সমস্ত রাত ফোনে কথা বলেছি। তাঁরা বোধহয় বিয়েতে আসতে পারবেন না।

-ঠিক আছে। আমরা হনিমুনে এথেন্সে যাব। আলেকজান্দ্রা বলেছিল।

জর্জ মাথা নাড়ল আমার অন্য পরিকল্পনা আছে। কোনো পারিবারিক উৎসব নয়। শুধু তুমি আর আমি।

***

বিয়ের অনুষ্ঠানটা ড্রয়িংরুমে হল। জনা দশেক অতিথিকে বলা হয়েছিল। আলেকজান্দ্রার বান্ধবীরাও ছিল। হ্যাঁ, আলেকজান্দ্রা চেয়েছিল, ইভ যেন এই বিয়ের অনুষ্ঠানে আসে।

কেটি বলেছেন –না, এই বাড়িতে তোমার বোনের পদার্পণ কখনও ঘটবে না।

আলেকজান্দ্রার চোখে জল ঠাম্মা, তুমি এত নিষ্ঠুর কেন? আমি তোমাদের দুজনকে ভালোবাসি। তুমি কি তাকে ক্ষমা করতে পারো না?

এক মুহূর্তের জন্য কেটি ভেবেছিলেন, পুরো গল্পটা শুনিয়ে দিতে, কিন্তু তিনি নিজেকে সংবরণ করে বললেন–না, আমি যা করছি ভালোর জন্যই।

একজন ফটোগ্রাফার ছবি তুলে নিল। কেটি শুনলেন জর্জ কতগুলো অতিরিক্ত প্রিন্টের জন্য বলেছে। পরিবারে পাঠাতে হবে।

কেক কাটার অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল। জর্জ আলেকজান্দ্রার কানে কানে বলল –ডার্লিং, কী যে ভালো লাগছে? কিন্তু আমাকে দু-এক ঘণ্টার জন্য অদৃশ্য হতে হবে।

-কোনো গোলমাল?

–না, কিছু দরকারী কাজ আছে। বেশীক্ষণ লাগবে না। আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। আলেকজান্দ্রার মুখে হাসি–তাড়াতাড়ি এসো। হনিমুনের পরিকল্পনা করতে হবে।

***

জর্জ ইভের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে গেছে। ইভ একটা পাতলা রাত পোশাক পরে তারই অপেক্ষায় বসে আছে।

সে বলল –ডার্লিং, বিয়েটা কেমন হল?

–সুন্দর ছিমছাম অনুষ্ঠান।

জর্জ, সব কিছু আমার জন্য, কাউকে বলবে না তো?

জর্জ ইভের দিকে তাকিয়ে বলল কোনো দিন না।

–আমরা কিন্তু এই ব্যবসার অংশীদার।

–অবশ্যই।

ইভ বলল –এসো, তুমি তাহলে আমার ছোটোবোনকে বিয়ে করলে।

জর্জ তার দিকে তাকিয়ে বলল–আমি এখনই ফিরে যাচ্ছি।

-এখন যেও না।

–কেন?

–আগে আমাকে আদর করো। তারপর আমার বোনের কাছে যাবে। তোমার কী ভাগ্য বলো তো? একসঙ্গে দুই যমজ মেয়ের সাথে সঙ্গম করতে পারছ।

.

৩০.

ইভ হনিমুনের পরিকল্পনা করে রেখেছিল। ব্যাপারটা খরচের। কিন্তু করতেই হবে। সে জর্জকে বলল, সব কিছু তোমার ওপর নির্ভর করছে। পরিকল্পনাটা কিন্তু অসাধারণ হয়েছে।

***

সত্যি কোথাও কোনো খুঁত নেই। জর্জ এবং আলেকজান্দ্রা মন্টেগো বে রাউন্ড হিলে পৌঁছে গেছে। জামাইকার উত্তরে অবস্থিত। হোটেলটা সুন্দর। বাংলোতে দাঁড়ালে দূরের আকাশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। দেখতে পাওয়া যায় সমুদ্রের অনন্ত জলরাশিকে। নীচে একটা সুন্দর বাংলো আছে।

পঞ্চম দিন। জর্জ বলল –অ্যালেক্স, আমি একটু কিংসটনে যাব। আমার ফার্ম এখানে একটা ব্রাঞ্চ অফিস খুলতে চলেছে।

আলেকজান্দ্রা বলল–আমি কি তোমার সঙ্গে যাব?

-না, তোমার যাওয়া হয়তো উচিত হবে না। তুমি এখানে থাকো। একটা ফোন আসবে। তোমায় সেটা ধরতে হবে।

-কেন? ডেস্কে বললেই তো হয়?

–না, ফোনটা খুবই দরকারী। আমি কাউকে বিশ্বাস করি না।

–ঠিক আছে, আমি থাকব।

জর্জ একটা গাড়ি ভাড়া করে কিংসটনের দিকে চলে গেল। সন্ধ্যে হয়েছে যখন সে কিংসটনে পৌঁছে গেছে। রাজধানী শহরে অনেক মানুষের ভিড়। কিংসটন হল ব্যবসার শহর। এখানে তৈল শোধনাগার আছে। ওয়্যার হাউস আছে। মৎস্যকেন্দ্র আছে।

জর্জ কিছুই দেখবে না। তাকে এখন একটা অন্য কাজ করতে হবে। সে একটা বারে ঢুকে পড়ল। বারটেনডারের সঙ্গে কথা বলল। বছর পনেরোর এক কালো বেশ্যার সাথে গল্প জুড়ে দিল। তারপর চলে গেল সস্তার হোটেলে। সেখানে ওই বেশ্যাটার সঙ্গে দুঘণ্টা কাটাল। জর্জ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এবার তাকে মন্টেগো বে-তে ফিরে আসতে হবে। হ্যাঁ, আলেকজান্দ্রা হয়তো ওই ফোনটা পেয়ে গেছে।

পরের দিন সকালবেলা কিংসটনের খবরের কাগজে একটা খবর বেরিয়েছে। চারজন ট্যুরিস্ট এসে এক বারাঙ্গনার ওপর অত্যাচার করেছে। মেয়েটি প্রায় মরতে বসেছিল।

***

হ্যানসান অ্যান্ড হ্যানসানের অফিস। সিনিয়ার পার্টনাররা বসে জর্জ মেলিস সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। একজন সদস্যের কাছ থেকে একটা অভিযোগ এসেছে। তার অ্যাকাউন্টে কিছু গোলমাল দেখা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করা হল জর্জকে আর চাকরিতে রাখা হবে না। কিন্তু এখন আর একটা চিন্তা এসে গেছে।

একজন বললেন জর্জ কেটি ব্ল্যাকওয়েলের নাতনিকে বিয়ে করেছে। ব্যাপারটা এখন নতুন ভাবে ভাবতে হবে।

আর একজন পার্টনার বললেন–হ্যাঁ, ব্ল্যাকওয়েলের অ্যাকাউন্টটা আমাদের এখানে আসতে পারে।

তার মানে? জর্জ মেলিসকে আর একটা সুযোগ দেওয়া হোক।

***

আলেকজান্দ্রা এবং জর্জ তাদের হনিমুন সেরে ফিরে এসেছে।

কেটি বললেন এই বাড়িতে তোমরা থাকে। তাহলেই ভালো হবে।

জর্জ বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু আমার মনে হয়, আমি আর অ্যালেক্স যদি অন্য জায়গায় থাকি তাহলেই ভালো হয়।

জর্জ এই বুড়ি শয়তানির সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে চাইছে না। তাহলে তার গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হবে।

কেটি বললেন আমি বুঝতে পারছি, তাহলে আমি তোমাদের জন্য একটা বাড়ি কিনে দেব। সেটাই হবে আমার বিয়ের উপহার।

জর্জ কেটির হাতে হাত রেখে বলল ঠিক আছে, এতে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি এবং অ্যালেক্স আপনার উপহার মাথায় পেতে নেব।

আলেকজান্দ্রা বলল –ঠাম্মা, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। দেখো, জায়গাটা যেন বেশি দূরে না হয়।

***

এক সপ্তাহের মধ্যে, তারা একটা পুরোনো বাড়ি পেয়ে গেল। পার্কের পাশে, খুব একটা দূরে নয়। ভারী সুন্দর বাড়িটা।

জর্জ আলেকজান্দ্রাকে বলল –এসো, তুমি এই বাড়িটা মনের মতো করে সাজাও।

জর্জ এখন বেশির ভাগ সময় তার অফিসে কাটায়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে সে ব্যস্ত থাকে। ইতিমধ্যে পুলিশের কাছে বেশ কয়েকটা খবর এসে পৌঁছে গেছে। এই শহরে যেসব বারবনিতারা একা একা বার কিংবা হোটেলে যায়, তাদের বারে বারে অপমানিত হতে হচ্ছে। তাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন করা হচ্ছে। যে আক্রমণ করে সে সুভদ্র

চেহারার এক পুরুষ, সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষ। কোনো বিদেশী রাষ্ট্র থেকে এসেছে। এই লোকটিকে এখনও পর্যন্ত চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি।

***

ইভ এবং জর্জ একটা ছোটো টাউন রেস্টুরেন্টে বসে লাঞ্চ খাচ্ছে। এখানে কেউ তাদের চিনতে পারবে না।

–অ্যালেক্সের সাথে তুমি কেমন ব্যবহার করছ? ঠাকুরমা কিছু বুঝতে পারছে না তো?

–না, এ বিষয়ে তোমার কোনো চিন্তা নেই।

–ডার্লিং এবার পরবর্তী পদক্ষেপটা ভাবতে হবে।

***

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা জর্জ এবং আলেকজান্দ্রা একটা হোটেলে খেতে বসেছে। নিউইয়র্কের অন্যতম সেরা ফরাসি রেস্টুরেন্ট। মাত্র তিরিশ মিনিট দেরী হয়েছে জর্জের আসতে।

এই হোটেলের মালিকের নাম পিয়েরে জর্ডন। তিনি আলেকজান্দ্রার দিকে এগিয়ে গেলেন। জর্জও সেখানে পৌঁছে গেল।

জর্জ বলল–আমি অ্যার্টনির কাজে ব্যস্ত ছিলাম। সব ব্যাপারটা গোলমাল হয়ে গেছে।

-কোন গোলমাল জর্জ?

-না, আমার ইচ্ছে পত্রটা তৈরি করতে হবে। আমার যা কিছু আছে, আমি সব তোমাকে দিতে চাইছি।

-না, আমি কিছু চাইছি না।

–তোমাদের সম্পত্তির সাথে তুলনাই হয় না। কিন্তু আমার টাকাটা পেলে তোমার জীবন ভালো ভাবেই কেটে যাবে।

অ্যালেক্স অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। তারপর বলল–তুমি এখন থেকে চিন্তা করছ কেন?

-হ্যাঁ, এখন থেকে ভাবতে হবে বৈকি।

অ্যালেক্স বলল–আমিও আমার সব কিছু তোমার হাতে তুলে দেব।

জর্জ বলল –অ্যালেক্স, আমি তোমার সম্পত্তি চাই না। তুমি শুধু সারা জীবন আমাকে ভালোবেসো, কেমন?

***

এক সপ্তাহ কেটে গেছে। জর্জ ইভের সাথে দেখা করেছে তার অ্যাপার্টমেন্টে। ইভ জানতে চাইল অ্যালেক্স কি নতুন উইলে সই করেছে?

-আজ সকালে, সে তার সমস্ত সম্পত্তি আমাকে দিয়ে দেবে।

***

পরের সপ্তাহ, ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেডের ৪৯ শতাংশ শেয়ার আলেকজান্দ্রার হাতে সমর্পণ করা হয়েছে। জর্জ ফোনে ইভকে এই খবরটা জানিয়ে দিল।

ইভ বলল–আজ রাতে এসো। আমরা একসঙ্গে পালন করব।

-না, আজ কেটি একটা জন্মদিনের পার্টির আয়োজন করেছেন। অ্যালেক্সের জন্য। এক মুহূর্তের নীরবতা। কোথায় খাওয়া দাওয়া হবে?

–আমি জানি না, হয়তো নরকে। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো।

লাইনটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

***

জর্জ পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে ইভকে ফোন করল–তুমি কেন মেনুর ব্যাপারে চিন্তা করছ? তোমাকে তো এই পার্টিতে বলা হয়নি। হ্যাঁ, অনেক মেনুই হচ্ছে।

-জর্জ, তোমার সাথে রাতে দেখা হবে?

–না, ইভ। আজ আমি খুব ব্যস্ত থাকব।

–তুমি অন্য কিছু ভাবছ কি?

জর্জ বোধহয় অন্য কিছু চিন্তা করছে। জর্জ ফোনটা নামিয়ে রাখল। আজ রাতে তার সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ ক্লায়েন্টের কথা হবে, কিন্তু ইভকে এইভাবে প্রতারণা করা হয়তো উচিত হয়নি।

***

বাবাকে সে বিয়ের নেমন্তন্ন পাঠিয়েছিল। ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক উত্তর দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। হ্যাঁ, সারা পৃথিবী আমাকে সম্মান জানাচ্ছে। সেখানে পরিবার যদি না জানায়, তাহলে কী বা হবে?

***

আলেকজান্দ্রার তেইশতম জন্মদিন। পার্টিটা খুবই জমে গেল। চল্লিশ জন অতিথিকে বলা হয়েছিল। আলেকজান্দ্রা চেয়েছিল, জর্জ যেন তার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু জর্জ বন্ধু পাবে কোথায়? সে তো একা থাকতেই এই শহরে এসেছে।

আলেকজান্দ্রা মোমবাতি নিভিয়ে দিল। কেক কাটল। একটা শুভ চিন্তা-কেটি তাকিয়ে আছেন। ভাবছেন, প্রথম বিবাহ বার্ষিকীর কথা মনে পড়ছে। ডেভিড আমাকে একটা নেকলেস দিয়েছিল। বলেছিল সে আমাকে কত ভালোবাসে।

জর্জ ভাবছে নেকলেসটার দাম অনেক হবে। এই সুন্দর নেকলেস, আহা কবে আমার হস্তগত হবে।

কেটির উপহার। কতদিন আর আলেকজান্দ্রা গলায় ঝুলিয়ে রাখবে।

আলেকজান্দ্রার কয়েকজন বান্ধবী তার দিকে তাকিয়ে আছে। হাসছে। জর্জ এটা ভালোভাবেই বুঝতে পারছে, ওরা হল শয়তানির মতো। জর্জ ভাবল, কিন্তু ওদের কাউকে দখল করতেই হবে। আলেকজান্দ্রার সাথে এদের তুলনা হয় না একথা সত্যি। তাহলে? তাদের কেউ যদি পুলিশে খবর দেয়? তাহলে কী হবে?

দশটা বাজতে চলেছে। জর্জ টেলিফোনের কাছে চলে গেল। সে ফোন করার চেষ্টা করল।

না, ফোনটা বেজে উঠেছে।

–হ্যালো?

মি. মেলিস?

–এটা হল আপনার আনসারিং সার্ভিস। আপনি বলেছিলেন দশটার সময় ফোন করতে।

আলেকজান্দ্রা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। জর্জ আলেকজান্দ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে ফোনে বলল–আমি এখনই বেরিয়ে পড়ব। ওনার সাথে প্যান অ্যামি ক্লিপারস ক্লাবে দেখা হবে।

জর্জ রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

–কী হয়েছে, ডার্লিং?

জর্জ আলেকজান্দ্রার দিকে তাকাল আমার এক পার্টনার সিঙ্গাপুরে যাবে। সে অফিসে গুরুত্বপূর্ণ কনট্র্যাক্ট কাগজ ফেলে এসেছে। সেগুলো নিতে হবে। আমাকে যেতে হচ্ছে। তার সাথে দেখা করব, এয়ারপোর্টে গিয়ে।

-এখন? আলেকজান্দ্রার মুখ ভার। অন্য কাউকে পাঠালে হয় না?

-না, গুরুত্বপূর্ণ কাগজ। আমাকে যেতেই হবে। জর্জ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তুমি পার্টিতে চলে যাও। আমি এখুনি ফিরে আসছি।

আলেকজান্দ্রা হাসি এনে বলার চেষ্টা করল –ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু।

জর্জ এখন ইভের সঙ্গে দেখা করবে। জন্মদিনের সন্ধ্যেটা কেমন করে কাটাচ্ছে?

ইভ দরজা খুলে দিল। জর্জের দিকে তাকিয়ে বলল শেষ পর্যন্ত আসতে পারলে? তুমি তো খুব চালাক দেখছি।

-হ্যাঁ, আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। অ্যালেক্স কিন্তু অপেক্ষা করছে।

–ভেতরে এসো ডার্লিং। তোমার জন্য একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে।

ইভ ছোট্ট ডাইনিং রুমে পৌঁছে গেল। টেবিলে দুজনের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা। হয়েছে। ভারী সুন্দর সাজানো হয়েছে।

-কী জন্য? আমার জন্মদিন জর্জ।

–আমি জানি, জর্জ বলল, আমি কিন্তু কোনো উপহার আনতে পারিনি।

ইভ বলল তোমার উপহার হল ভালোবাসা। সেটা আমি পরে নেব, এখন চুপটি করে বসো।

জর্জ বলল–আমি খেয়ে এসেছি। এখন কিছু খেতে পারব না।

–বসো তো।

ইভের কণ্ঠস্বরে কর্তৃত্ব।

জর্জ তাকিয়ে দেখল ডিনারের সব পদ সাজানো হয়েছে। যেমনটি করা হয়েছে আলেকজান্দ্রার আসরে।

ইভ বলল –অ্যালেক্স আর আমি সব কিছু ভাগাভাগি করতেই ভালোবাসি। আজ রাতে আমি তার জন্মদিনের ডিনারটা ভাগ করে খাচ্ছি। আগামী বছর থেকে একটাই পার্টি হবে। সেই সময়টা এসে গেছে ডার্লিং। আমার বোনের একটা অ্যাকসিডেন্ট হবে। সেই খবর পেয়ে বুড়ি ঠাকুরমার মৃত্যু হবে। সব কিছু আমরা হাতে পাব, জর্জ, এবার বেডরুমে এসো। আমাকে জন্মদিনের উপহার দেবে না?

জর্জ এখন এখান থেকে বেরোতে পারলে বাঁচে। সে যথেষ্ট শক্ত সমর্থ মানুষ। কিন্তু ইভ তার ওপর অধিকার বিস্তার করার চেষ্টা করছে। তাকে নপুংসক অবস্থায় পরিণত করেছে। ইভ ধীরে ধীরে নিজের পোশাক খুলে ফেলল। তাকে উলঙ্গ করে সামনে দাঁড় করিয়ে রাখল। যাতে তার লিঙ্গটি উত্থিত হতে পারে এমন ব্যবস্থা করল।

ইভ বলল–তা হলে ডার্লিং কেমন লাগছে তোমার? তোমার রতি তৃপ্তি হয় না কেন বলো তো? তুমি জানো কেন? তুমি মেয়েদের ভালোবাসো না। সত্যি ভালোবাসো জর্জ? তুমি তাদের আঘাত করে আনন্দ পাও। তুমি আমাকেও আঘাত করতে চাও। বলো সত্যি কিনা?

–আমি তোমাকে মেরে ফেলতে চাই।

ইভ হাসল তোমার এই ইচ্ছেটা কখনও পূর্ণ হবে না। কারণ তুমি কোম্পানিটাকে মুঠোবন্দী করতে চাইছ। তুমি কখনও আমাকে আঘাত করতে পারবে না জর্জ। যদি আমার কিছু ঘটে যায়, তাহলে আমার এক বন্ধু সব কথা জানিয়ে পুলিশকে চিঠি দেবে।

জর্জ বিশ্বাস করতে পারছে না।–তুমি মিথ্যে বলছ।

অনেকক্ষণের নীরবতা।

-না, এভাবে তোমাকে জব্দ করতে হবে।

সত্যিটা কি বলবে? আমি ওকে আঘাত করে আনন্দ পাব। হ্যাঁ, আমি ধর্ষকামী, এবার শুরু হল জর্জের অকথ্য অত্যাচার। সে বারবার ইভকে আঘাত করতে শুরু করল। মারের চোটে তার হাতে পায়ে দাগ পড়ে গেল। হ্যাঁ, কনুই ভেঙে গেছে, যন্ত্রণাতে ইভ কাতরাচ্ছে। চিৎকার করে বলছে আর আমাকে মেরো না, তোমার পায়ে পড়ি।

জর্জ শুনছে না। ইভের সমস্ত শরীরে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাকা লাগিয়ে দিল। ইভের মনে ভয় ঢুকেছে। সে নিজেকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত সে বলল এখনই ডাক্তারকে ফোন করো। ডঃ হার্টলে, জন হার্টলে।

***

জর্জ মেলিস বলল –আপনি কি এখুনি আসতে পারবেন? ইভ ব্ল্যাকওয়েলের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

জন হার্টলে ঘরের ভেতর প্রবেশ করলেন। ইভের দিকে তাকালেন। সমস্ত শরীরে রক্ত। বিছানাতে রক্তের দাগ। হায় ঈশ্বর, তিনি ইভের নাড়ির স্পন্দন অনুভব করে জর্জকে বললেন -এখনই পুলিশকে ডাকতে হবে। অ্যাম্বুলেন্স আনতে হবে।

ইভ বিড়বিড় করে বলছে –জন, দোহাই পুলিশকে কিছু জানাবেন না। তাহলে আমি মুখ দেখাতে পারব না।

ডাক্তার হার্টলে ফোনের কাছে গিয়ে বললেন আমি ডঃ হার্টলে বলছি। এখুনি এখানে একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে হবে। দেখুন তো ডঃ কেট ওয়েস্টার আছেন কিনা? উনি যেন এখুনি হাসপাতালে চলে আসেন। একটা এমারজেন্সি অপারেশন হবে।

তারপর একটুখানি কী যেন শুনে উনি বললেন –হ্যাঁ, রাস্তাতে একটা ট্রাক ধাক্কা দিয়ে চলে গেছে।

–অনেক ধন্যবাদ ডক্টর, জর্জ বলল।

ডঃ হার্টলে আলেকজান্দ্রার স্বামীর দিকে তাকালেন। তার চোখে জিজ্ঞাসা। জর্জের সমস্ত জামাকাপড়ে রক্তের দাগ। বুঝতে পারা যাচ্ছে, রক্তটা টাটকা। মুখে এবং হাতেও রক্তের ছিটে চিহ্ন।

–পুলিশকে তো বলতেই হবে। এই গল্পটা কেউ বিশ্বাস করবে না। ডঃ হার্টলে আবার টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

জর্জ বলল–না, অনুগ্রহ করে এটা জানাবেন না যেন, হা, যদি আপনি বলেন, আমি এক মানসিক ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করব।

সাইরেনের শব্দ শোনা গেল।

***

মনে হল সে যেন একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে পা রেখেছিল। এখন উজ্জ্বল আলোর দিশা। হ্যাঁ, শরীরটা হালকা হয়েছে। তাকে অপারেশন টেবিলে শুইয়ে রাখা হল।

এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন আমার নাম কেট ওয়েস্টার, আমি এখন অপারেশন করব।

-হ্যাঁ, আমাকে কুৎসিত করে বাঁচিয়ে রাখবেন না। বলুন, তা হলে আমাকে মেরে ফেলবেন।

ডাঃ ওয়েস্টার বললেন –কেন চিন্তা করছেন? আপনার শরীরের কোথাও একটুকরো দাগ থাকবে না।

***

জর্জ রক্তের ছিটে মুছে ফেলেছে ইভের বাথরুমে গিয়ে। সে তার রিস্ট ওয়াচের দিকে তাকাল। গভীর রাত, তিনটে বেজে গেছে। আলেকজান্দ্রা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। লিভিং রুমে পৌঁছে সে অবাক হয়ে গেল আলেকজান্দ্রা জেগে আছে।

-ডালিং, এত রাত? তোমার কিছু হয়নি তো?

–আমি ভালো আছি, অ্যালেক্স।

সে এগিয়ে এসে স্বামীকে আদর করে বলল। আমি তো এখনই পুলিশকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। ভয়ংকর কিছু হয়েছে ভাবছিলাম। এত দেরী হল কেন? কীসে ব্যস্ত ছিলে?

ব্যস্ত? হঠাৎ বাস্তবে ফিরে এল জর্জ। হ্যাঁ, দেখো না, প্লেনটা ছাড়তে দেরী করল। আমার পার্টনার আমাকে ছাড়তে চাইছিল না।

-ঠিক আছে, তুমি ফিরে এসেছ, সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

জর্জ দুচোখের পাতা এক করতে পারল না। চোখ বন্ধ করলেই ইভের যন্ত্রণা কাতর মুখটা মনে পড়ে গেল, ইভের কাতর ধ্বনি তাকে আরও উতলা করে তুলল।

***

জন হার্টলে কেট ওয়েস্টারের সাহায্য পেয়েছেন। কেট ওয়েস্টার হলেন পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে সেরা প্ল্যাস্টিক সার্জেন্ট। পার্ক এভিনিউতে তিনি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। তিনি কথা দিয়েছেন, ইভকে আবার আগের মতো করে তুলবেন। কিন্তু তিনি ওই গল্পটা বিশ্বাস করছেন না। তিনি বারবার বলছেন, উলঙ্গ হয়ে কোনো মহিলা রাজপথ দিয়ে হেঁটে যায় না। ড্রাইভার তাকে আঘাত করেছে, এই পর্যন্ত গল্পটা ঠিক আছে। কিন্তু ড্রাইভার হঠাৎ তার সমস্ত শরীরে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাকা দেবে কেন?

না, পুলিশকে জানাতেই হবে। এটাই হল তার শেষতম সিদ্ধান্ত।

দুপুরবেলা ডঃ ওয়েস্টার তার সহকর্মীদের বললেন কাজ শেষ হয়ে গেছে। মেয়েটাকে ইনটেনসিভ কেয়ারে দিয়ে আসুন। সামান্য গোলমাল দেখা দিলেই আমাকে ফোন করতে ভুলবেন না।

***

ইভকে ইনটেনসিভ কেয়ারে রাখা হল। আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেছে। জর্জ হসপিটালে গিয়ে নিজেকে অ্যাটর্নি বলে পরিচয় দিল। ইভের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পাওয়া গেল।

-হ্যালো ইভ।

–জর্জ। কণ্ঠস্বর ফিসফিসানি পর্যায়ে নেমে গেছে।

–অ্যালেক্সকে কিছু বলেনি তো?

–না, তা কখনও বলতে পারি।

–আমি জানি, তুমি কেন এসেছ? এখন কিছু পরিকল্পনা করতে হবে?

–ইভ, আমি দুঃখিত।

–অ্যালেক্সকে কোনোদিন বলল না, তুমি বলবে আমি বেড়াতে গেছি। কয়েক সপ্তাহ বাদে ফিরে আসব।

-ঠিক আছে তাই বলব।

দুটো রক্তরঞ্জিত চোখ তাকিয়ে আছে।

–জর্জ, একটা সাহায্য করবে?

–কী সাহায্য?

মৃত্যুটা যেন যন্ত্রণা কাতর হয়।

***

সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন কেট ওয়েস্টার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

-কেমন লাগছে?

–আমি একটা আয়না পেতে পারি?

ডঃ ওয়েস্টার বললেন না, এখন নয়, আর কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে। তারপর আপনি আয়নাতে মুখ দেখবেন।

তিনি গল্পটা শুনতে চাইলেন, সেই একই পুরোনো মিথ্যে গল্প। ওয়েস্টার বুঝতে পারলেন। এর মধ্যে কোনো একটা রহস্য আছে।

শেষ পর্যন্ত তিনি ভাবলেন, না, এই গল্পটা পুলিশ বিশ্বাস করবে না। আমি বরং বলি আপনি মাথা ঘুরে সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছেন। কেমন?

***

প্রত্যেকদিন ডঃ কেট ওয়েস্টার ইভের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। শেষ পর্যন্ত ইভ একেবারে সেরে উঠল। আয়নাতে নিজেকে দেখে অবাক হয়ে গেল। শরীরের কোথাও এতটুকু কাটা চিহ্ন নেই।

পনেরো দিন কেটে গেছে। সে একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে এসে ভর্তি হল। সেখানে তাকে আরও বেশ কিছুদিন থাকতে হবে।

পাঁচ সপ্তাহ কেটে গেছে। ইভের মনে হল শরীরটা আগের মতোই ঝরঝরে হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ডাক্তারকে অশেষ ধন্যবাদ।

জর্জ মেলিস

৩১.

জর্জ মেলিস তার জীবনধারা একেবারে পালটে ফেলেছে। এখন সে এক অনুগত স্বামীর ভূমিকাতে কাজ করছে। শুধু স্বামী নয়, নাতজামাই হিসেবেও তার গুণের কোনো শেষ নেই। সে এখন এমন কোনো কাজ করবে না, যাতে এই বৃদ্ধা মহিলার মনে সামান্যতম সন্দেহ জাগতে পারে।

***

ডঃ জন হার্টলের কাছ থেকে একটা টেলিফোন কল–আমি একজন সাইক্রিয়াটিস্টের সঙ্গে কথা বলেছি। উনি হলেন ডঃ পিটার টেমপ্লেটন। আপনি কবে যাবেন?

জর্জ মেলিসের কণ্ঠস্বরে বিরক্তি –না, ডাঃ হার্টলে তার কোনো দরকার আছে?

–নিজেকে কী ভেবেছেন? আমরা এই শর্ত করেছিলাম। আমি পুলিশে খবর দিইনি, আপনি একজন সাইক্রিয়াটিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আপনি শর্ত ভাঙলে আমিও কিন্তু ভাঙতে বাধ্য হব।

-না-না, জর্জ চিৎকার করে বলল, কখন যাব?

–ডঃ টেমপ্লেটনের টেলিফোন নাম্বারটা লিখে নিন–৫৫৫৩১৬১। যে কোনো সময় আপনি ওনাকে ফোন করতে পারেন। কিন্তু ফোনটা আজকেই করবেন।

জর্জ চিন্তা করল, শেষ অব্দি আমাকে পাগলের ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে? না, আমি ফাঁদে পড়ে গেছি।

***

ইভ অফিসে ফোন করল –আমি বাড়িতে আছি।

–তুমি বাড়িতে আছো? ঠিক আছে।

–আমার সঙ্গে রাতে দেখা করো, কেমন?

–ঠিক আছে, রাতে আমি আসব।

–রাত আটটায়, কেমন?

***

ইভকে দেখে জর্জ অবাক হয়ে গেছে। সত্যি শরীরের কোথাও এতটুকু দাগ নেই। সে বিশ্বাস করতে পারছে না।

ইভ বলল–আমি আগের মতোই সুন্দরী কিনা বলল তো? হ্যাঁ, এই সৌন্দর্য বাঁচিয়ে রাখতে হবে। না হলে সব কিছু হাতছাড়া হয়ে যাবে।

-ইভ, আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

–হ্যাঁ, ওই ব্যাপারটা ভুলে যাওয়া উচিত। সব কিছু আগের মতোই আছে, তাই না।

দুজনে আবার ভালোবাসার অভিনয় করতে শুরু করল।

তারপর? ষড়যন্ত্রের শেষ পর্বটা শুরু হবে।

***

পিটার টেমপ্লেটনের বয়স বছর পঁয়ত্রিশ। ছফুটের ওপর লম্বা, সুদেহের অধিকারী, দুটি চোখে অসংখ্য বিস্ময় খেলা করছে।

তিনি অনেক কথা জানতে চাইলেন–হ্যাঁ, এই মানুষটিকে দেখে কিছু মনে হচ্ছে না। কিন্তু আসলে এ মানসিক রোগী!

ডাঃ হার্টলে বলেছেন- আপনার সমস্যা আছে।

–হ্যাঁ, আমার তিনটে সমস্যা আছে।

–এক এক করে বলুন।

সব সময় কেমন লজ্জা-লজ্জা করে। তাই আপনার কাছে আসতে পারিনি। ডাক্তার, একজন মেয়ে আমাকে অধিকার করার চেষ্টা করছে।

তার মানে?

–আমি একটা শর্ত করেছি। আমি তাকে আঘাত করেছি, ব্যাপারটা সাংঘাতিক।

পিটার টেমপ্লেটন অবাক হয়ে তাকালেন। জর্জ মেলিসের সমস্যা অনুধাবন করার চেষ্টা করছেন। তার মানে এই পুরুষ মানুষটা কী করে? নারীদের ওপর অত্যাচার করে এবং তাতে আনন্দ পায়।

কাকে আঘাত করেছেন? স্ত্রীকে?

–না, আমার শালিকে।

পিটার ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের নাম জানেন, খবরের কাগজের পাতায় এই যমজ কন্যার ছবি ছাপা হয়েছে। যখন তারা চ্যারিটি ইভেন্টে যোগ দিয়েছিল, হা, তাদের দেখতে একরকম। পিটারের মনে পড়ল, তার মানে? ওই লোকটা তার শালিকে মেরেছে। কিন্তু কেন? ঘটনাটার মধ্যে যথেষ্ট রহস্য লুকিয়ে আছে। জন হার্টলে নিশ্চয়ই স্বাভাবিক অবস্থা হলে তার সঙ্গে দেখা করতে বলতেন না।

–কীভাবে আঘাত করেছেন?

–আমি তাকে খুবই মেরেছি। আমি তো স্বীকার করছি ডাক্তার, তার সমস্ত শরীরে কালসিটে পড়ে গিয়েছিল।

-আঘাত করার পর আপনার মানসিক অবস্থা কেমন?

–সত্যি কথা বলব? আমি মনে মনে খুবই কষ্ট পাচ্ছি।

–আপনার আর কোনো সমস্যা?

–হ্যাঁ, বাবার জন্য খুবই চিন্তিত। বাবার কয়েকবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে।

–উনি কোথায় আছেন?

–উনি গ্রিসে আছেন।

–আপনার তৃতীয় সমস্যা?

–আমার স্ত্রী আলেকজান্দ্রাকে কেন্দ্র করে–এটা কি দাম্পত্য কলহ?

–না, স্ত্রী যেন কেমন হয়ে গেছে। সব সময় আত্মহত্যার কথা বলে।

–তাই নাকি? কোনো ডাক্তারের সাহায্য নেননি?

–না, ও ডাক্তারের কাছে যাবে না।

পিটার ভাবলেন, এই সমস্যার সমাধান কী করে করা সম্ভব?

–ডঃ হার্টলের সঙ্গে কথা বলেছেন?

–না।

–উনি তো আপনাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান, ওনার সাথে কথা বলা উচিত ছিল। উনি হয়তো একজন ভালো সাইক্রিয়াটিস্টের নাম বলতে পারতেন।

জর্জ মেলিস শান্তভাবে বলল না, আমি চাই না আলেকজান্দ্রার কানে এই খবরটা পৌঁছে যাক। আমি সবকিছুই তাকে না জানিয়ে করতে চাইছি। আমার মনে হয়, ডঃ হার্টলে হয়তো তাকে বলে দেবেন।

–ঠিক বলেছেন, মি. মেলিস, দেখা যাক আমি কী করতে পারি।

***

-ইভ, সমস্যা দেখা দিয়েছে, জর্জ বলল, বিরাট সমস্যা।

–কী হয়েছে?

-তুমি যা বলেছিলে, আমি তাই করেছি। আলেকজান্দ্রা আত্মহত্যা করতে চাইছে, তাই বলেছি।

-হ্যাঁ। তাতে কী হয়েছে?

–লোকটা জন হার্টলের সঙ্গে কথা বলবেন।

–হায়, তাহলে তো ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে গেল।

ইভ তার রাগকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে বলল ঠিক আছে। আমি হার্টলের সঙ্গে কথা বলব। টেমপ্লেটনের সঙ্গে আর একবার দেখা করার চেষ্টা করো।

***

পরের দিন সকালবেলা ইভ ডঃ হার্টলের সঙ্গে দেখা করতে গেল। তার অফিসে। জন হার্টলে ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের সকলকেই ভালোবাসেন। তার চোখের সামনে এই দুটি মেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। তিনি মারিয়ানা মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনাটা জানেন। কেটির ওপর যে আঘাত করা হয়েছিল, তাও তিনি জানেন। টনিকে একটা স্যানাটোরিয়ামে রাখা হয়েছে, কেটিকে এত কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে, কেটি এবং ইভের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে গেছে তিনি ভাবতেই পারছেন না, এটা কেমন করে ঘটল। তবে এই ব্যাপারে নাক গলাবার আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। তিনি চাইছেন, ওই পরিবারের সকলে যেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় সেটাই দেখা।

ইভ অফিসে প্রবেশ করল। ডঃ হার্টকে তার দিকে তাকিয়ে বললেন –কেট ওয়েস্টার একটা সাংঘাতিক কাজ করেছেন।

-হ্যাঁ, এত সুন্দর শল্য চিকিৎসা?

ডঃ হার্টলে ইভের হাতে হাত রেখে বললেন তুমি আরও সুন্দরী হয়ে উঠেছ, ইভ, বলল, তোমার জন্য কী করব?

-এটা অ্যালেক্সের ব্যাপারে একটা আলোচনা।

ডঃ হার্টলে বললেন কী সমস্যা? জর্জ সংক্রান্ত?

-না, ইভ বলল, জর্জ তার কাজটা ঠিক মতো করছে। অ্যালেক্সের মধ্যে একটা অদ্ভুত মনোবৃত্তি দেখা দিয়েছে, সে খুব হতাশ হয়ে উঠেছে, মাঝে মধ্যে আত্মহত্যা করতে চাইছে।

ডঃ হার্টলে বললেন আমি বিশ্বাস করি না। আলেকজান্দ্রার মতো মেয়ে কখনও আত্মহত্যাপ্রবণ হবে না।

–আমিও বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ঘটনাটা ঘটতে চলেছে। তাই আপনার কাছে সরাসরি এসেছি। আপনি কিছু একটা করার চেষ্টা করুন। আমি আমার ঠাকুরমাকে হারিয়েছি। কিন্তু কিছুতেই আমার বোনকে হারাতে পারব না।

–কতদিন ধরে এই অবস্থা?

আমি ঠিক জানি না। বেশ কিছুদিন ধরেই সে একটা অদ্ভুত আচরণ করছে।

–আমি চেষ্টা করছি, কাল সকালে ওকে এখানে পাঠিয়ে দিও। চিন্তা করো না, ইভ। এখন অনেক নতুন ওষুধপত্র বেরিয়ে গেছে।

হার্টলে এগিয়ে গেলেন। হা, ইভ একটা সুন্দর মেয়ে। তাকে কেন এভাবে প্রতারিত করা হল?

ইভ তার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গেল। সে তাকিয়ে থাকল আয়নার দিকে।

***

পরের দিন সকাল দশটা। ডঃ হার্টলের রিসেপশনিস্ট বলল–মিসেস জর্জ মেলিস এখানে এসেছেন ডাক্তার।

-ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।

আলেকজান্দ্রা ভেতরে ঢুকল। শরীরটা বিবর্ণ। হ্যাঁ, তার চোখের তলায় কালি পড়েছে।

জন হার্টলে তার দিকে তাকিয়ে বললেন –তোমার সঙ্গে দেখা হল অনেকদিন বাদে, আলেকজান্দ্রা। বলো তুমি কেমন আছো?

তার কণ্ঠস্বর নীচু –আপনাকে বিরক্ত করছি বলে খারাপ লাগছে, কিন্তু কোথায় যাব বলুন? ইভ না বললে আমি হয়তো এখানে আসতাম না। আমি তো ভালোই আছি।

-কিন্তু তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?

রাতে ভালো ঘুম হয় না।

–আর কিছু?

–কত রকম চিন্তা মাথায় আসে।

–কেন আলেকজান্দ্রা?

–আমি কেমন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি। জর্জের জন্য চিন্তা হয়। জর্জ আমাকে সুখী রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তবুও আমার মন মানছে কই?

–আর কিছু?

–মনে হচ্ছে নিজেকে মেরে ফেলি।

–হ্যাঁ, এরকম চিন্তা কখনও করো না।

মেয়েটি মাথা নাড়ল। কিছুই আমার ভালো লাগছে না ডাক্তার। কোনো ওষুধ আছে কি?

ডঃ হার্টলি বললেন আমি তোমাকে ওষুধ লিখে দিচ্ছি। ওষুধ খেলে তুমি ভালো হয়ে উঠবে।

-সত্যি, আমি ভালো হয়ে উঠব?

হার্টলে বললেন অবশ্যই। আবার আমার সঙ্গে দেখা করো কিন্তু কেমন?

আলেকজান্দ্রা ডঃ হার্টলের অফিস থেকে বাইরে এল। রাস্তায় এসে দাঁড়াল। সে দীর্ঘশ্বাস। ফেলল। ইভ নিশ্চয়ই খুশি হবে। হ্যাঁ, প্রেসক্রিপশনটা সে ছিঁড়ে ফেলে দিল।

.

৩২.

কেটি ব্ল্যাকওয়েল খুবই হতাশ হয়েছেন। মিটিংটা অনেকক্ষণ ধরে চলেছে। তিনি মাঝে মধ্যে তিনজন মানুষের দিকে তাকালেন। তারা সকলেই এগজিকিউটিভ বোর্ডের সদস্য। এখন আর এসব ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে, একটা সহজ সুন্দর জীবন হলেই হয়তো ভালো হত।

আলেকজান্দ্রা বলেছিল ঠাম্মা, আমি তো ব্যবসায় জড়াতে চাইছি না। জর্জকে একজন এগজিকিউটিভ করলে কেমন হয়?

ব্রাড রজারসও এই ব্যাপারে মন্তব্য করল–হ্যাঁ, কেটি, নাতনি কিন্তু ভালো কথা বলেছে। কেটি কিছু বলার চেষ্টা করলেন।

–আমরা কোনো একটা বিষয়ে কথা বলছিলাম, কেটি আবার বাস্তবে ফিরে এলেন।

***

জর্জ মেলিস আবার পিটার টেমপ্লেটনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

–মি. মেলিস, আপনার তরফ থেকে কোনো হিংসার কাজ?

–না, আমি হিংসাকে ঘেন্না করি।

–আপনি বলেছেন যে, আপনার মা-বাবা আপনাকে শারীরিক ভাবে নির্যাতন করত।

–হ্যাঁ, এটা সত্যি।

–আপনি কি খুব অনুগত বালক ছিলেন?

–না, সাধারণ।

–সাধারণ বালকেরা তো এমনভাবে শাস্তি পায় না।

জর্জ বলল–আমি নিয়ম ভাঙতে ভালোবাসতাম।

ও মিথ্যে কথা বলছে। পিটার টেমপ্লেটন ভাবলেন, কিন্তু কেন? ও কি কোনো কিছু লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। ডঃ হার্টলের সঙ্গে কথোপকথন মনে পড়ে গেল।

ওর শালিকে ও আঘাত করেছে, জন।

হা, জন হার্টলের কণ্ঠস্বরে একটা অদ্ভুত উদাসীনতা। এটা আঘাত? জবাই করা হয়েছে। পিটার, সে মেয়েটার গালের হাড় ভেঙে দিয়েছে, তার নাক ভেঙে দিয়েছে, তার শরীরে কোনো হাড় আস্ত রাখেনি। তার পেটে আঘাত করেছে। এমন কী, তার শরীরের সর্বত্র সিগারেটের ছ্যাকা দিয়েছে।

পিটার টেমপ্লেটন বিশ্বাস করতে পারছেন না।

ও তো এত কথা আমাকে বলেনি।

আমি জানি ও বলবে না।

পিটার জর্জের দিকে তাকালেন। জর্জের কথাগুলো তার কানে বাজছে–আমি খুব কষ্ট পেয়েছি। তাই আমি এখানে আসতে চেয়েছি।

-আবার মিথ্যে কথা।

মেলিস বলেছে, তার বউ নাকি হতাশায় ভুগছে। সে আত্মহত্যা করতে চাইছে।

আলেকজান্দ্রা কদিন আগে আমার কাছে এসেছিল। আমি তাকে প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়েছি।

জর্জ মেলিস সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

মনে হয়, লোকটা ভয়ংকর।

***

ডাক্তার কেট ওয়েস্টার ইভ ব্ল্যাকওয়েলের সঙ্গে দেখাই করতে পারছেন না। ইভ তার মনকে অধিকার করে আছে। আহা, ইভ যেন এক সুন্দরী রূপবর্তী দেবী। অসামান্য রূপ আছে তার। কিন্তু তাকে স্পর্শ করা যায় না। তার মধ্যে একটা প্রাণসত্তা কাজ করছে। কেট আবার ইভের কথা চিন্তা করলেন।

তিনি ইভকে তার অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করলেন। বললেন–আমি কেট ওয়েস্টার বলছি। আমি কী তোমাকে বিরক্ত করছি? তোমার কথাই কেবল মনে পড়ছে, তুমি এখন কেমন আছো?

-ভালো আছি, কেট আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি এখন কী করছেন?

–কিছুই করছি না। তুমি কি আমার সাথে লাঞ্চ খাবে?

ইভ হাসল–হা, আমার তাহলে ভালোই লাগবে।

-কখন?

-কাল।

–তাহলে এটাই ঠিক রইল।

***

লাঞ্চটা ভালোই হয়েছিল। ডঃ কেট ওয়েস্টার এক স্কুল ছাত্রের মতো ব্যবহার করলেন। ভালোবাসার ক্ষেত্রে তিনি এক শিক্ষানবিশ। তিনি ন্যাপকিন ফেলে দিলেন। মদ খানিকটা ছলকে পড়ল। ফুলের আধারটা উল্টে গেল। ইভ এসব ব্যাপার দেখে খুবই আনন্দ পেয়েছে।

লাঞ্চের আসর শেষ হয়ে গেল। কেট ওয়েস্টার বললেন আমরা কি আবার কোথাও দেখা করতে পারি?

-হ্যাঁ, কিন্তু এখানে নয়। হয়তো বারবার দেখা হলে আমি আপনার প্রেমে পড়ে যাব।

ডাক্তারবাবু কী বলবেন ভেবে পেলেন না।

ইভ শেষ পর্যন্ত বলল –আপনাকে আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না।

***

জন হার্টলে কেট ওয়েস্টারের সাথে কথা বলছেন।

কেট বললেন–জন, ব্যাপারটা খুব গোপনীয়। আমার মনে হচ্ছে, ইভ ব্ল্যাকওয়েলের ব্যাপারে আপনি সব কথা বলতে পারেননি।

-কী হয়েছে? জর্জ মেলিস তো?

কেট ওয়েস্টারের মনে হল, এখন এই ব্যাপারটার মধ্যে নিজেকে জড়াতে হবে।

***

জর্জ মেলিস অধৈর্য হয়ে উঠেছে টাকা আছে, উইলটা পরিবর্তিত হয়েছে, এখন আর কীসের জন্য অপেক্ষা?

ইভ তার কৌচে বসেছিল। সে বলল –ব্যাপারটা ভালোভাবে করতে হবে।

সে বুঝতে পারল, জর্জ আর সাহস রাখতে পারছে না।

শেষ পর্যন্ত ইভ সাবধানে বলেছিল –এখন সময় হয়ে গেছে।

কবে?

–আগামী সপ্তাহে।

***

অধিবেশনটা শেষ হয়ে গেল। মেলিস তার বউয়ের কথা একবারও বলেনি। এখন বলল–আলেকজান্দ্রার কথা ভেবে আমার খারাপ লাগছে ডাঃ টেমপ্লেটন। তার অসুখটা বোধহয় সারবে না।

–আমি জন হার্টলের সঙ্গে কথা বলেছি। জন বেশ কয়েকটা ওষুধ লিখে দিয়েছেন।

-আমার মনে হয় এগুলো খেলে সেরে যাবে। ডাক্তার, ওর কিছু হলে আমার খারাপ লাগবে।

পিটার টেমপ্লেটন কথা বলার চেষ্টা করলেন–হ্যাঁ, এই লোকটার মধ্যে একটা অদ্ভুত আবেগ আছে।

তিনি বললেন মি. মেলিস, মেয়েদের সাথে আপনার সম্পর্ক? কিছু বলবেন কী?

-সাধারণ।

–কিন্তু ওদের আপনি রাগ দেখান?

জর্জ মেলিস বলল–না-না, আমি মেয়েদের আঘাত করতে চাই না।

ডাক্তারের কথা মনে পড়ে গেল নৃশংস আক্রমণ।

পিটার বললেন কোনো সময় মানুষ হঠাৎ অশান্ত হয়ে ওঠে। এমন কিছু কাজ করে পরে যেটা তার মনে থাকে না।

আমি জানি, আপনি কী বলতে চাইছেন। আমি জানি, আমার এক বন্ধু বারবনিতাদের ওপর আঘাত করে।

-একটা সাংঘাতিক খবর, সেই বন্ধু সম্পর্কে কথা বলুন।

-ও বেশ্যাদের দেখতে পারে না। তাদের ভাড়া করে। কাজ শেষ হবার পর আঘাত করে।

জর্জ পিটারের মুখের দিকে তাকালেন। হ্যাঁ, সেখানে সন্দেহের বাতাবরণ।

জর্জ বলে চলল আমার বেশ মনে আছে, আমরা একসঙ্গে জামাইকাতে গিয়েছিলাম। সে আমাকে একটা হোটেলে নিয়ে গিয়েছিল। দেখা গেল, একটা বেশ্যা মেয়ে বেশি টাকা চাইছে। জর্জের মুখে হাসি, আমার বন্ধু তাকে মারতে শুরু করে দিল।

সে আর কথা বলতে পারেনি।

লোকটা মানসিক রোগী, পিটার টেমপ্লেটন ভাবলেন। কিন্তু এই রোগ কী করে সারানো হবে।

***

হারবার্ট ক্লাব। লাঞ্চের আসরে দুজন মুখোমুখি।

–জর্জ মেলিসের বউ সম্পর্কে সব খবর আমাকে দিন। পিটার টেমপ্লেটন বললেন।

–আলেকজান্দ্রা? দারুণ ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে। আমি তাকে সাহায্য করতে পারব। ওদের আমি ছোট্টবেলা থেকে চিনি। ডাক্তার হার্টলে বললেন, ওরা দুই যমজকন্যা। চট করে আলাদা করা যাবে না।

পিটার জানতে চাইলেন–ওরা কি একেবারে যমজ?

-হ্যাঁ, পৃথিবীর কেউ ওদের দেখে আলাদা করতে পারবে না। ছোটোবেলা থেকে ওরা একসঙ্গে বড়ো হয়ে উঠেছে।

পিটার বললেন আলেকজান্দ্রা কেন আপনার কাছে এসেছে? সে কি ভেবেছে, তার মধ্যে এক ধরনের মানসিক অশান্তি কাজ করছে?

–হ্যাঁ।

–জন, আপনি কি জানেন, যে, মেয়েটি আলেকজান্দ্রা? ইভ নয় তো?

–হ্যাঁ, এটা খুবই সহজ। ইভের কপালে এখনও একটা লাল ক্ষত চিহ্ন আছে। আর আলেকজান্দ্রার কপালে এমন কোনো কাটা দাগ নেই।

হ্যাঁ, ব্যাপারটা কি সত্যি?

–মেলিস সম্পর্কে আর কোনো খবর? –

-মেলিস সম্পর্কে কোনো খবর আমি দিতে পারব না। আরও খবর আনতে হবে। দুজনে অনেকক্ষণ কথা বললেন। কিন্তু? আসল সত্যিটা বোঝা গেল কি?

***

শান্ত সমুদ্র, একজন মহিলা ডুবে যাচ্ছে। সে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। বড়ো বড়ো ঢেউ আসছে। সে চিৎকার করছে। সে তাড়াতাড়ি সাঁতার কাটার চেষ্টা করছে। কিন্তু? পিটার টেমপ্লেটনের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি আলো জ্বালালেন। স্বপ্ন তার ভেঙে গেছে।

পরের দিন সকালবেলা তিনি ডিটেকটিভ লেফটেন্যান্ট নিক পাপ্পসকে ফোন করলেন।

***

নিক পাপ্পাস একজন দশাসই চেহারার মানুষ। ছ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা। তিনশো পাউন্ড ওজন। যে কোনো ক্রিমিন্যাল তাকে দেখে ভয়ে কাঁপতে শুরু করে দেয়। তিনি অনেক দিন ধরেই হোমিসাইড বিভাগের সঙ্গে যুক্ত আছেন। ম্যানহাট্টন অঞ্চলটির দায়িত্ব তার ওপর দেওয়া হয়েছে। পাপ্পাসের অন্যতম ইচ্ছে হল, আততায়ীকে তাড়া করা।

নিক বললেন –হোমিসাইড পাপ্পাস।

-হ্যাঁ, পিটার।

–বন্ধু, কী হয়েছে?

–অনেক কথা আছে। টিনা কেমন আছে?

-দারুণ ভালো। কী করব?

কয়েকটা তথ্য চাই। গ্রিসে তোমার কোনো যোগাযোগ আছে।

-আমার? পাপ্পাস বললেন, একসোজন আত্মীয় আছে সেখানে। তাদের সকলের হাতে টাকা আছে। আমি আবার মাঝে মধ্যে তাদের টাকা পাঠাই।

পিটার জানতে চাইলেন একটা ব্যাপারে সাহায্য করবে?

-বল, কী ব্যাপার?

–জর্জ মেলিসের নাম শুনেছ?

–হ্যাঁ, যারা খাবারের ব্যবসা করে।

–হ্যাঁ।

–হ্যাঁ, ওর সম্বন্ধে আমি জানি না। কী হয়েছে?

–ওর কীরকম টাকা আছে?

–ওর পরিবার খুবই বড়োলোক।

–হ্যাঁ, ওর নিজস্ব টাকা?

–আমি একটু দেখে বলছি, পিটার। কিন্তু সময় নষ্ট করে কী হবে?

–জর্জ মেলিসের বাবা সম্পর্কে কোনো খবর আছে? সব খবর আমার চাই। ভদ্রলোকের কি কয়েকবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে?

–আমি সব খবর দেব।

পিটার ওই স্বপ্নটার কথা চিন্তা করলেন। –নিক, আমাকে এখনই ফোন করতে পারবে?

-এখনই?

–হ্যাঁ।

পাপ্পাসের কণ্ঠস্বর ভেঙে গেছে।

–কিছু বলতে চাও, পিটার?

–এখনই কিছু বলব না। কিন্তু আমি খুব উৎসাহী হয়ে উঠেছি।

***

কেটি ব্ল্যাকওয়েলের শরীরটা ভালো নেই। তিনি ডেস্কে বসে আছেন। টেলিফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছেন। হঠাৎ একটা ভয়ংকর কাঁপুনি, তার শরীর দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল।

তাকে অফিসে শুইয়ে দেওয়া হল। ব্রাড ছুটে এসেছে– কেটি তুমি ভালো আছো তো?

কেটি কথা বলতে পারছেন না। কেমন যেন মাথাটা ঘুরে গেল।

-এখন কি চেক আপ করাবে?

–না ব্রাড, এখন উপায় নেই।

–ঠিক আছে। আমি বরং জন হার্টলেকে ডেকে পাঠাই।

–না, ব্রাড, এব্যাপারে কথা বলো না।

–তাহলে কাজ চলতে থাকবে।

–হ্যাঁ।

***

পরের দিন সকালবেলা পিটার টেমপ্লেটনের সেক্রেটারি বলল –ডিটেকটিভ পাপ্পাস আপনাকে ডাকছেন?

পিটার ফোনটা ধরে বললেন–হ্যালো নিক?

-একটু কথা বলব।

–হ্যাঁ, বলতে পারো।

-আমি বৃদ্ধ মেলিসের সঙ্গে কথা বললাম। তার কখনও হার্ট অ্যাটাক হয়নি। ছেলেকে তিনি মোটেই দেখতে পারেন না। তার কাছে ছেলে মৃত সন্তান ছাড়া আর কিছুই নয়। জর্জ মেলিসকে এক অসাধারণ রূপবান যুবক বলা যেতে পারে। পুলিশও তাকে ভালো মতো চেনে। সে মাঝে মধ্যেই মেয়েদের ওপর অত্যাচার করে। গ্রিস ছেড়ে চলে যাবার আগে সে পনেরো বছরের একটা পুরুষ বেশ্যাকে আঘাত করেছিল। ওই বেশ্যাটার মৃতদেহ হোটেলে পাওয়া গেছে। তাকে মেলিস মেরেছে, এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে। বুড়ো মানুষের চেষ্টায় মেলিস সে যাত্রায় বেঁচে যায়। তাকে গ্রিসের বাইরে বের করে দেওয়া হয়। আর কোনো খবর?

পিটার বললেন –ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ।

-না, ধন্যবাদ জেনে কী করব? আর কোনো খবরের দরকার হলে অবশ্যই বল।

***

ডঃ জন হার্টলে একটা পরীক্ষা করছিলেন। রিসেপশনিস্ট বলল –মিসেস জর্জ মেলিস এখানে এসেছেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে ডাক্তার, কোনো অ্যাপয়মেন্ট নেই। আমি আপনার কথা বলেছি।

জন বললেন –ওকে এখনই এখানে পাঠিয়ে দাও।

আগের থেকে শরীরটা আরও খারাপ হয়ে গেছে। সে বলল আপনাকে বিরক্ত করছি।

–আলেকজান্দ্রা, সমস্যাটা কী?

–ভীষণ খারাপ লাগছে।

–তুমি কি ওষুধ খাচ্ছো?

–হ্যাঁ।

–তাহলে?

–মানসিক অবসাদটা আরও বেড়ে গেছে। মনের ওপর আমার কোনো অধিকার নেই।

ডাঃ হার্টলে বললেন– তোমার মধ্যে তো কোনো খারাপ দেখছি না। তুমি কেন এমন করছ?

***

তিরিশ মিনিট কেটে গেছে। ইভ তার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসেছে। সে মুখে একটা ক্রিম মেখে ছিল। হালকা হলুদ রঙের। সেটা আস্তে আস্তে তুলে ফেলল। আহা, মুখটা আবার আলোতে উদ্ভাস হয়ে উঠেছে।

***

জর্জ মেলিস পিটার টেমপ্লেটনের উল্টোদিকে বসে আছে। হাসছে এবং আত্মবিশ্বাসী।

–আজ কেমন আছেন?

–অনেক ভালো, ডাক্তার। আমি আগের থেকে সাহসী হয়ে উঠেছি।

–সত্যি কথা?

–হ্যাঁ, কিছু কথা বলার আছে। আমি স্বীকারোক্তি করতে চাইছি।

–সত্যি! সত্যি!

জর্জ বলল–হা, আমার বউ আবার ডাক্তার হার্টলের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল। সে আর বেঁচে থাকতে চাইছে না। আমি কি তাকে কোথাও নিয়ে যাব? একটা পরিবর্তন দরকার।

পিটারের মনে হচ্ছে, এই কথাগুলোর অন্তরালে সরল সত্যি লুকিয়ে আছে।

–গ্রিস খুব ভালো জায়গা, পিটার বললেন। ওকে গ্রিসে নিয়ে যান না কেন? পরিবারের সকলের সঙ্গে দেখা হবে।

-না, এখনও সময় আসেনি। অ্যালেক্স সেখানে গেলে মোটেই ভালো থাকতে পারবে না। সমস্যা দেখা দেবে।

এক মুহূর্তের জন্য পিটারের মনে হল, আলেকজান্দ্রার জীবনে এবার সত্যিকারের সমস্যা দেখা দিয়েছে।

***

জর্জ মেলিস চলে গেছে। পিটার টেমপ্লেটন চেয়ারে বসে আছেন। কোনো কিছুই ভাবতে পারছেন না তিনি। শেষ পর্যন্ত তিনি একটা ফোন করলেন –জন, তুমি কি একটা খবর দেবে? দেখো তো, জর্জ মেলিস তার বউকে নিয়ে কোথায় হনিমুন করতে যাচ্ছে?

–আমি এখনই খবরটা নিচ্ছি।

আমার এক বন্ধু বেশ্যাদের আক্রমণ করত, কথাটা মনে পড়ে গেল।

না, জর্জ মেলিসের বিরুদ্ধে এমন কোনো প্রমাণ নেই, যাতে তাকে দোষারোপ করা যেতে পারে। জন হার্টলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

***

পিটার টেমপ্লেটন কাজ করে চলেছেন। তার বাবা একটা কলেজের কেয়ারটেকার ছিলেন। নেব্রসকাতে। পিটার একটা স্কলারশিপ পেয়েছিলেন, তার মাধ্যমেই এতদূর উঠতে পেরেছেন।

তিনি আলেকজান্দ্রাকে ফোন করলেন।

ডাক্তার, জর্জ আপনার কথা আমাকে বলেছে।

পিটার অবাক হয়ে গেছেন, জর্জ মেলিস কখনওই এই কথা বলবে না। তিনি বললেন – কী হয়েছে? জর্জ সম্পর্কে কোনো সমস্যা?

-না, আপনি কি লাঞ্চে আসতে পারবেন?

–হ্যাঁ, আসব।

ঠিক হল পরের দিন তারা লাঞ্চের আসরে যোগ দেবেন।

***

কর্ণারের টেবিলে আলেকজান্দ্রা বসে আছে। তার মনটা ভালো নেই। পিটার তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। একটা সুন্দর সাদা স্কার্ট পরেছে। ব্লাউজটাও মানানসই। মুক্তোর, একছড়া হার। সব মিলিয়ে অসাধারণ সৌন্দর্য।

আলেকজান্দ্রা কি জর্জের এই অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল?

–ডাঃ টেমপ্লেটন, আমার স্বামী ঠিক আছে তো?

–হ্যাঁ, তার কিছুই হয়নি। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

পিটার বললেন মিসেস মেলিস আপনার স্বামী কি বলেছেন, কেন উনি আমার কাছে আসেন।

-হ্যাঁ, স্বামীর সময়টা ভালো যাচ্ছে না। পার্টনাররা নানা গোলমাল করতে শুরু করেছে। তাই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

হ্যাঁ, স্বামীর ব্যাপারে মেয়েটা কিছুই জানে না। সে কি জানে, স্বামী তার বোনকে আঘাত করেছিল?

–আপনার সঙ্গে দেখা হবার পর আমার স্বামী তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে।

মেয়েটি বিড়বিড় করে বলল।

আহা, মেয়েটি এত অসহায়? একে কিনা এইভাবে প্রতারিত করা হচ্ছে? কীভাবে আমি ওকে বলব যে, ওর স্বামী হাজার মেয়ের প্রতি অনুগত। সে মানসিক রোগী। সে একটা অল্পবয়সী পুরুষ বেশ্যাকে হত্যা করেছিল। বাড়ির সকলে তাকে পরিত্যাগ করেছে। কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে পর্যন্ত চায় না। এসব কথাগুলো এখন কি বলা উচিত?

আলেকজান্দ্রা বলল–সময় এবং সুযোগ হলে আমাদের উচিত সাইক্রিয়াটিস্টের সাথে দেখা করা।

খাবার এসে গেছে। তারা খেতে খেতে কথা বললেন।

আলেকজান্দ্রা বলল–আপনার সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছি, ব্যাপারটা ভীষণ ভালো লাগছে।

শেষ পর্যন্ত সত্যিটা এসে গেছে। পিটার কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কোনো কথা বলতেই পারছেন না। এটা বলা উচিত হবে কি?

–জন হার্টলে আমাকে সব কথা বলেছেন।

জর্জ মেলিসের কণ্ঠস্বর মনে পড়ে গেল –ডার্লিং, আমি সারা বাড়ি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

সে পিটারের দিকে তাকাল আপনাকে দেখে ভালো লাগছে, মি, টেমপ্লেটন। আমি কি এখানে আসব?

ছোট্ট একটা সুযোগ এসেছিল, বাতাসে উড়ে হারিয়ে গেল।

***

–নিকের সঙ্গে ডাক্তার দেখা করতে চাইলেন কেন? ইভ জানতে চাইল।

–আমি জানি না, জর্জ বলল–ভগবানকে ধন্যবাদ, ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত অনেক দূর গড়াতে পারেনি।

–আমি এটা ভালো চোখে দেখছি না।

–আমাকে বিশ্বাস করো। এখনও কোনো ক্ষতি হয়নি। আমি আলেকজান্দ্রাকে সব কথা জিজ্ঞাসা করেছি। সে কারও সাথে আলোচনা করতে চাইছে না।

–আমাদের পরিকল্পনাটা তাড়াতাড়ি শুরু করতে হবে। জর্জ মেলিসের মনে হল, এই কথার মধ্যে একটা অদ্ভুত যৌনকাতরতা লুকিয়ে আছে। সে আর অপেক্ষা করতে চাইছে না। সে বলল কখন?

-এখন হলে ভালো হয়।

.

৩৩.

ডঃ হার্টলে কেটি ব্ল্যাকওয়েলকে নিয়মিত চিকিৎসা করছেন। কেটি প্রথমে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে রাজী হননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মত পরিবর্তন করেছেন।

একদিন জন হার্টলে বাড়িতে এসে বললেন–যদি আমি আপনার জায়গায় থাকতাম, তা হলে কী হত বলুন তো, কেটি?

-কেন আমার সমস্যা কী?

–আপনার ওপর অনেক সমস্যা। আপনি কি ইভের খবর রাখেন?

কেটি চোখ বড়ো বড়ো করে তাকালেন, বুঝতে পারলেন তার হৃদয়ের কোথাও একটা নীরব রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তিনি বললেন –কেন, কী হয়েছে?

-ইভ প্রায় মরেই গিয়েছিল, ভয়ংকর অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল তার।

–আপনি এ খবর আমাকে দেননি কেন?

–না, ইভ বারণ করেছিল। এই খবরটা পেলে আপনি আরও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবেন।

–ও এখন কেমন আছে?

এখন ভালো আছে।

কেটি তাকালেন, শুন্যের দিকে। তারপর বললেন অনেক ধন্যবাদ, ডাক্তার।

–আমি আর একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিচ্ছি।

ডাক্তার তাকিয়ে দেখলেন। কেটি ব্ল্যাকওয়েল আর সেখানে নেই।

***

ইভ দরজাটা খুলে দিল। নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। ঠাম্মা দাঁড়িয়ে আছে আগের মতোই সোজা এবং ঋজু। বয়সের কোনো ছাপ নেই তার আচরণে।

কেটি বললেন আমি কি ভেতরে আসতে পারি?

ইভ বাইরে বেরিয়ে এল। যে ঘটনা ঘটছে সেটা বিশ্বাস করতে পারছে না—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভেতরে এসো।

কেটি চারপাশে দেখে অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে ঢুকে গেলেন। তারপর বললেন আমি কি বসতে পারি?

ঠাম্মা, আমি দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি কি তোমাকে চা দেব? কফি, কিংবা অন্য কিছু?

-না, ধন্যবাদ। তুই কেমন আছিস, ইভ?

–আমি এখন ভালো আছি।

-আমি এইমাত্র ডঃ হার্টলের কাছে একটা খারাপ খবর শুনলাম। তোর নাকি ভয়ংকর অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।

ইভ সাবধানে তার ঠাকুরমাকে দেখল। তারপর বলল–হ্যাঁ।

-হ্যাঁ, উনি আরও বললেন, তুই নাকি প্রায় মৃত্যুর উপত্যকায় পৌঁছে গিয়েছিলি। তুই আমাকে খবরটা দিতে চাসনি, পাছে আমি উদ্বিগ্ন হই।

-হ্যাঁ, ইভ মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, উনি ঠিকই বলেছেন, ঠাম্মা।

–তাহলে? তুই আমার জন্য এত চিন্তা করিস?

কেটির কণ্ঠস্বর আবেগে বুজে গেছে।

ইভ তার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠে বলল–হা, আমি সবসময় তোমার কথা ভাবি।

একটু বাদে ইভ তার ঠাম্মার কোলে বসে আছে, কেটি ইভকে সাহায্য করছে সেজে উঠতে। তারপর কেটি বললেন আমি তোকে ক্ষমা করে দিলাম, এখন থেকে তুই আমার কাছেই থাকবি।

ইভ উঠে দাঁড়াল। তার চোখে আনন্দের অশ্রু নতুন করে আবার জীবন শুরু করতে হবে, তাই না ঠাম্মা?

ইভের দিকে তাকিয়ে কেটি বললেন–হ্যাঁ, আমি আবার উইলটা লিখব। তোর যা কিছু আছে সব তোকেই দিয়ে দেব।

-না-না, টাকার জন্য আমি চিন্তা করছি না। আমার একমাত্র চিন্তা তোমাকে নিয়ে।

-তুই তো আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। তুই আর আলেকজান্দ্রা, তোরা দুজন ছাড়া আমার আর কে আছে বল?

-আমি তো ভালোই আছি, ইভ বলল। শুধু তোমাকে খুশি দেখতে চাই।

-হ্যাঁ, তোর এই আচরণ আমাকে অবাক করে দিয়েছে ডার্লিং, তুই কবে আমাদের বাড়িতে ফিরে যাবি?

-না না, আমি তো এখানে ভালোই আছি। তুমি যখন ইচ্ছে তখন চলে এসো। তবে তুমি কি জানো, এখানে আমি কত একা থাকি?

কেটি তার নাতনির দিকে তাকালেন এবং বললেন তুই কি আমায় ক্ষমা করবি?

–হ্যাঁ, আমি তোমায় ক্ষমা করে দিয়েছি।

***

কেটি চলে গেলেন। ইভ কড়া স্কচের বোতলে মুখ রাখল। চুপচাপ বসে বসে মদ খেতে থাকল। একটু আগে যে অবিশ্বাস্য নাটকের দৃশ্যাবলি অভিনীত হল, সেগুলো ভাববার চেষ্টা করল। এখন তার আনন্দে চিৎকার করা উচিত। সে আর আলেকজান্দ্রার ওপর বিশাল ব্ল্যাকওয়েল সাম্রাজ্য স্থাপিত হতে চলেছে। আলেকজান্দ্রার হাত থেকে সহজে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। কিন্তু জর্জ মেলিস এখন একটা বিপদ সংকেত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই লোকটাকে জীবন থেকে সরাতেই হবে।

***

ইভ জর্জকে বলল পরিবর্তন করতে হবে। ষড়যন্ত্রটা পালটাবে। কেটি আমাকে সব কিছু দিয়ে দিয়েছে।

জর্জ সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল। বলল –সত্যি? অনেক অনেক ধন্যবাদ।

-এখন যদি আলেকজান্দ্রার কিছু হয় তাহলে সকলে সন্দেহ করবে। এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা পরে চিন্তাভাবনা করব।

–না, পরে আমি কখনও ভাবব না।

–তুমি কী বলতে চাইছ?

–আমি বোকা নই ডার্লিং, এখন যদি আলেকজান্দ্রার কিছু হয়, আমি তার সর্বস্ব পাব, তুমি আমাকে ছবির বাইরে রাখতে চাইছ? নিজেকে এত চালাক ভেবো না।

ইভ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল–তুমি কেন ব্যাপারটা জটিল করে তুলছ। তোমার সাথে অন্য একটা কথা আছে। তুমি ডিভোর্স নিয়ে নাও। আমার হাতে টাকা আসবে। আমি তোমাকে...

জর্জের মুখে হাসি–তোমার কথাটা একটা বাচ্চা ছেলে বিশ্বাস করবে। আমাকে বল না। কোনো কিছুই পরিবর্তিত হবে না। অ্যালেক্স আর আমি ডাকহারবারে যাব। শুক্রবার রাতে। আমি প্রতিজ্ঞাটা বজায় রাখব।

***

ইভ আর ঠাকুরমার ঝামেলা মিটে গেছে। এই খবরটা শুনে আলেকজান্দ্রা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলল–আবার আমাদের পারিবারিক বন্ধন ফিরে এল।

***

একটা টেলিফোন।

-হ্যালো, ইভ, আমি কি আপনাকে বিরক্ত করছি? আমি কেট ওয়েস্টার বলছি।

প্রতি সপ্তাহে ওই ভদ্রলোক নিয়ম করে দু-তিনবার ফোন করেন। প্রথম দিকে ইভের আচরণ তাকে অবাক করেছিল। পরবর্তীকালে তিনি ইভকে বুঝে ওঠার চেষ্টা করছেন।

ইভ বলল –আমি এখন আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারছি না। একটু বাইরে যাব।

কণ্ঠস্বরে একটা অদ্ভুত আকুতি।

-ঠিক আছে, আগামী সপ্তাহে ঘোড়দৌড়ের আসরের দুটো টিকিট আছে, আমি জানি, আপনি ঘোড়ার দৌড় দেখতে ভালোবাসেন।

-দুঃখিত, আমি আগামী সপ্তাহে শহরের বাইরে থাকব।

–আচ্ছা, পরের সপ্তাহে না হয় ঠিক করব আমরা। আপনি কোন খেলা দেখতে ভালোবাসেন?

–আমি সব কটা ঘোড়দৌড় দেখেছি। এখন আর দেখতে ইচ্ছে নেই।

এখন তাড়াতাড়ি সেজে উঠতে হবে। ররি ম্যাককানার সাথে একটা সাক্ষাৎকার করতে হবে। ররি হল এক তরুণ অভিনেতা। ব্রডওয়ের নাটকে মাঝে মধ্যেই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ইভের থেকে পাঁচ বছরের ছোটো, হা, সে একটা বুনো ঘোড়ার মতো। ইভ চোখ বন্ধ করল যৌনকাতর দৃশ্যগুলি তার মনের পর্দায় ভেসে উঠেছে। সে বুঝতে পারল দুটি পায়ের ফাঁকে ত্রিভুজ এখন জ্যাবজেবে হয়ে গেছে ঘাম এবং ক্ষরণে। একটা অসাধারণ সন্ধ্যা তাকে চুপি চুপি ডাকছে।

***

বাড়ি ফেরার পথে জর্জ মেলিস আলেকজান্দ্রার জন্য ফুল কিনেছিল। আজ তার মনটা আকাশ ছুঁয়েছে। আহা, কী অবাক করা কাণ্ড, বুড়ি শয়তানি ইভকে সবকিছু ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এতে কোনো কিছু পালটাবে না। আলেকজান্দ্রার অ্যাকসিডেন্টটা হয়ে যাবার পর সে ইভের দায়িত্ব নেবে। সব কিছু পাকাপাকি হয়ে আছে। শুক্রবার আলেকজান্দ্রা তার সাথে ডাকহারবার বেড়াতে যাবে। সে আলেকজান্দ্রার ঠোঁটে চুমু দিয়ে বলেছিল–শুধু তুমি আর আমি, চাকর-বাকরদের সঙ্গে নেব না কেমন?

***

পিটার টেমপ্লেটন কিছুতেই আলেকজান্দ্রা মেলিসের কথা ভুলতে পারছেন না। জর্জ মেলিসের শব্দগুলো তার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আমি ওকে কোথাও নিয়ে যাব। ওর একটা পরিবর্তন দরকার।

***

পিটারের কেবলই মনে হচ্ছে আলেকজান্দ্রার সামনে সমূহ বিপদ। কিন্তু তিনি কিছুই করতে পারছেন না। তিনি নিক পাপ্পাসের কাছেও তাঁর সন্দেহের কথা বলতে পারছেন না। কারণ তার হাতে কোনো প্রমাণ নেই।

***

শহরের মাঝখানে ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেডের এগজিকিউটিভ অফিস, কেটি ব্ল্যাকওয়েল এইমাত্র একটা নতুন ইচ্ছাপত্রে সই করলেন। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দুই নাতনির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল।

***

নিউইয়র্ক, টনি ব্ল্যাকওয়েল মনের সুখে ছবি আঁকছেন। স্যানাটোরিয়ামে বসে, আহা, রং আর রঙের খুন খারাপি খেলা। এমন ছবি যা বাচ্চা ছেলেও বুঝতে পারবে না। সেই সব ছবির দিকে তাকিয়ে টনির মুখে স্বর্গীয় হাসি ফুটে উঠছে।

***

শুক্রবার, সকাল দশটা, সাতান্ন মি:।

লা গার্ডিয়া এয়ারপোর্ট, একটা ট্যাক্সি ইস্টার্ন এয়ারলাইনসের শাটল টার্মিনালের সামনে এসে থেমেছে। ইভ ব্ল্যাকওয়েল নেমে এল। সে ড্রাইভারের হাতে একশো ডলারের বিল তুলে দিল।

ড্রাইভার বলল আমার কাছে চেঞ্জ নেই, অন্য কোনো টাকা নেই?

-না।

–তাহলে আপনি ভাঙিয়ে নিয়ে আসুন।

–আমার হাতে সময় নেই। আমাকে এখনই ওয়াশিংটন যেতে হবে।

সে তার হাতের কবজিতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল –সবটাই রেখে দাও।

ড্রাইভার অবাক হয়ে গেছে।

ইভ দ্রুত টার্মিনালে ঢুকে পড়ল। সে ডিপারচার গেটের দিকে ছুটে গেল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলল এখন ওয়াশিংটন যাব।

-এখুনি প্লেনটা উড়বে ম্যাডাম, আর একটু হলে আপনি উড়তে পারতেন না।

–হ্যাঁ, যেতেই হবে। কোথায় যাব?

–এত চিন্তা করছেন কেন? এক ঘণ্টার মধ্যে আর একটা শাটল ছাড়বে।

-না, আমাকে ওটাই ধরতে হবে।–ঠিক আছে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। এখানে কোনো কফিশপ আছে?

–না, ম্যাডাম, কিন্তু করিডরে কফি মেশিন আছে।

–ধন্যবাদ।

লোকটা ইভের দিকে তাকাল –আহা, এমন সৌন্দর্য আমি জীবনে দেখিনি।

***

শুক্রবার বেলা দুটো।

এটা দ্বিতীয় মধুচন্দ্রিমা, আলেকজান্দ্রা ভাবল। এই পরিকল্পনাটা তাকে উদ্দীপ্ত করেছে। চাকরবাকর কেউ থাকবে না। শুধু আমরা দুজন। অসাধারণ সপ্তাহ শেষের অভিজ্ঞতা। আলেকজান্দ্রা ডাকহারবারের দিকে এগিয়ে চলেছে। জর্জের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এত সুন্দর একটা প্রহর এগিয়ে আসছে। আলেকজান্দ্রা তার পরিচারিকাকে বলল–আমি চলে যাচ্ছি। সোমবার সকালে ফিরে আসব।

আলেকজান্দ্রা সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। টেলিফোনটা আর্তনাদ করতে শুরু করেছে। সে ভাবল, ওটা বাজুক, আমার এখনই অনেক দেরী হয়ে গেছে।

***

শুক্রবার, সন্ধ্যা সাতটা।

জর্জ মেলিস ইভের পরিকল্পনাটা নিয়ে বারবার চিন্তা করল। না, এর মধ্যে কোনো ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একটা মোটর লঞ্চ আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। আমরা ডাকহারবারে চলে যাব। আকাশে চাঁদের অকৃপণ জোছনধারা থাকবে। আলেকজান্দ্রা আর আমি পাশাপাশি ভেসে যাব। যখন আমরা সমুদ্রের মধ্যে চলে যাব, আমি যা খুশি করতে পারব। কিন্তু রক্তের কোনো চিহ্ন থাকবে না। তাহলে? তাহলে ধাক্কা দিয়ে শরীরটাকে ফেলে দিতে হবে। তারপর? ট্যাক্সি নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসতে হবে। কোনো একটা অজুহাত দেখালেই চলবে। আলেকজান্দ্রার দেহটা যেন না পাওয়া যায়, সমুদ্রের জল তাকে কোথায় নিয়ে চলে যাবে। যদি বা পাওয়া যায়? তাহলে? না, কিছুই হয়তো হবে না।

মোটর বোটটা ঠিক জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে। সব কিছু ঠিকঠাক, পরিকল্পনামাফিক।

জর্জ এগিয়ে গেল। আকাশে চাঁদের মৃদু আলো। সে অনেকগুলো নৌকা দেখল, কিন্তু কোনটা তার সেই আসল নৌকোটা?

টেলিফোনে কে যেন কথা বলছে, কার জন্য অপেক্ষা করছে, জর্জ ভেতরে এল, সে তাকাল, রিসিভারটা হাতে রাখল। আর বলল, ইভ, সে একটু কিছু ভাবল আমাকে এখন

যেতে হবে ইভ। আমার ডার্লিং এই মাত্র এসে গেছে। তোমার সঙ্গে আগামী সপ্তাহে লাঞ্চের আসরে দেখা হবে, কেমন?

সে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে আলেকজান্দ্রাকে আদর করল –তুমি এত তাড়াতাড়ি এলে যে?

–তোমাকে ছাড়া পৃথিবী অন্ধকার। সব কিছু ফেলে ছুটে এসেছি, সে চুমু খেয়ে বলল, তোমাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি।

–তোমাকেও আমি ভালোবাসি, চাকরদের আসতে বারণ করেছ?

মুখে হাসি–হ্যাঁ, তুমি যেমন বলেছিলে, শুধু তুমি আর আমি।

ভালোবাসার খেলা শুরু হয়েছে। পাতলা ফিনফিনে সিল্কের ব্লাউজের আড়াল থেকে বুকের দুটো ঈষৎ গোলাপী বৃন্ত জেগে উঠেছে। সেখানে ইচ্ছে করেই হাত রাখল জর্জ। মেয়েটাকে যৌনতার দিক থেকে উদ্দীপ্ত করতে হবে।

আমি ভাবতেই পারছি না, অফিসে বসে শুধু এই সুন্দর মুহূর্তটার কথা চিন্তা করেছি। তুমি আর আমি, আকাশে চাঁদ, ফুরফুরে হাওয়া, মনে হবে স্বর্গ যেন পকেটে।

-তুমি কী নেবে? তোমার জন্য কিছু তৈরি করব কি?

জর্জ স্তনটাকে মুঠিতে ধরার চেষ্টা করে বলল–ডিনার অপেক্ষা করতে পারে প্রিয়তমা, কিন্তু আমি অপেক্ষা করতে পারছি না।

-আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি পোশাকটা পালটে আসি। এক মিনিট লাগবে।

–খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু।

জর্জ ওপরে উঠে গেল। ক্লোসেটটা খুলল। পোশাকটা পালটে নিল। স্ল্যাক্স পরল। সোয়েটার আর নৌকো চালাবার জুতো। হা, উপযুক্ত সময়টা এসে গেছে। তার মনে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা, যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

মেয়েটির কণ্ঠস্বর শোনা গেল আমি তৈরি, ডার্লিং। সে তাকাল। দেখতে পেল আলেকজান্দ্রাকে। সোয়েটার পরেছে। কালো স্ল্যাক্স। ক্যানভাসের জুতো। তার লম্বা সোনালী চুল রাত বাতাসে উড়ছে। ছোট্ট নীল রিবন দিয়ে বেঁধে রাখার চেষ্টা করেছে। আহা, সে এত সুন্দরী। কিন্তু এই সৌন্দর্য অবিলম্বে নষ্ট হবে।

-আমিও তৈরি, জর্জ বলল।

***

মোটর লঞ্চটা এগিয়ে চলেছে। সে বলল- এটা কী হচ্ছে?

-ওখানে একটা ছোট্ট দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপটাকে আজ আমরা আবিষ্কার করব। আমরা সেখানে মোটর লঞ্চটাকে রাখব। চিন্তা নেই, তোমার ভয় করবে না।

হ্যাঁ, সব কাজ এগিয়ে চলেছে। এই তো, মোটর লঞ্চ তরতর করে এগিয়ে চলেছে, অন্ধকার রাত, মৃদুমন্দ চাঁদের আলো। চমৎকার বাতাস বইছে।

সে বলল–আহা, বন্যতার মধ্যে আলাদা সৌন্দর্য! তুমি আমাকে সুখী করেছ, ডার্লিং।

জর্জের মুখে হাসি –আমিও সুখী হয়েছি।

জর্জ মেলিস আদর দেবার চেষ্টা করল। আহা, এই মেয়েটা যেন মৃত্যুর মধ্যে কোনো যন্ত্রণা না পায়। সে আকাশের দিকে তাকাল। কাছাকাছি কোনো নৌকো চোখে পড়ছে না। অনেক দূরে মৃদু আলোর রেখা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখনই সুযোগ এসেছে।

সে বোটটাকে ঘোরাল। শেষবারের মতো দিগন্ত রেখার দিকে তাকাল। তার হৃৎপিণ্ড লাফাতে শুরু করেছে।

সে বলল –অ্যালেক্স, আমার দিকে তাকাও।

অ্যালেক্স তাকাল–হ্যাঁ, বীভৎস হাসিতে ভরে উঠছে জর্জের মুখমণ্ডল।

জর্জ আদেশের সুরে বলল আমার কাছে এসো।

সে এগিয়ে এসেছে। সে জর্জের দিকে তাকাচ্ছে। জর্জ তাকে চুমু দিল উন্মত্তের মতো। তাকে আদর করছে, আরও জোরে, আরও জোরে, কিন্তু? হাত দুটো গলার ওপর নেমে আসছে কেন?

না, সে আর থাকতে পারছে না। কোনোরকমে সে বলল –জর্জ!

জর্জ আরও জোরে তাকে চেপে ধরেছে–এবার–এবার বোধ হয় সেই মুহূর্তটা।, তাকে রেলিং-এর ওপর তুলে দেওয়া হয়েছে। তার পা দুটো থরথর করে কাঁপছে। সে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ জর্জের বুকে অসহ্য যন্ত্রণা। সে ভাবল, তার বোধহয় হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। সে মুখ খোলার চেষ্টা করল। মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত ছুটে আসছে। সে আর আলেকজান্দ্রাকে ধরে রাখতে পারল না। তাকিয়ে থাকল নিজের ক্ষতবিক্ষত শরীরটার দিকে। হ্যাঁ, ক্ষত চিহ্ন দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। তার সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে? শয়তানির মতো? সে হল ওই মেয়েটি, তার হাতে একটা ছুরি লকলক করছে।

মৃত্যুর আগে জর্জ মেলিস অস্পষ্ট আর্তনাদে উচ্চারণ করেছিল ইভ! তুমি!

.

৩৪.

পরের দিন রাত দশটা। আলেকজান্দ্রা ডাকহারবারে এসে পৌঁছেছে। জর্জের সাথে টেলিফোনে যোগাযযাগ করতে পারছে না। যতবার ফোন করছে, কোনো উত্তর পাচ্ছে না। কী হয়েছে, সে কিছুই বুঝতে পারছে না। সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। আলেকজান্দ্রা ডাকহারবারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল, ফোনটা বাজল। সে ভেবেছিল,

ফোন ধরবে না। গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু পরিচারিকা এসে বলল–মিসেস মেলিস, বোনের ফোন। বোন বলছেন, খুব তাড়াতাড়ি।

আলেকজান্দ্রা টেলিফোনটা ধরল। ইভ বলেছিল –ডার্লিং, আমি ওয়াশিংটন ডিসিতে এখন আছি। সাংঘাতিক সমস্যা হয়েছে। তুই এখুনি আমার কাছে চলে আয়।

–অবশ্যই যাব। কিন্তু কী করে যাব বলতো। আমাকে এখন ডাকহারবারে যেতে হবে, জর্জের সঙ্গে দেখা করতে হবে। সোমবার সকালে ফিরে আসব।

-না-না, আমার সমস্যাটা ভয়ংকর। তোকে ফোনে আমি বলতে পারছি না। তুই আমার সঙ্গে এয়ারপোর্টে দেখা কর। আমি পাঁচটার সময় সেখানে থাকব।

–আমি যাব ইভ, কিন্তু জর্জকে বলতে হবে।

–ব্যাপারটা কেন বুঝতে পারছিস না, অ্যালেক্স। তবে তুই কি খুব ব্যস্ত?

–না-না, আমি পৌঁছে যাচ্ছি।

-ধন্যবাদ, ডার্লিং, আমি জানি, তুই আমাকে কতটা ভালোবাসিস।

আলেকজান্দ্রা ভাবল, তাকে আমি ফেরাই কী করে? সে নয় অন্য কোনো প্লেন ধরে ওই দ্বীপে পৌঁছে যাবে। সে জর্জের অফিসে ফোন করল। খবরটা দেবার জন্য। জর্জকে পেল না। সে তার সেক্রেটারির কাছে খবরটা পৌঁছে দিল। একঘণ্টা বাদে সে ট্যাক্সি করে বিমানবন্দরের দিকে এগিয়ে গেল। ওয়াশিংটন থেকে একটা প্লেন আসছে। কিন্তু সেই

প্লেনে ইভ কোথায়? আলেকজান্দ্রা প্রায় দুঘণ্টা অপেক্ষা করেছিল। ইভের কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। আলেকজান্দ্রা জানে না, কীভাবে ইভের সঙ্গে দেখা করবে। না, অপেক্ষা করাটাই। সার হল। আলেকজান্দ্রা প্লেন ধরে ওই দ্বীপে চলে এল। তখন সে সিডারহিল হাউসের দিকে এগিয়ে চলেছে। বাড়িটা অন্ধকার। জর্জ নিশ্চয়ই এসে গেছে। আলেকজান্দ্রা একটার পর একটা ঘরের আলো জ্বালল। জর্জের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকল। না, জর্জের কোনো চিহ্ন নেই। সে ম্যানহাট্টনের বাড়িতে ফোন করল। কাজের মেয়েটি বলল, মি. মেলিস তো এখানে নেই? আপনারা দুজন তো একসঙ্গে ছুটি কাটাবেন।

-ধন্যবাদ, ম্যাগি। ও বোধহয় কোথাও আটকে গেছে।

এই অনুপস্থিতির অন্তরালে কী কারণ আছে? শেষ মুহূর্তে দরকারী কোনো কাজ? পার্টনাররা হয়তো জর্জের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে জর্জ চলে আসবে। সে ইভের নাম্বারে ফোন করল।

আলেকজান্দ্রা বলল –ইভ? কী রে তুই এলি না কেন?

–সে কী? আমি তো কেনেডিতে অপেক্ষা করছিলাম। তুই তো আসিসনি?

–কেনেডি কেন? তুই তো বললি গুয়াটিয়া।

–না, ডার্লিং, কেনেডি।

–ঠিক আছে, আমি দুঃখিত। আলেকজান্দ্রা বলল, আমি হয়তো ভুল শুনেছি। তুই ঠিক আছিস তো?

ইভ বলল আমার একটা সাংঘাতিক সমস্যা হয়েছিল। ওয়াশিংটনে একটা লোকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম। সে লোকটার রাজনৈতিক প্রতিপত্তি আছে। ফোনে সবকিছু বলতে পারছি না। ফোন কোম্পানি আমাদের দুজনের ফোন কেড়ে নেবে। সোমবার দেখা হলে সব বলব, কেমন?

আলেকজান্দ্রা বলল ঠিক আছে। হ্যাঁ, পাষাণ ভার মাথা থেকে নেমে গেছে।

ইভ বলল–এ সপ্তাহের ছুটিটা ভালো করে কাটাস। জর্জ কোথায়?

-জর্জ এখনও আসেনি। আলেকজান্দ্রা তার উদ্বিগ্নতা আড়াল করার চেষ্টা করল। মনে হচ্ছে ব্যবসায়ের কোনো কাজে সে আটকে পড়েছে।

-এখুনি তার কাছ থেকে খবর শুনতে পাবি। শুভরাত, ডার্লিং।

–শুভরাত, ইভ।

আলেকজান্দ্রা রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ভাবল, ইভের হাতে কোনো ভালো ছেলে এলেই বোধহয় ভালো হয়। জর্জের মতো একটা ভালো স্বামী। সে ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত এগারোটা বেজে গেছে। যে কোনো মুহূর্তে জর্জ চলে আসবে।

সে টেলিফোন করল ব্রোকারেজ ফার্মে, কোনো উত্তর নেই। সে ক্লাবে ফোন করল। না, মি. মেলিসকে কদিন ধরেই সেখানে দেখা যাচ্ছে না।

মধ্যরাত, আলেকজান্দ্রার মন এবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। রাত একটা, তার মনের ভেতর ভয়ের বাতাবরণ। সে জানে না কী করবে? জর্জ কি কোনো ক্লায়েন্টের সঙ্গে বাইরে চলে গেছে? টেলিফোন করতে পারছে না? নাকি অন্য কোথাও উড়ে গেছে? শেষ মুহূর্তে খবরটা দেবার সুযোগ পায়নি? এমনই একটা সমাধান হতে পারে হয়তো। যদি সে পুলিশকে ডাকে, আর যদি জর্জ তখনই ঢুকে পড়ে তাহলে বোকার মতো কাজ হবে।

রাত্রি দুটোর সময় সে পুলিশের সাহায্য নিল। এখানে কোনো পুলিশ পোস্ট নেই। সব থেকে কাছাকাছি থানা আছে ওয়ালডোকা উল্টিতে।

ঘুমন্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।–ওয়ালডো কাউন্ট্রি সেরিভেল বিভাগ, সার্জেন্ট ল্যাম্বার্ট।

–আমি মিসেস জর্জ মেলিস, সিডারহিল হাউস থেকে বলছি।

–মিসেস মেলিস, কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণতা, বলুন কী করব?

মনে হচ্ছে, আলেকজান্দ্রা কিন্তু কিন্তু করল, আমার স্বামীর আসার কথা ছিল আজ সন্ধ্যেবেলা। কিন্তু এখনও সে আসেনি।

–দেখছি।

কথার মধ্যে নানান প্রশ্ন।–রাত্রি দুটো। স্বামী এখনও আসেনি? আহা, কত কিছুই তো আছে এখানে। লাল চুলের সর্বনাশিনীরা। বাদামী চুলের বেশ্যারা, সোনালী চুলের মোহিনীরা।

সে বলল–ব্যবসার কাজে হয়তো উনি আটকে গেছেন।

...না-না, সে ফোনও করেনি।

-মিসেস মেলিস, হয়তো এমন অবস্থা যে, উনি ফোন করতে পারেননি। যে কোনো সময় ফোন আসবে।

হ্যাঁ, হয়তো আমি বোকার মতো কাজটা করলাম। পুলিশের সাহায্য নেওয়া উচিত হয়নি। জর্জ তো হারিয়ে যায়নি। সে আসতে একটু দেরী করেছে।

***

সকাল সাতটার ফেরি, সেখানেও জর্জ নেই, আলেকজান্দ্রা ম্যানহাট্টন হাউসে আবার ফোন করল জর্জের কোনো খবর নেই।

আলেকজান্দ্রার মনে নানা সন্দেহের বাতাবরণ। জর্জের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। সে হাসপাতালে আছে। অসুস্থ হয়ে পড়েছে, অথবা মরে গেছে। ইভের সাথে ওই ঝামেলাটা না হলে সে ঠিক সময়ে পৌঁছে যেত। কিন্তু জর্জ কোথায় গেল? আলেকজান্দ্রা আবার সব জায়গায় দেখল। কোনো সম্ভাব্য সূত্র আছে কিনা। সব কিছু একই রকম আছে। সে

পাহাড়ের দিকে চলে গেল। কী? প্রমোদ তরণীটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে এতটুকু বিপদের আঁচ লাগেনি।

সে আবার পুলিশের কাছে ফোন করল। লেফটেন্যান্ট ফিলিপ বছর কুড়ি ধরে কাজ করছেন। মর্নিং ডিউটিতে ছিলেন। তিনি শুনতে পেলেন জর্জ মেলিস রাতে বাড়ি ফেরেনি। না, এখনই ব্যাপারটা দেখতে হবে।

তিনি আলেকজান্দ্রাকে বললেন মিসেস মেলিস, ওনার কোনো চিহ্ন নেই? আমি নিজেই আসছি।

হ্যাঁ, বাজে সময় নষ্ট হয় তো অন্য কোথাও বসে আছে, কিন্তু ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের সম্মানযুক্ত। এ ব্যাপারে এতটুকু ঢিলে দিলে চলবে না।

***

লেফটেন্যান্ট ফিলিপ এসে গেছেন। আলেকজান্দ্রার গল্পটা ভালো করে শুনলেন। সব কিছু দেখলেন। শেষ পর্যন্ত মনে হল, জর্জ মেলিসের সত্যি কোনো সমস্যা হয়েছে। ডাকহারবারে উনি আসেননি কেন? লেফটেন্যান্ট সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করলেন। সব জায়গায় ফোন করলেন। জর্জ মেলিসের চিহ্ন পাওয়া গেল না। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে নোকটার কোনো হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে? লোকটা গেল কোথায়?

***

লেফটেন্যান্ট স্টেশনে ফিরে এলেন, হসপিটাল এবং মর্গে ফোন করলেন। সব জায়গাতে একই উত্তর পাওয়া গেল। অ্যাকসিডেন্টের কোনো খবর নেই। এবার তিনি তার রিপোর্টার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করলেন। বুলেটিন বের করতে হবে।

বিকেলবেলা কাগজে গল্পটা বেরাল ব্ল্যাকওয়েল সাম্রাজ্যের ভাবী সম্রাজ্ঞীর স্বামী হারিয়ে গেছেন।

পিটার টেমপ্লেটন খবরটা পেলেন ডিটেকটিভ নিক পাপ্পাসের কাছ থেকে। খবরটা পেয়ে তিনি কেমন যেন হয়ে গেছেন। হতেই পারে না, জর্জ এভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল কেন?

এর অন্তরালে কী কারণ থাকতে পারে, উনি বুঝতেই পারছেন না।

***

তিরিশ মিনিট কেটে গেছে। আলেকজান্দ্রা পিটার টেমপ্লেটনকে ফোন করল। হ্যাঁ, আলেকজান্দ্রার কণ্ঠস্বরে কেমন একটা বিষণ্ণতা –জর্জ হারিয়ে গেছে। সে কোথায় আছে আমি জানি না। কী হবে বলুন তো।

–আমি দুঃখিত মিসেস মেলিস। এমনটি হতেই পারে না।

–আঃ, কী যে হবে আমার।

পিটার ভাবলেন, এখন ওখানে গেলে ভালো হত।

–আমি এখন ডাকহারবারে আছি। নিউইয়র্কে ফিরে যাব আজ বিকেলবেলা। ঠাকুরমার কাছে চলে যাব।

আলেকজান্দ্রা এই সরল সত্যটা বিশ্বাস করতে পারছে না। বেশ কয়েকবার কেটিকে ফোন করল।

কেটি বললেন সোনামনি এত চিন্তা করো না। ও হয়তো ব্যবসার কাজে কোথাও আটকে গেছে। আর তোমার কথা ভুলে গেছে।

কেটি জানেন, এটা নেহাতই একটা সান্ত্বনা।

***

টেলিভিশনে জর্জের হারিয়ে যাবার খবরটা ভেসে উঠেছে। সিডারহিল হাউসের অনেকগুলো ছবি। আলেকজান্দ্রা এবং জর্জের বিয়ের অনুষ্ঠান। জর্জের ক্লোজ আপ ছবি– ওপর দিকে তাকিয়ে আছে, চোখ দুটো প্রসারিত।

ইভের মনে পড়ল, মৃত্যুকালীন অভিব্যক্তি।

টেলিভিশনে ভাষ্যকার বলছেন এই মানুষটির কোনো চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না। এ যেন বাতাসে ভর রেখে হারিয়ে গেছে। পুলিশ মনে করছে, জর্জ মেলিসের ভয়ঙ্কর অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। অথবা স্মৃতিভ্রংশ হয়ে গেছে তার।

ইভ হাসল, মনে মনে।

সূচিপত্র

তারা কখনওই মৃতদেহটা খুঁজে পাবে না। জোয়ারের জল তাকে দূর সমুদ্রে নিয়ে গেছে। হতভাগ্য জর্জ, পরিকল্পনাটা সুন্দরভাবে করা হয়েছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে একটু পরিবর্তন আনতে হয়েছে।

ইভ মাইনেতে চলে গিয়েছিল। মোটরবোট নিয়ে কোভে ফিরে আসে। তারপর? আর একটা মোটরবোট নিয়ে ডাকহারবারে। জর্জের জন্য অপেক্ষা করে। হ্যাঁ, সব ব্যাপারটা গুছিয়ে করেছে।

একটা অসামান্য হত্যার পরিকল্পনা। পুলিশ এটাকে রহস্যজনক নিরুদ্দেশ বলেই চিহ্নিত করবে।

ঘোষক বলে চলেছে এবার অন্যান্য খবর।

ইভ টেলিভিশনের সুইচ বন্ধ করে দিল।

ররির সাথে দেখা করতে হবে। সুন্দর সময়টাকে সে অযথা হত্যা করতে চায় না।

***

পরের দিন সকাল ছটা। মাছ ধরার একটা নৌকো জর্জ মেলিসের মৃতদেহটা পেয়েছে। ব্যাকওয়াটারে পড়েছিল। খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। হ্যাঁ, এটা নেহাতই একটা দুর্ঘটনা। জলে ডুবে মৃত্যু। আর কোনো খবর? খবরটা পালটে গেল। করোনারের অফিস থেকে রিপোর্ট এসেছে। হিংস্র হাঙরের দল তাকে খাবলে খাবলে খেয়েছে। সান্ধ্য

সংস্করণে প্রকাশিত হল সেই হৃদয়বিদারক সংবাদ জর্জ মেলিসের মৃত্যুর অন্তরালে মৃত্যুর পরিকল্পনা। গায়ে ছুরির আঘাত।

***

লেফটেন্যান্ট আগের দিনের জোয়ার ভাটার ছবিটা দেখছিলেন। কাজটা শেষ হল। তিনি চেয়ারে ঝুঁকে পড়লেন। মুখে একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি। জর্জ মেলিসের দেহটা দূর সমুদ্রে চলে যেত, নেহাত ব্যাকওয়াটারে আটকে গিয়েছিল তাই। লেফটেন্যান্ট বুঝতে পারছেন না, কী ভাবে এই ঘটনাটা ঘটল। ওখানে তো জর্জের থাকার কথা ছিল না।

***

ডিটেকটিভ নিক পাপ্পাস মাইনেতে উড়ে এসেছেন, লেফটেন্যান্টের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

–আমার ডিপার্টমেন্ট কি আপনাকে সাহায্য করবে? নিক বললেন, জর্জ মেলিস সম্পর্কে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আমি দেব। তবে এটা আমাদের আলোচনার বাইরে। যদি আপনি আমার সহযোগিতা চান।

গত কুড়ি বছর ধরে লেফটেন্যান্ট সেরিবে ডিপার্টমেন্টে কাজ করছেন। জীবনে এমন ঘটনার সামনে তাকে দাঁড়াতে হয়নি। আসলে এখানে শান্তির বাতাবরণ বিরাজ করে। অনেক বছর আগে একটা মাতাল লোক অন্য লোকের সঙ্গে ঝামেলা করেছিল। এখন জর্জ মেলিসের হত্যাকাণ্ড খবরের কাগজের প্রথম পাতায় চলে এসেছে। সঙ্গত কারণেই

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

লেফটেন্যান্টের মন ভালো নেই। এখন হয়তো নাম কেনা যেতে পারে। নিউইয়র্ক সিটি পুলিশের এই ডিটেকটিভের কাছ থেকে কোন খবর পাওয়া যাবে?

তিনি নিক পাপ্পাসের দিকে তাকিয়ে বললেন আমি জানি না, আপনি আমার কতটা সাহায্য করতে পারবেন।

নিক পাপ্পাস বললেন আমি কি কিছু তথ্য আপনাকে দেব? জর্জ মেলিসের পটভূমিকা সম্পর্কে?

-হ্যাঁ দিতে পারেন।

***

আলেকজান্দ্রা বিছানাতে বসে আছে। এই ঘটনাটা সে বিশ্বাস করতে পারছে না। জর্জকে কে কেন হত্যা করল? এর অন্তরালে কোন কারণ আছে? পুলিশ বলেছে, তার শরীরে ছুরির আঘাত আছে। কিন্তু কেন? এটা কি একটা দুর্ঘটনা? কেউ তাকে হত্যা করবে না। ডঃ হার্টলে তাকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেছেন। অবশেষে আলেকজান্দ্রা ঘুমিয়ে পড়ল।

***

জর্জের মৃতদেহটা পাওয়া গেছে এই খবর শুনে ইভ অবাক হয়ে গেছে। কিন্তু এতে ভালোই হল। আলেকজান্দ্রাকে একজন সম্ভাব্য হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। কারণ আলেকজান্দ্রা তখন ওই দ্বীপে ছিল।

কেটি কৌচে বসে আছেন। ইভের পাশে, ড্রয়িংরুমে। এই খবরটা কেটিকে যথেষ্ট দুঃখ দিয়েছে।

–কেউ কেন জর্জকে মেরে ফেলল? কেটি জানতে চাইলেন।

ইভ দীর্ঘশ্বাস ফেলল– ঠাম্মা, সত্যি আমি জানি না। অ্যালেক্সের জন্য কষ্ট হচ্ছে।

***

লেফটেন্যান্ট ফেরিলোকটিকে প্রশ্ন করলেন, জানতে চাইলেন মিস্টার অথবা মিসেস মেলিস এই ফেরিতে আসেননি তো, শুক্রবার বিকেলবেলা?

-না, আমি তো ওনাদের দেখিনি, স্যার। আমি সকালের লোকটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সেও ওদের দেখেনি। তারা বোধহয় প্লেনে চড়ে এসেছে।

–আর একটা প্রশ্ন, শুক্রবার কোনো অচেনা লোক কি ফেরি নিয়েছিল?

-না, লোকটি বলল, আমরা অচেনা লোককে তো আসতে দিই না। গরমকালে দু একজন ট্যুরিস্ট অবশ্য আসে। নভেম্বরে কেউ আসে না।

লেফটেন্যান্ট এয়ারপোর্টের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বললেন।

–জর্জ মেলিস ওদিন রাতে আসেনি তো? সে হয়তো ফেরিতে এসেছে।

–ফেরির লোকটি কিন্তু তাকে দেখেনি।

–তাহলে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

মিসেস মেলিস? হ্যাঁ, উনি এখানে এসেছিলেন রাত্রি দশটার সময়। আমার সঙ্গে আমার ছেলে চার্লি ছিল। চার্লি তাকে সিডারহিলে নিয়ে গিয়েছিল। এয়ারপোর্ট থেকে।

–মিসেস মেলিসকে দেখে কী মনে হচ্ছিল?

–হাসিখুশী, ফুটন্ত জলের মতো টগবগে। আমার ছেলেও তার এই খুশীয়াল স্বভাবটা লক্ষ্য করেছিল। সাধারণত মেয়েটি খুবই শান্ত থাকে। সকলের সাথে ধীরে ধীরে কথা বলে। কিন্তু সেই রাতে সে যেন খুব তাড়াতাড়ি আসতে চাইছিল।

–আর একটা প্রশ্ন, সেদিন সন্ধ্যেবেলা কিংবা বিকেলে কোনো অচেনা লোক কি বিমানে এসেছিল? কোনো একদম নতুন ছবি?

-না, যারা আসে তারাই এসেছে।

এক ঘন্টা কেটে গেছে। লেফটেন্যান্ট একের পর এক ফোন করছেন। নিক পাপ্পাসকে একটা ফোন করে বললেন এই খবর পেয়েছি। সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। শুক্রবার রাতে মিসেস মেলিস তার ব্যক্তিগত বিমানে ইসলেবোনরা এয়ারপোর্টে নেমেছিলেন রাত্রি দশটার সময়। স্বামী সঙ্গে ছিলেন না। মিস্টার মেলিস কিন্তু প্লেন কিংবা ফেরিতে আসেননি। কেউ তাকে দেখতে পায়নি। তিনি এলেন কী করে?

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

-হ্যাঁ, একজন দেখেছিল ওই সমুদ্রের জোয়ার।

–আপনি ঠিকই বলেছেন।

–যে তাকে হত্যা করেছে। সে নৌকো থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। ভেবেছিল, সমুদ্র তাকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে। প্রমোদ তরণীটা দেখেছেন?

-হ্যাঁ, দেখেছি, হিংসার কোনো চিহ্ন নেই, রক্তের কোনো দাগ নেই।

ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের লোককে পাঠানো উচিত। আপনি কি কিছু মনে করবেন?

–না, আমি কিছুই মনে করব না।

***

নিক পাপ্পাস একদল বিশেষজ্ঞকে পাঠালেন। তিনিও নিজে এসে উপস্থিত হলেন। লেফটেন্যান্ট তাদের ব্ল্যাকওয়েল ডকে নিয়ে গেলেন। হা, ওই তো, নৌকোটা বাঁধা আছে।

দুঘন্টা কেটে গেছে। ফরেনসিক এক্সপার্টরা বললেন আমরা একটা জ্যাকপট খেলছি, নিক। রক্তের সামান্য দাগ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ওপর থেকে দেখলে বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

সেদিন বিকেলবেলা, পুলিশ ল্যাবরেটরি ওই রক্তের দাগ পরীক্ষা করল, হা, জর্জ মেলিসের রক্তের গ্রুপের সঙ্গে মিলে গেছে।

তাহলে? কী হতে পারে? কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

পিটার এসে পাপ্পাসের সঙ্গে দেখা করলেন।

–পিটার কেমন আছেন?

–কিছু এগোল?

–না, এখনও কিছু বুঝতে পারছি না।

ব্যাপারটা আমাদের অবাক করছে।

–ওকে কি বাড়ির মধ্যে হত্যা করা হয়?

–না-না, ব্ল্যাকওয়েলদের নিজস্ব প্রমোদ তরণীতে। তারপর মৃতদেহটা ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল। লোক্টা ভেবেছিল, সমুদ্রের জল তাকে দূরে নিয়ে যাবে।

-তাই নাকি?

নিক পাপ্পাস হাত তুলে বললেন আমি এবার চেষ্টা করছি। মেলিস তো আপনার রোগী ছিলেন। বউ সম্পর্কে কোনো কথা কি উনি বলেছেন?

–একথা জিজ্ঞাসা করার অর্থ?

–হা, আলেকজান্ড্রাকে আমি আততায়ী হিসেবে চিহ্নিত করতে চলেছি।

–আপনার কি মাথা খারাপ?

-না, আমার মনে হচ্ছে, আলেকজান্ড্রা কোনো কারণে স্বামীর হাত থেকে অব্যাহতি পেতে চেয়েছিলেন।

–নিক, আলেকজান্ড্রা কেন তার স্বামীকে হত্যা করবে?

–হ্যাঁ, একটা কারণ তো আছেই। সেদিন রাতে আলেকজান্ড্রা এই দ্বীপে এসেছিলেন। কেন দেরী হয়েছিল, তার কোনো গ্রহণযোগ্য কথা বলতে পারেননি। উনি বলেছেন, ভুল এয়ারপোর্টে গিয়েছিলেন বোনের সঙ্গে দেখা করার জন্য।

–বোন কী বলেছেন?

–কী করে বিশ্বাস করব? বোনের কথার সাথে ওনার কথা মিলছে না। আমরা জর্জ মেলিসকে সেই রাতে বাড়িতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মেয়েটি বলেছেন, উনি জর্জকে দেখেননি। মস্ত বড়ো বাড়ি পিটার, কিন্তু এত বড়ো কি?

..আর একটা খবর শ্রীমতী সব চাকরদের ছুটি দিয়েছিলেন। এটা নাকি জর্জের পরিকল্পনা। কিন্তু জর্জের মুখ তো চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে।

পিটার জানতে চাইলেন আলেকজান্ড্রার মোটিভটা কী?

-আপনার কি মনে আছে? আপনি একসময় আমাকে একটা কথা বলেছিলেন। জর্জ নাকি মানসিক দিক থেকে অসুস্থ ছিলেন। যখন তখন অত্যাচার করতেন।

-কে বলেছে এসব কথা?

-হ্যাঁ, আপনিই তো বলেছিলেন, মনে হচ্ছে আলেকজান্দ্রা বোধ হয় এইভাবে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল।

–নিক, আমি একথা বিশ্বাস করি না। ওনাদের দাম্পত্য জীবনটা খুবই সুখের ছিল।

নিক বললেন আমাকে ভুল বুঝবেন না, বন্ধু। আমি ডঃ জন হার্টলের সাথে কথা বলেছি। উনি আলেকজান্দ্রা মেলিসকে ওষুধ দিতেন। কেন বলুন তো? আলেকজান্দ্রা যাতে আত্মহত্যা না করেন!

***

ডঃ জন হার্টলে লেফটেন্যান্ট পাপ্পাসের সাথে কথা বলেছেন।

ডিটেকটিভ অনেক কথা জানার চেষ্টা করেছেন মিসেস মেলিস কি আপনার কাছে আসতেন?

-আমি দুঃখিত, কোনো রোগীর ব্যাপারে আমি কোনো সাহায্য করতে পারব না।

-ডাক্তার, বুঝতে পারছি। আপনি আমার পুরোনো বন্ধু, আপনি যদি মুখ বন্ধ করে রাখেন তাহলে অসুবিধা হবে। এটা হত্যার ঘটনা। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে একটা ওয়ারেন্ট নিয়ে আসব। তখন আপনার সঙ্গে কথা বলব। আমি যা জানতে চাইছি, সব জবাব আপনাকে দিতেই হবে।

ডঃ হার্টলে তাকিয়ে থাকলেন–হ্যাঁ, আমার রোগিনীর মন ভালো ছিল না। আলেকজান্দ্রার মধ্যে আবেগজনিত সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

-কী ধরনের সমস্যা?

–ও হতাশায় ভুগত। আত্মহত্যা করতে চাইত।

–ও এ কথা বলেছে?

-না, ও একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখত, কেউ ওকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। আমি ওকে ওষুধ দিয়েছি। এই ওষুধে কোনো কাজ হয়নি। আমি আরও বেশি দামের ওষুধ দিয়েছি, আমি জানি না, এই ওষুধ খেয়ে কাজ হয়েছে কিনা?

নিক পাপ্পাস বললেন –আর কিছু?

-না, এটাই আমার শেষ গল্প, লেফটেন্যান্ট।

***

আরও কিছু বলার ছিল, জন হার্টলে বোধহয় সেগুলো বলতে চাননি। হ্যাঁ, জর্জ মেলিস ইভ ব্ল্যাকওয়েলকে কীভাবে মেরেছেন, সে গল্পটা উনি বলেননি। এটা বলা হয়তো উচিত ছিল না। কারণ এর সাথে ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের সুনাম জড়িয়ে আছে।

***

পনেরো মিনিট কেটে গেছে, নার্স বললেন, ডঃ কেট ওয়েস্টার লাইনে আছেন, দু নম্বর লাইনে, ডাক্তার।

কেট ওয়েস্টার বললেন –জন, বিকেলে আপনার সঙ্গে কথা বলব।

–কখন?

–পাঁচটা।

–ঠিক আছে কেট, তখন দেখা হবে।

পাঁচটা বেজেছে। ডঃ হার্টলে কেটকে দেখতে পেয়ে বললেন –ড্রিঙ্ক নেবেন?

-না, ধন্যবাদ। জন, এখন এসেছি বলে ক্ষমা করবেন।

জন হার্টলের সাথে অনেক দিন বাদে কেট ওয়েস্টারের দেখা হল। তারা কোনো একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন।

–কেট, বলুন, কী জানতে চাইছেন?

কেট ওয়েস্টার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন–জর্জ মেলিস ইভ ব্ল্যাকওয়েলকে মাঝে মধ্যেই মারত, তাই তো?

-কেন?

–ইভ তো প্রায় মরেই গিয়েছিল।

–হ্যাঁ।

-পুলিশের কাছে ঘটনাটা বলা হয়নি, এখন মেলিসের হত্যাকাণ্ডে সব ব্যাপারটা নতুন করে ভাবতে হবে।

তার মানে, আপনি কী বলতে চাইছেন।

–আমি পুলিশকে সব কথা জানাব।

কেট ওয়েস্টার শান্তভাবে বললেন। তারপর বললেন আমি জানি, এই ঘটনাটা ইভ ব্ল্যাকওয়েলের সুনামের পক্ষে ভালো হবে না।

ডঃ হার্টলে বললেন –হ্যাঁ, ইভ কিন্তু যথেষ্ট নামজাদা নারী।

কেট বললেন একটাই কথা বলা যেতে পারে, আমাদের মধ্যে একটা গোপন চুক্তি হলে ভালো হয়।

জন হার্টলে তাকালেন। তিনি বললেন কী ধরনের চুক্তি? এই খবরটা পুলিশের কাছে কখনও জানাবেন না, তাই তো? কিন্তু আপনি তো খুব সুন্দর চিকিৎসা করেছেন। তবে মাথায় একটা ছোট্ট লাল ক্ষতচিহ্ন রয়ে গেছে। আপনি হয়তো নজর করেননি।

কেট অবাক হয়েছেন কী ক্ষতচিহ্ন?

-কপালে ছোট্ট লাল দাগ। এক-দুমাসের মধ্যে সেটা সেরে যাবে। আপনি নাকি ওকে বলেছেন।

ডঃ ওয়েস্টার অবাক হয়ে গেলেন –এ কী আশ্চর্য ঘটনা?

-শেষ কবে আপনার সাথে ইভের দেখা হয়েছে?

–প্রায় দশদিন আগে। একটা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্যে ইভ এসেছিল। এই চিহ্নটা দেখেই আমি ইভকে চিনতে পেরেছিলাম। এছাড়া আলেকজান্ড্রার সাথে তার চেহারার অদ্ভুত মিল আছে।

কেট মাথা নাড়লেন–হ্যাঁ, আমি খবরের কাগজের পাতায় ইভের বোনের ছবি দেখেছি। অসাধারণ সাদৃশ্য। আপনি হয়তো মাথার ক্ষতচিহ্ন দেখে আলাদা করতে পেরেছেন। কিন্তু এই ক্ষতচিহ্ন থাকার কথা নয়।

ওয়েস্টার বসে থাকলেন, তারপর বললেন–এ বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে।

কেট, ওরা দুজনেই কিন্তু যথেষ্ট আকর্ষণীয়া তরুণী, খবরের কাগজ ওদের পেছনে লেগে থাকবে। অনেকে ভাববে, আলেকজান্দ্রা জর্জকে হত্যা করেছে। এটা কখনওই সম্ভব নয়। আমার মনে হয়, এব্যাপারে কোনো ভুল হচ্ছে। ওরা যখন এতটুকু শিশু, তখন থেকে ওদের আমি চিনি।

ডঃ ওয়েস্টার কিন্তু কিছুই শুনছেন না।

***

ডঃ হার্টলের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে কেট ওয়েস্টার ভাবনার সমুদ্রে ডুবে গেলেন। না, কখনওই ওই সুন্দর মুখে ক্ষতের চিহ্ন থাকবে না। কিন্তু জন হার্টলে ওই চিহ্নটা দেখেছেন। তার মানে? ইভের কি আর একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল? সে কি মিথ্যে কথা বলেছে?

তিনি সব দিক থেকে বিচার করার চেষ্টা করলেন।

পরের দিন সকালবেলা কেট ওয়েস্টার ডঃ হার্টলেকে ফোন করে বললেন–জন, আপনাকে বিরক্ত করছি বলে দুঃখিত। ইভ আপনার সাথে কথা বলতে এসেছিল? আলেকজান্দ্রার ব্যাপারে?

-হ্যাঁ।

–ইভের আসার পর আলেকজান্দ্রা কি আপনার সাথে দেখা করতে এসেছিল?

–হ্যাঁ, সে পরের দিন আসে। কেন?

-না, আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে। আমি কি জানতে পারি, ইভের বোন কেন এসেছিল?

–আলেকজান্দ্রার মনটা বিষাদাচ্ছন্ন হয়েছিল। ইভ তাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল।

তার মানে? ইভকে আলেকজান্দ্রার স্বামী মেরে ফেলতে চেয়েছিল। এখন এই লোকটা মারা গেছে। আলেকজান্দ্রার ওপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কেট ওয়েস্টার সব কটা ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করতে থাকলেন। কোনো সমাধানে পৌঁছোতে পারলেন না।

***

শেষ পর্যন্ত তিনি ইভকে ফোন করলেন। ইভের কণ্ঠস্বর- ররি? কণ্ঠস্বরে একটা অদ্ভুত মাদকতা।

–আমি কেট ওয়েস্টার।

–হ্যালো।

–কেমন আছো?

–ভালো।

–তোমার সঙ্গে দেখা হলে ভালো হত।

–আমি কারও সঙ্গে দেখা করছি না। তুমি হয়তো জানো, আমার জামাইবাবু মারা গেছে। আমি এখন শোক পালন করছি।

ট্রাউজারে হাত মুছলেন কেট–সেই জন্যই তোমার সাথে দেখা করতে চাইছি, ইভ। কয়েকটা খবর দেব।

-কী ধরনের খবর?

–ফোনে বলব না।

–কখন?

–এখন হলে ভালো হয়।

***

ইভের অ্যাপার্টমেন্ট। তিরিশ মিনিট কেটে গেছে। ইভ দরজা খুলে দিল–কী বলতে এসেছ?

কেট বললেন –এই এনভেলাপটা ধরো, কতকগুলো ফটোগ্রাফ।

-কোথা থেকে এল?

–তোমার ছবি?

–কেন কী হয়েছে?

–অপারেশনের পর তোলা হয়েছে।

—দাঁড়াও দেখছি।

–তোমার মাথায় কোনো দাগ নেই? ইভের মুখ পালটে গেল।

–কেট, বসো।

কেট উল্টোদিকে বসলেন। কৌচের একেবারে ধারে। হা, তিনি ইভের দিকে পরিষ্কার তাকাতে পারছেন। অনেক সুন্দরী মহিলাকে দেখেছেন, কিন্তু ইভ ব্ল্যাকওয়েল হল সবার থেকে বেশি সুন্দরী।

–পুরো গল্পটা আমি শুনতে চাইছি।

কিন্তু ইভ কি গল্পটা বলবে?

কেট ওয়েস্টারের কথা বলা শেষ হয়ে গেছে।

ইভ বলল তুমি এখানে বৃথাই সময় নষ্ট করছ। ওই ক্ষতচিহ্ন? আমি আমার বোনের সাথে মজা করছিলাম। আর কিছু নয়। আমার অনেক কাজ আছে।

কেট তখনও বসে আছেন– হা, তোমাকে বিরক্ত করছি বলে দুঃখিত। পুলিশে যাব নাকি?

–যেখানে খুশী তুমি যেতে পারো।

–হ্যাঁ, এই খবরটা আমি পুলিশের কাছে তুলে দেব।

ইভের মুখমণ্ডলে ভয়ের আকুতি। এই লোকটা কী চাইছে? ও কি আমাকে ভয় দেখাবে?

এই অ্যাপার্টমেন্টে জর্জ মেলিস প্রায়ই আসত। পুলিশের কাছে হয়তো তার প্রমাণ আছে। হা, সে মিথ্যে কথা বলেছে, সে ওয়াশিংটনে গিয়েছিল, জর্জ যেদিন মারা যায়, সেদিন। কিন্তু তার অ্যালিবাইটা টিকবে না। তাহলে? পুলিশ যদি জানতে পারে, জর্জ তাকে প্রায় মেরে ফেলতে চেয়েছিল, তাহলে মোটিভটা পরিষ্কার হবে।

সে বলল–তুমি কী চাইছ? টাকা?

-না।

–তাহলে কী?

–আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। ইভ, তোমার কিছু হলে আমি বেঁচে থাকব না।

মুখে কষ্টে উপার্জিত হাসি আমার কিছুই হবে না কেট, আমি যে কোনো অবস্থার সঙ্গে লড়াই করব। জর্জ মেলিসের মৃত্যুর সাথে এর কোনো যোগাযোগ নেই। এটা ভুলে গেলেই ভালো হয়।

হাতে হাত, একটু চাপ–ইভ, তোমাকে আমি ভালোবাসি। করোনারের রিপোর্টটা শনিবারে বেরিয়ে যাবে। আমি ডাক্তার। আমাকে ওই রিপোর্টটা পরীক্ষা করতে হবে এবং সব কিছু বলতে হবে।

কেট দেখতে পেল ইভের চোখে ভয়ার্ত ইশারা।

-তাহলে?

–ইভ, আমি একটা কথা বলছি, তুমি কি তা রাখবে?

—কী?

–একজন স্বামী কিন্তু কখনও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় না।

.

৩৫.

করোনারের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার দুদিন আগে বিয়েটা হয়ে গেল। প্রাইভেট চেম্বারের মধ্যে। কেট ওয়েস্টারকে বিয়ে করে ইভ একটা সম্ভাব্য বিপদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাইল।

***

ডিটেকটিভ লেফটেন্যান্ট নিক পাপ্পাসের একটা সমস্যা হয়েছে। জর্জ মেলিসের হত্যাকারী কে, তিনি সেটা জানেন, কিন্তু সর্বসমক্ষে বলতে পারছেন না। তিনি এই সমস্যাটা নিয়ে তার সুপিরিয়র ক্যাপটেন হ্যারল্ডের সাথে কথা বললেন।

হ্যারল্ড পাপ্পাসের কথা শুনে বললেন –নিক, এটা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া। তুমি এখনও তেমন কোনো সূত্র পাওনি। কোর্টের নোক সব শুনলে হাসাহাসি করবে।

লেফটেন্যান্ট পাপ্পাস বললেন আমি জানি, কিন্তু আমার সিদ্ধান্তের কোনো নড়চড় হবে না। আমি কি কেটি ব্ল্যাকওয়েলের সঙ্গে কথা বলব?

-কী জন্য?

–একটুখানি কথা বলতে হবে। উনি হয়তো কোনো খবর জানতে পারছেন না।

–সাবধানে পা ফেলো।

–হ্যাঁ, তাই করব।

–নিক মনে রেখো, উনি কিন্তু বৃদ্ধা মহিলা।

–তাইতো ওনার কথার ওপর নির্ভর করতে হবে।

.

কেটি ব্ল্যাকওয়েলের অফিস। নিক পাপ্পাস পৌঁছে গেছেন। কেটির বয়স কত হবে? আশি ছাড়িয়ে গেছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু এখনও কী সুন্দর চেহারা। ভাবলে অবাক লাগে।

দুজনের কথাবার্তা এগিয়ে চলেছে।

নিক বললেন ম্যাডাম, জর্জ মেলিসের রিপোর্ট কাল প্রকাশিত হবে। আমার মনে হচ্ছে যে, আপনার নাতনি এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত।

কেটি বললেন –আমি বিশ্বাস করি না।

–আমার কথা শুনুন, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। প্রত্যেকটা পুলিশি তদন্ত শুরু হয় কোন মোটিভ, তার ওপর নির্ভর করে। জর্জ মেলিসকে আমরা এক রহস্যময় মানুষ বলতে পারি। উনি আপনার নাতনিকে কেন বিয়ে করেছিলেন? বিয়ে করে প্রভূত অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন। আমি শুনেছি, উনি মাঝে মধ্যেই আলেকজান্দ্রাকে শারীরিক ভাবে আঘাত করতেন। আলেকজান্দ্রা ডিভোর্স চেয়েছিলেন। উনি ডিভোর্স দিতে রাজী হননি। তাই আলেকজান্দ্রা ওকে হত্যা করার কথা ভেবেছিলেন। কেটির মুখ সাদা হয়ে গেছে।

–আমি একটা ভালো থিওরি খাড়া করছি। আমি জানি, জর্জ মেলিসের সিডাহিল হাউসে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কীভাবে উনি যাবেন? ডাকহারবার দিয়ে, মেনলাইন থেকে, প্লেন কিংবা ফেরি বোটে অফিস থেকে জানা গেছে, এগুলোর কোনোটাই তিনি ব্যবহার করেননি। এটা এক অলৌকিক ঘটনা? মেলিস কি জলের ওপর দিয়ে হেঁটে গেছেন? একটাই সম্ভাবনা থাকছে। তিনি অন্য কোনো জায়গা থেকে বোট নিয়ে ভাড়া মিটিয়ে দেন। নাম লিখিয়েছিলেন সোলানজে ডুনাস, চিনতে পারছেন?

-হ্যাঁ। সে তো আমার এই নাতনিদের দেখাশুনা করত। কয়েক বছর আগে ফ্রান্সে ফিরে গেছে।

পাপ্পাসের মুখে হাসি– তারপর? একই ভদ্রমহিলা আর একটা বোট ভাড়া নিয়েছিল, তিন ঘণ্টা বাদে, এই বোটটা সে ফেরত দিয়ে যায়। একই নাম লেখে। আমি সেখানকার লোকদের আলেকজান্দ্রার ছবি দেখাই। হ্যাঁ, এই ছবিটা আলেকজান্দ্রার। কিন্তু ঠিক মতো বলা যাচ্ছে না। কারণ যে মহিলা বোট ভাড়া নিয়েছিল, তার চুলের রং বাদামী।

তাহলে? সে হয়তো মাথায় উইপ পরেছিল।

–আমি বিশ্বাস করি না, আলেকজান্দ্রা তার স্বামীকে হত্যা করেছে।

–আমিও মনে করি না। মিসেস ব্ল্যাকওয়েল, কিন্তু আমার সন্দেহ ইভ।

ব্ল্যাকওয়েল পাথরের মতো শক্ত হয়ে বসে আছেন।

–আলেকজান্দ্রা এটা করেনি, আমি তার সমস্ত পদক্ষেপের ওপর কড়া নজর রেখেছি। সেদিন সকালে সে নিউইয়র্কে গিয়েছিল, বন্ধুর সাথে দেখা করতে। নিউইয়র্ক থেকে সোজা ওই আইল্যান্ডে উড়ে যায়। সে একসঙ্গে দুটো মোটরবোট ভাড়া নিতে পারে না। কিন্তু আলেকজান্দ্রার মতো দেখতে কেউ একজন নিয়েছিল। সোলানজে ডুনাস নামে সই করেছে। এটা নিশ্চয়ই ইভ, আমি ইভের মোটিভের কথা ভাবতে চিন্তা করলাম। মেলিসের ছবি দেখিয়েছি, ইভের অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের টেনেন্টদের কাছে। তারা বলেছে, এই লোকটা নাকি প্রায় সেখানে যেত। ওই বাড়ির সুপারিটেনডেন্ট জানিয়েছে এক রাতে মেলিস যখন সেখানে ছিল ইভ ভীষণ ভাবে আহত হয়। সেটা কি আপনি জানেন?

...মেলিস তাকে মেরেছিল। এটাই তার স্বভাব। ইভ প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে, ডাকহারবারে যাবার জন্য জর্জকে প্রলুব্ধ করে। তাকে সে-ই হত্যা করেছে।

কেটির দিকে পাপ্পাস তাকালেন। তার সমস্ত চোখে মুখে আতঙ্ক।

–ইভ একটা অ্যালিবাই দিচ্ছে, সে ওয়াশিংটন ডিসিতে ছিল। সে ক্যাব-ড্রাইভারকে বলেছিল, তাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যেতে। একশো ডলারের নোট দিয়েছিল। কিন্তু ওয়াশিংটন শাটলের ব্যাপারটা সে ভুলে গেছে। মনে হয় না সে ওয়াশিংটনে গিয়েছিল। সে একটা বাদামী রঙের উইপ পরেছিল। কমার্শিয়াল প্লেন ধরে মাইনেতে চলে যায়। দুটো বোট ভাড়া করে। মেলিসকে হত্যা করে। শরীরটা সাগরের জলে ফেলে দেয়। প্রমোদ তরণীটা ঠিক জায়গায় রেখে দেয়। অন্য একটা মোটরবোট ধরে ডকে চলে আসে।

কেটি অনেকক্ষণ তাকিয়ে বললেন –এইসব ঘটনাগুলো কি সত্যি ঘটেছে?

-হ্যাঁ, করোনারি রিপোর্টটা পেলে আমি একেবারে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারব। মিসেস ব্ল্যাকওয়েল আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন?

-বলুন।

নিক পাপ্পাসের হৃৎস্পন্দনের গতি অনেক বেড়ে গেছে। তিনি বললেন মিসেস ব্ল্যাকওয়েল?

কেটি তাকালেন।

–জর্জ মেলসিকে যেদিন হত্যা করা হয়েছিল, আমার নাতনি ইভ এবং আমি, দুজনেই ওয়াশিংটন ডিসিতে ছিলাম।

অদ্ভুত একটা অভিব্যক্তি। কেটি ব্ল্যাকওয়েল ভাবলেন –তুমি কি ভাবছ, তোমার জন্য আমি ব্ল্যাকওয়েল সাম্রাজ্য নষ্ট করব? না, আমি তা করতে দেব না।

রিপোর্ট পাওয়া গেল মৃত্যু হয়েছে এক বা একাধিক আততায়ীর আক্রমণের ফলে।

***

আলেকজান্দ্রা অবাক, পিটার টেমপ্লেটন কোর্ট হাউসে পৌঁছে গেছেন। উনি বললেন আপনার কাছে এলাম, আপনাকে সাহস জোগাবার জন্য।

এই ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেলে আপনি কোথাও বেড়াতে যাবেন?

-ইভ আমার সঙ্গে যাবে বলেছে। আলেকজান্দ্রার চোখে যন্ত্রণা। আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না জর্জ মারা গেছে। ব্যাপারটা আমার কাছে অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে।

–প্রকৃতি আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, কী করে শোককে সহ্য করতে হয়।

-না, আমি সে শিক্ষা নিতে পারব না। এমন একটা সুন্দর মানুষ, আলেকজান্দ্রা পিটারের দিকে তাকাল, আপনি তো ওর সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন বলুন। ওর মতো মানুষ কি আর আছে?

পিটার শান্তভাবে বললেন– না, একথা আমি হলফ করে বলতে পারি।

***

ইভ বলল–কেট, এবার কী হবে?

কেট তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল–কেন?

-তোমার সঙ্গে আমার বিয়েটা।

–হ্যাঁ, তুমি তো আমার স্ত্রী।

–তারপর? ব্ল্যাকওয়েলের টাকা?

–টাকার দরকার নেই, ডার্লিং। আমি তো ভালোই আছি।

–আমার টাকা লাগবে।

কেট মাথা নাড়লেন –আমি তোমায় তা দেব।

–আরও বেশি। আমি কি ডিভোর্স ফাইল করব?

–এটা করতে যেও না, কোনো কিছুই পালটায়নি ইভ, পুলিশ হত্যাকারীকে খুঁজে পায়নি। এখনও কিন্তু ব্যাপারটা খোলা আছে। মনে রেখো, হত্যার মামলা কিন্তু বরাবর বেঁচে থাকে। তুমি আমাকে যদি ডিভোর্স করো, আমি কিন্তু পুলিশের কাছে যাব।

-তাহলে? তুমি কি মনে করো, আমি ওকে মেরে ফেলেছি।

–ইভ, তুমি তো হত্যাকারী, একথা কেন অস্বীকার করছ?

–তুমি কেন বলছ?

–না হলে তুমি আমাকে বিয়ে করতে না।

–কুকুরির বাচ্চা, তুমি একথা বলতে পারলে।

–আমি তোমাকে ভালোবাসি।

–আমি তোমাকে ঘেন্না করি। আমি তোমার সাথে প্রতারণা করেছি।

মুখে হাসি –তাও তোমাকে আমি ভালোবাসি।

আলেকজান্দ্রার সঙ্গে বাইরে যাবার পরিকল্পনাটা বাতিল করা হল।

ইভ বলল আমি আমার সোনামনির সঙ্গে বারবাডোজ যাচ্ছি। হনিমুনে।

বারবাডোজের ব্যাপারটা কেটের একটা সুন্দর পরিকল্পনা।

ইভ বলল–আমি যাব না।

-হ্যাঁ, হনিমুন না করলে লোকে অবাক হয়ে যাবে। আমরা কেন লোককে প্রশ্ন করার সুযোগ দেব।

***

আলেকজান্দ্রা এখন প্রায়ই পিটার টেমপ্লেটনের সঙ্গে দেখা করতে আসছে। এভাবেই আর একটা নতুন গল্প শুরু হচ্ছে। জর্জের স্মৃতি তার মন থেকে ক্রমশ আবছা হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, পিটার টেমপ্লেটনের সাহচর্য তার ভালো লাগে। মানুষটার ওপর নির্ভর করা যায়।

আমি যখন ইনটার্ন ছিলাম, উনি আলেকজান্দ্রাকে বললেন, আমি একজন পেশেন্টকে দেখতে গিয়েছিলাম। স্টেথোস্কোপ দিয়ে তাকে পরীক্ষা করি। সে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েছিল। সেটাই আমার প্রথম পরীক্ষা।

আলেকজান্দ্রা তাকিয়ে আছে। হ্যাঁ, এই মানুষটির দিকে তাকালে মনে হয় নির্ভরতা এখানে বাসা বেঁধেছে।

***

ইভের হনিমুনটা কেমন হল? অনেক ভালো। কেটের বিবর্ণ শরীর, না, সে সূর্যের সামনে আসতে ভয় পায়। ইভ সারাদিন সূর্যের তাপে দগ্ধা হতে চায়। আহা, এর আগে সে এতক্ষণ একলা কোথাও থাকেনি। তার চারপাশে কতজনের ভিড়। প্লেবয় থেকে শুরু করে বিজনেস টাইফুন। মনে হচ্ছে সে যেন এখানে একা থাকতে এসেছে।

তারপর? কীভাবে এই ব্যাপারটাকে হাল্কা করা যায়? শেষ অব্দি ইভ ভাবল, আর কিছুদিন খেলতে হবে।

***

দুবছর সময় লাগবে কি? কেটি ব্ল্যাকওয়েল ভাবলেন। হ্যাঁ, তার মধ্যে অনেক কিছু পালটে যাবে।

ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেড এখন আরও বড়ো হয়ে উঠেছে। আমি চলে যাবার পরে এই ব্যবসার কী অবস্থা হবে? কেটি ভাবতে থাকলেন।

***

হনিমুন থেকে তারা ফিরে এসেছে।

কেট শান্তভাবে বললেন কাজে ফিরতে হবে। অনেকগুলো অপারেশন করতে হবে। তুমি কি আমায় ছাড়া থাকতে পারবে?

ইভ বলল–আমি চেষ্টা করব।

কেট ভোরবেলা উঠে পড়েছেন। ইভের ঘুম ভাঙার আগে। ইভ কিচেনে পৌঁছে গেল। কী আশ্চর্য, কফি তৈরি হয়েছে, ব্রেকফাস্ট রেডি। আহা, ইভের নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। ইভ এখন ইচ্ছেমতো টাকা খরচ করতে পারে। কেটকে সে সুখী করতে পেরেছে।

কেট বললেন তুমি এমন কিছু করো না, যাতে আমার ইমেজ নষ্ট হয়।

-তোমার কথা বুঝতে পারছি।

–তুমি ব্যবসার কী জানো? তুমি তো ছোটোবেলা থেকেই সোনার চামচ মুখে মানুষ হয়েছ।

***

ইভ কোনো কথা বলে স্বামীকে চটাতে চাইল না। সে ররির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে। ররির সাথে ডিনার খায়। নামী দামী রেস্টুরেন্টে। কিন্তু এই লোকটা তার স্বামী। তাকে চটানো উচিত হবে না। রাতে অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেই ইভ বাড়িতে ঢুকে পড়ে। কেট তার জন্য ডিনার রান্না করেন। আহা, এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা।

এমনকি কেট জানতে চান না, সারাদিন তার স্ত্রী কার সান্নিধ্যে কাটিয়েছে।

.

পরের বছর, আলেকজান্দ্রা এবং পিটার এঁকে অন্যকে গভীরভাবে ভালোবাসল। পিটার আলেকজান্দ্রার সাথে সর্বত্র যাচ্ছে। এমনকি টনিকেও একদিন দেখে এলেন অ্যাসাইলামে গিয়ে। যন্ত্রণাটা ভাগ করার চেষ্টা করলেন।

কেটির সঙ্গে দেখা করলেন এক সন্ধ্যেবেলা, কথায় কথায় তিনি তার মনের কথাটা বলে দিলেন।

কেটি প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেননি। তার মনে হল, আলেকজান্দ্রা বোধহয় ভুল করতে চলেছে। কিন্তু এই সমস্যার একটা সমাধান হওয়া দরকার।

শেষ পর্যন্ত কেটি বলেছিলেন-তোমাদের দুজনকে দেখেই স্বার্থপর বলে মনে হচ্ছে। একদিন তোমাদের মন পালটে যাবে। তোমরা কি ছেলেমেয়ে আনতে চাইছ এই পৃথিবীর বুকে?

পিটার হেসে বললেন –এটা আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার মিসেস ব্ল্যাকওয়েল, এভাবে আমাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন না। অ্যালেক্স এবং আমি আমাদের মতো জীবন কাটাব। আমাদের সন্তান হলে তাদের ওপর আমি কিছু চাপিয়ে দেব না।

কেটি হাসলেন –আমি কিন্তু সকলের ব্যক্তিগত জীবনে থাবা বসিয়েছি। কারণ আমি হলাম এক বাঘিনী, সকলকে তো বাঘিনীর ইচ্ছা মেনে চলতে হবে।

***

হনিমুনের পর দুমাস কেটে গেছে। কেটি শুনলেন আলেকজান্দ্রা গর্ভবতী, আহা, একটা ছেলে এলে ভালো হয়।

***

ইভ বিছানাতে শুয়েছিল। ররির নগ্ন শরীরটা বাথরুমের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। হ্যাঁ, অসাধারণ দেহ সৌষ্ঠব আছে ররির। সে রোগা অথচ শক্তিশালী। ইভ তাকিয়ে থাকল। ররির কাছ থেকে আরো অনেক কিছু নিংড়ে নিতে হবে। ইভের সন্দেহ, ররির আরও অনেক শয্যাসঙ্গিনী আছে। কিন্তু এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে সে ভয় পায়। হয়তো সম্পর্কটাতে চিড় ধরে যাবে।

ররি বিছানার কাছে এল, সে ইভের সমস্ত শরীরে আঙুল ডগার পরশ রাখল। কিন্তু চোখের তলায় এসে অবাক হয়ে গেল। বলল–বেবি, তোমার চোখে দাগ পড়েছে কেন?

প্রত্যেকটা শব্দ ইভকে আঘাত করছে। হ্যাঁ, তার সঙ্গে ররির বয়সের তফাত আছে। ইভ এখন পঁচিশ বছরে পা রেখেছে। তারা আবার ভালোবাসার খেলা খেলতে শুরু করল। কিন্তু এই প্রথম ইভের মন অন্য কোথাও চলে গেছে।

রাত্রি নটার সময় ইভ বাড়িতে ফিরে এল। কেট ওভেনে রোস্ট রান্না করছেন।

তিনি ইভের ঠোঁটে চুমু দিয়ে বললেন ডিয়ার, তোমার কয়েকটা প্রিয় খাবার রান্না করছি।

–কেট, আমার চোখের তলার কালো দাগ তুলে দিতে হবে।

–কোন দাগ?

ইভ দেখাল –এইগুলো।

–কেন? এগুলোকে বলে হাসির রেখা। এগুলো আমি ভালোবাসি।

–না, আমি ঘেন্না করি।

–তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো ইভ, এগুলো তোমার সৌন্দর্যের পক্ষে অন্তরায় হবে না।

-ভগবানের দোহাই, এগুলোকে তুলে দাও। তুমি তো সহজেই তা করতে পারো।

–হা, কিন্তু, তুমি কি এতে খুশি হবে?

–হ্যাঁ, কবে করবে?

–আগামী ছমাস পারব না। আমার হাতে অনেকগুলো অপারেশন আছে।

–আমি তোমার পেশেন্ট নই, আমি তোমার বউ। আমি যা বলব, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে তা করতে হবে। কাল হবে?

–না, কাল শনিবার, ক্লিনিক বন্ধ থাকবে।

–ওটা খুলে ফেলো।

ইভ আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে চাইছে না।

-ও ঘরে এসো। কেট বললেন।

ড্রেসিংরুম, ইভ একটা চেয়ারের ওপর বসল, উজ্জ্বল আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। উনি সন্তর্পণে পর্যবেক্ষণ করলেন। পরিণত হলেন এক অনুভবী শল্য চিকিৎসকে। হ্যাঁ, এবার ওনার আসল কাজ শুরু হবে। ইভ জানে, এর আগে ওই ডাক্তার কীভাবে তার মুখে অলৌকিক কারুকাজ করেছিল। এই অপারেশনটা হয়তো না করলেও চলত, কিন্তু ইভ কোনোমতেই ররিকে হারাতে চাইছে না।

কেট আলো বন্ধ করে দিয়ে বললেন কোনো সমস্যা নেই। আমি কাল সকালে এটা করে দেব।

***

পরের দিন সকালবেলা, ক্লিনিকে তারা দুজন পৌঁছে গেছে।

কেট বললেন সাধারণত একজন নার্স আমাকে সাহায্য করেন। কিন্তু এটা তো ছোটো কাজ, নার্সের দরকার হবে না।

–তুমি তাড়াতাড়ি করবে কিন্তু।

–হ্যাঁ, আমি তোমাকে কষ্ট দেব না।

ইভ দেখল, কেটের হাতে একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ, তিনি ইনজেকশন দিলেন। সামান্য একটু ব্যথা। ইভের দুটি চোখে ঘুমের আচ্ছন্নতা।

ঘুম ভেঙে গেছে। কেট চেয়ারে বসে আছেন।

-কীভাবে হল?

–খুবই ভালো।

ইভ মাথা নাড়ল, আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

কেট তখনও বসে ছিলেন। ইভের ঘুম ভেঙে গেছে।

-কদিনের মধ্যেই ব্যান্ডেজ খুলে দেব।

–ঠিক আছে।

প্রত্যেক দিন কেট এসে পরীক্ষা করেন আর বলেন, তুমি সুস্থ হয়ে উঠছ।

-কবে আমি আমার মুখ দেখব আয়নাতে?

–শুক্রবার দেখতে পাবে।

ইভ প্রধান নার্সকে ডেকে পাঠাল। প্রাইভেট টেলিফোন বসানো হয়েছে। প্রথম যে ফোনটা এল সেটা ররির।

-হাই বেবি, তুমি এখন কোথায়? আমি তো তোমাকে না পেয়ে অধৈর্য হয়ে উঠেছি।

-আমারও তাই অবস্থা, দেখো না ফ্লোরিডাতে আসতে হয়েছে। কী একটা মেডিকেল কনভেনশন আছে। আসছে সপ্তাহে ফিরে যাব।

-কেমন আছো?

–তোমার কথা মনে পড়ছে।

ইভ ফিসফিসিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করল তোমার সঙ্গে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে।

-হ্যাঁ, ওর কথা আর বলল না।

খিলখিলে একটা হাসির শব্দ।

ইভ টেলিফোনটা নামিয়ে রাখল।

আলেকজান্দ্রাকে ফোন করল। আলেকজান্দ্রা তার আসন্ন সন্তান সম্পর্কে খুবই উৎফুল্ল। সে বারবার বলছে, আমি অপেক্ষা করতে পারছি না।

ইভ বলল আমার অনেক দিনের ইচ্ছে, আমি একজন ভালো মাসি হব।

ঠাকুরমার সাথে এখন আর দেখা করতে যায় না ইভ। দুজনের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছে। কেন? ইভ জানে না।

কেট কখনও কেটির কথা জিজ্ঞাসা করেনি। এজন্য ইভ তাকে দোষ দিতে পারে না। একদিন হয়তো ইভ ররির কথা চিন্তা করবে, কেটকে তার জীবন থেকে বিদায় দেবে। ররিকে চিরদিনের জন্য দখল করতে হবে। ররি ছাড়া সে বাঁচবে না।

***

শুক্রবার সকালবেলা। ইভের ঘুম ভেঙে গেছে। সে কেটের জন্য অপেক্ষা করছে। কেট কখন আসবে? হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত কেট এলেন, একটা কাজে আটকে পড়েছিলেন। আয়নাটা আনা হল, ইভ আয়নার দিকে তাকিয়ে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল।

.

উপসংহার

কেটি–১৯৮২

৩৬.

কেটির মনের হল, সময়ের চাকা অতি দ্রুত পেছন দিকে চলে গিয়েছিল। যেসব দিনগুলো বরাবরের জন্য হারিয়ে গেছে, ক্ষণকালের জন্য তারা জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। আহা, কত সুন্দর শীত সকাল ঝরে গেছে বসন্ত সন্ধ্যায়, গ্রীষ্ম হারিয়ে গেছে শরৎ দিনে। একটার পর একটা ঋতু চলে গেছে তার জীবন থেকে। আশি বছর, আরও কিছু বছর। হ্যাঁ, অনেক সময় তিনি তার আসল বয়সটার কথা ভুলে যান। মুখটা আরও পরিণত হয়ে উঠছে। মনটা প্রাচীন হচ্ছে কি? আয়নাতে মুখ দেখলে কেমন যেন যন্ত্রণা হয়। তিনি আর আয়নায় দেখতে চান না নিজেকে। তবে এখনও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালোবাসেন। সেই গর্বিত ভঙ্গি, আভিজাত্যময় চাউনি।

প্রত্যেক দিন অফিসে যান, ঠিকমতো অফিস করেন, মৃত্যুর কথা ভাবনার মধ্যে আনেন না। বোর্ড মিটিং-এ যোগ দেন। বুঝতে পারছেন, আর বেশি দিন এইভাবে কাজ করতে

পারবেন না। আশেপাশে যারা বসে থাকে, তারা অত্যন্ত দ্রুত কথা বলে। কেটি তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে পারছেন না। অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে একটা সংঘর্ষ ঘটে গেছে। হ্যাঁ, তার জগতটা ক্রমশ আরও ছোটো হয়ে আসছে।

কেটির হাতে একমাত্র জীবনরেখা আছে, একটা প্রচণ্ড উৎসাহ, যা তাকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছে। তিনি জানেন, একদিন এই পরিবারের কেউ ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেডের দায়িত্ব নেবে। কেটি এখনও পর্যন্ত জানেন না, কে হবে সেই উত্তরাধিকারী, জেমি ম্যাকগ্রেগর এবং মার্গারেট, তিনি এবং ডেভিড, অনেক যন্ত্রণা সহ্য করেছেন, অনেক বিনিদ্র রাত, ইভ? কেটি তার ওপর অনেক আশা স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ইভ একজন হত্যাকারী। কেটি ভাবলেন, ইভকে হয়তো শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল। না, শাস্তি তো অনেক হয়ে গেছে।

***

আয়নায় মুখ দেখে ইভ অবাক হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছে। অনেকটা ঘুমের বড়ি খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু কেট পাম্প করে সব বের করে দিয়েছেন। ভালোবাসা এখন কোথায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু কেন? কেট কি এভাবে প্রতিহিংসা নিয়েছেন?

নার্সরা সবসময় ইভকে ঘিরে রেখেছে। ইভ তার স্বামীর পা ধরে বলেছিল আমাকে মরতে দাও, আমি এইভাবে বেঁচে থাকতে চাই না।

কেট বললেন –এখন তুমি আমার। পৃথিবীর কোনো পুরুষ তোমার মুখের দিকে তাকাবে না।

কিন্তু কেন? কেট এভাবে কেন প্রতিশোধ নিয়েছেন? আলেকজান্দ্রা বারবার ফোন করছে, ইভ তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে না। এমন কী সে পৃথিবীর কাউকেই তার এই কুৎসিত মুখখানা দেখাবে না। কেট ছাড়া কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে না। কেট শেষ পর্যন্ত কাজ শেষ করলেন। হ্যাঁ, ইভকে সারাজীবন এই কুৎসিত মুখচ্ছবি নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

রোজ সকাল পাঁচটার সময় কেটের ঘুম ভেঙে যায়। তাকে হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিকে যেতে হবে।

ইভ আরও ভোরে ওঠে, ব্রেকফাস্ট তৈরি করে। রোজ রাতে সে ডিনারের জন্য রান্না করে। দেরি হলে বসে থাকে। হ্যাঁ, আমার স্বামী কি অন্য কোনো মেয়ের প্রতি অনুরক্ত? এখনও সে কেন ফিরছে না?

দরজাতে পায়ের শব্দ। সে ছুটে যায়, স্বামীকে আদর করে। অনেকক্ষণ তাকে জড়িয়ে ধরে রাখে। তারা আগের মতো কেউ কাউকে ভালোবাসতে পারবে না। তবু ইভ ভালোবাসার চেষ্টা করে।

একদিন ইভ বলল– ডার্লিং, তুমি তো আমাকে অনেক শাস্তি দিয়েছ, তুমি কি আবার আমার মুখটা ঠিক করে দেবে না?

কেট তার বউয়ের দিকে তাকিয়ে গর্বিত কণ্ঠস্বরে বলেছিলেন, না সোনা, তোমার মুখটা আর ঠিক করা যাবে না।

***

সময় কেটে যাচ্ছে। কেট আরও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছেন। শেষ পর্যন্ত ইভ তার ক্রীতদাসীতে পরিণত হল। এখন সবকিছুই কেটের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হচ্ছে। হ্যাঁ, এই কুৎসিত মুখ ইভকে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি রেখেছে।

***

আলেকজান্দ্রা এবং পিটারের একটা ছেলে হয়েছে, রবার্ট- ঝকঝকে চেহারার একটি শিশু। কেটির মনে পড়ে গেল টনির কথা। রবার্টের বয়স আট বছর, যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছেলে। কেটি ভাবলেন, হ্যাঁ, এই ছেলেটির ওপর নির্ভর করা যায়।

***

পরিবারের সদস্যরা ওই আমন্ত্রণ লিপি পেয়েছিল একই দিনে, লেখা ছিল শ্রীমতী কেটি ব্ল্যাকওয়েল, তাঁর নব্বইতম জন্মদিন পালন করবেন, সিডারহিল হাউস, ডাকহারবারে, আপনি সবান্ধবে সপরিবারে এই অনুষ্ঠানে আসবেন। ১৯৮২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর, রাত ৮টায়।

কেট এই আমন্ত্রণ পত্র পেয়ে ইভের দিকে তাকিয়ে বললেন –আমরা যাব।

-না, আমি যাব না। তুমি একা যাও।

–না, তোমাকে যেতে হবে।

***

টনি ব্ল্যাকওয়েল তার স্যানাটেরিয়ামের বাগানে বসেছিল। আপন মনে ছবি আঁকছিল। একজন এসে বলল–টনি, আপনার চিঠি।

টনি চিঠিটা খুলল, ঠোঁটে একটা অদ্ভুত হাসি আহা, বার্থডে পার্টিতে যেতে আমার ভালোই লাগে।

***

পিটার টেমপ্লেটন এই চিঠিটা পড়ে বললেন কী আশ্চর্য, নব্বই বছর বয়স হয়ে গেল।

-হ্যাঁ, আলেকজান্দ্রা বলল।

তারা ভাবল, ছোট্ট রবার্ট একটা আমন্ত্রণ পত্র পেয়েছে।

.

৩৭.

অতিথিদের যাবার সময় হয়েছে। কেউ ফেরিতে গেলেন, কেউ এরোপ্লেনে, যাবার আগে তারা সকলে সিডারহিলের লাইব্রেরিতে এসেছিলেন। কেটি চারদিকে তাকালেন, আহা, প্রত্যেকে, এই টনি, মুখে হাসি ছিল তার, এখন তাকে মনে হচ্ছে সে বুঝি অন্য জগতের বাসিন্দা। আমার সন্তান, আমাকে খুন করতে চেয়েছিল। তার ওপর আমি এতখানি নির্ভর করেছিলাম। সে আমার সব স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিয়েছে।

ওই তো ইভ, সে এক হত্যাকারী। পৃথিবীটা তার পায়ের তলায় থাকত, যদি সে একটু ভালো হত।

কেটি ভাবলেন, অনেক কষ্ট সে পেয়েছে। আহা, আলেকজান্দ্রা, অসাধারণ রূপবতী, শান্ত স্বভাবের মেয়ে। কিন্তু? আলেকজান্দ্রা কখনও কোম্পানিকে বড়ো করে দেখেনি। ক্রুগার ব্রেন্ট সম্পর্কে তার সামান্যতম আগ্রহ নেই। এমন একটা লোককে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছে, যে কোম্পানির ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চায় না।

এরা দুজনেই বিশ্বাসঘাতিকা। হ্যাঁ, এদের কাউকে আমি বিশ্বাস করব না।

কেটি ভাবলেন, আমি সব কিছু ধ্বংস করব। আমি একটা বিরাট সাম্রাজ্য তৈরি করেছি। কেপটাউনে আমার নামে একটা হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে। বান্দার মতো লোকেরা যাতে পড়াশোনা করতে পারে, তার জন্য আমি স্কুল তৈরি করেছি। লাইব্রেরি স্থাপন করেছি।

এই ঘরে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কতগুলি ভৌতিক অবয়ব। জেমি ম্যাকগ্রেগর এবং মার্গারেট, বান্দা আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ডেভিড, আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে। কেটি মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ, কবে আমি তোমাদের কাছে যাব?

***

ঘরে কে একজন চলে এসেছে। কেটি তাকালেন, আহা, নাতনির ছেলে।

কেটি বললেন –এসো।

রবার্ট চলে এসেছে।

রবার্ট বলল–দিদা, তোমার জন্মদিনের পার্টিটা দারুণ হয়েছে। তাই না?

-ধন্যবাদ রবার্ট, তোমার ভালো লেগেছে? স্কুল কেমন লাগে?

–আমার স্কুল ভালো লাগে। আমি আমার ক্লাসে হেড বয়।

কেটি তাকালেন পিটারের দিকে– রবার্টকে ওয়াটের স্কুলে পাঠালে কেমন হয়? এটাই কিন্তু সব থেকে ভালো স্কুল।

পিটার হাসলেন– ঈশ্বরের দোহাই কেটি, রবার্ট যা ভালো মনে করে তাই করবে। গানের প্রতি ওর দারুণ আকর্ষণ আছে। ও একজন ক্লাসিক্যাল মিউজিসিয়ান হতে চায়। জীবনটা ও নিজের মতো কাটাবে।

কেটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন– তুমি ঠিকই বলেছ। আমার অনেক বয়স হয়েছে। আমি এখানে নাক গলাতে চাইছি না। যদি ও গান শিখতে চায়, তাই শিখতে দিও।

উনি রবার্টের দিকে তাকিয়ে বললেন– রবার্ট, আমি কি তোমাকে একটু সাহায্য করব? আমি একজনকে জানি যে জুবিন মেহেটার কাছের বন্ধু।